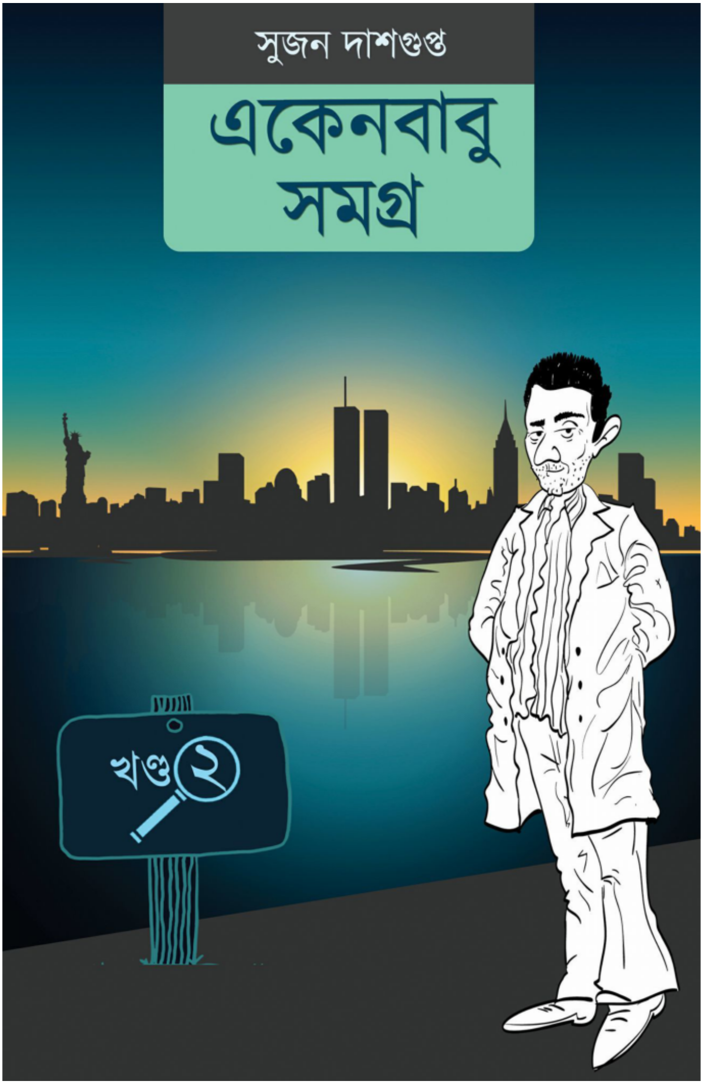
সুজন দাশগুপ্ত
একেনবাবু
সমগ্র
খণ্ড ২

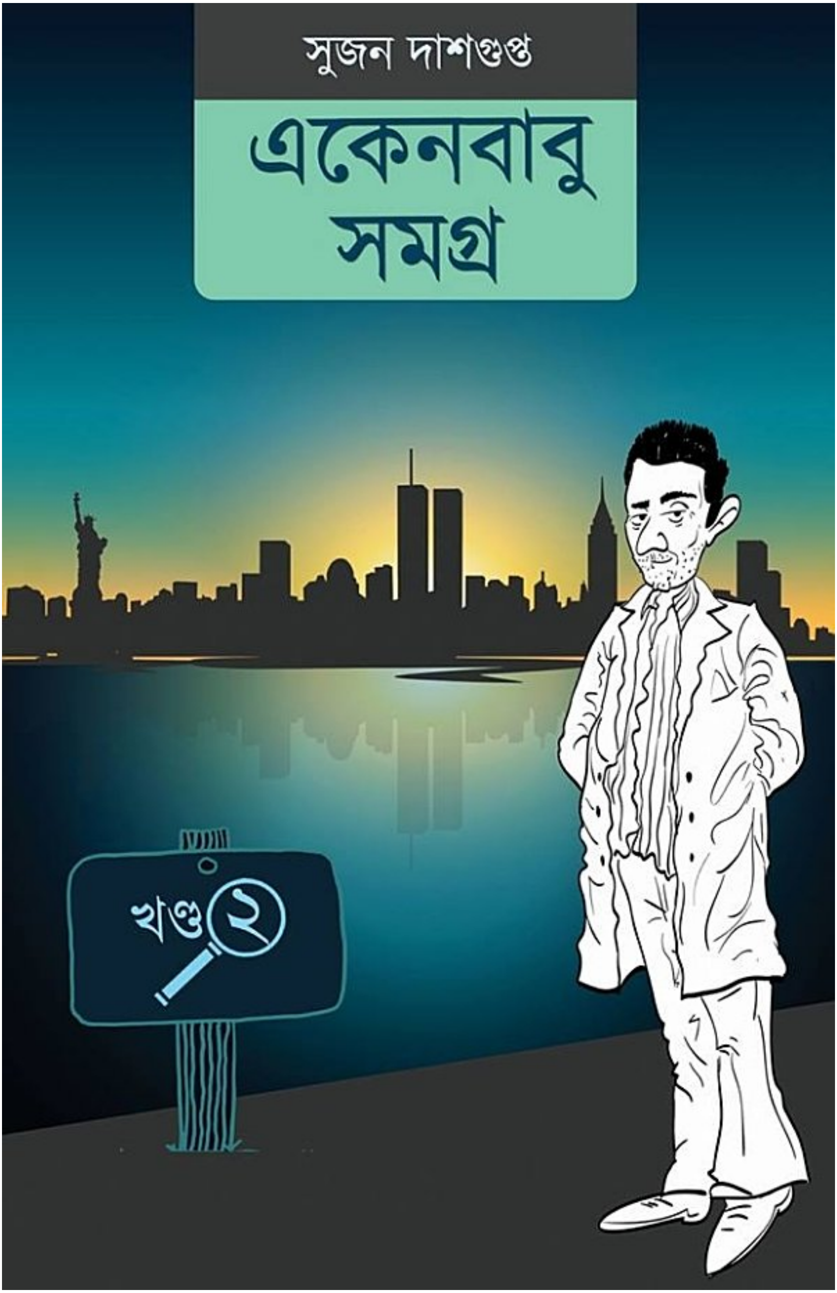
সুজন দাশগুপ্ত
একেনবাবু
সমগ্র
খণ্ড ২

# একেনবাবু সমগ্র

## (দ্বিতীয় খন্ড)

## সুজন দাশগুপ্ত

বইয়ের গ্রুপ ॥ বইয়ের চ্যানেল

The Cafe Table

www.thecafetable.com

Ekenbabu Somogra (Dwitiyo Khondo)
Sujan Dasgupta
A Collection Of Detective Novels


| | |
|---|---|
| প্রথম প্রকাশ | জানুয়ারি ২০১৮ |
| চতুর্থ প্রকাশ | জানুয়ারি ২০২০ |
| ই-বুক প্রকাশ | জুলাই ২০২০ |
| গ্রন্থস্বত্ব | সুজন দাশগুপ্ত |
| প্রচ্ছদ | একতা ক্রিয়েটিভ টেলস্ |
| পত্রবিন্যাস | ইন্দ্রাণী নাগ |
| মুদ্রক | জয়শ্রী প্রেস, কলকাতা-০৯ |
| ই-বুক সংস্করণ | দ্য বুকমেকার্স (thebookmakers2020@gmail.com) |
| মূল্য | ৩০০ টাকা / ১৫ ডলার |
| ISBN | 978-81-93423-95-0 |
| প্রকাশক | অভিষেক আইচ ও অরিজিৎ ভদ্র<br>দ্য কাফে টেবল<br>সাহেববাগান, ব্যান্ডেল, হুগলি – ৭১২১২৩<br>৯৮৭৪২৬৩৪১৩, ৯৭৪৮০৮১৫৪২ |



প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশই কোনও রূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক্স ইলেক্ট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য- সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

... যাঁরা একেনবাবু পড়েননি...

বইয়ের গ্রুপ ॥ বইয়ের চ্যানেল

# ভূমিকা

গত বছর একেনবাবুকে পাঠকদের সামনে নতুন করে উপস্থিত করানোর পেছনে ছিল বন্ধুবর রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের উৎসাহ আর 'দ্য কাফে টেবল'-এর দুই কর্ণধার অভিষেক আইচ ও অরিজিৎ ভদ্রের উদ্যোগ। প্রস্তাবটা ফোনেই এসেছিল। 'দ্য কাফে টেবল' 'সমগ্র একেনবাবু' প্রকাশ করতে চায়... প্রথম খন্ড ২০১৭-তে। পয়সার শ্রাদ্ধ করতে চায় করুক, আমি কী করতে পারি! তবে নিশ্চিন্ত ছিলাম বিক্রি-টিক্রি হবে না, ঠেকে শিখবে। শিখল কোথায়? আবার তো এসে হাজির... ২০১৮ তে দ্বিতীয় খণ্ড বার করবে!

এই খণ্ডে 'মেলাবেন তিনি মেলাবেন' কাহিনিটি নতুন। 'শান্তিনিকেতনে অশান্তি' বেশ কয়েক বছর আগে বই হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল। অন্য দুটি কাহিনি 'সুখী গৃহকোণ'-এ পূর্ব-প্রকাশিত। প্রকাশিত কাহিনির তিনটিই পরিমার্জিত করা হয়েছে।

অভিষেক, অরিজিৎ দুজনেই এখন আমার স্নেহর পাত্র। তাও আশা করব, এই খণ্ড যেন বেশি বিক্রি না হয়... হলেই তো আবার তৃতীয় খণ্ডের জন্য চাপ আসবে!

পরিশেষে 'দ্য কাফে টেবল' টিম-এর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

সুজন দাশগুপ্ত
মন্টভিল, নিউজার্সি

# সূচিপত্র

শান্তিনিকেতনে অশান্তি

হরপ্পার শিলালিপি

‘স্পোকেন ইংলিশ’ মার্ডার মিস্ট্রি

মেলাবেন তিনি মেলাবেন

# শান্তিনিকেতনে অশান্তি

বইয়ের গ্রুপ ॥ বইয়ের চ্যানেল

## ।।১।।

দেশে ছুটি কাটাতে যাব, যাবার মাত্র সাতদিন বাকি। ঠিক এই সময়ে সুভদ্রামাসির বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে যাবার মোটেই ইচ্ছে ছিল না। কেনা-কেটা ছাড়াও যাবার আগে বেশ কিছু কাজ শেষ করতে হবে। কিন্তু সুভদ্রামাসি ছাড়লেন না। শুধু আমি না, একেনবাবু আর প্রমথকে নিয়ে আসা চাই। প্রমথ তো কথাটা শুনে খেঁকিয়ে উঠল, "নিয়ে আসা চাই মানে? তুই আমার গার্জেন নাকি? তোর ইচ্ছে হয় যা, তোর ঐ ডিপ্রেসিং সুভদ্রামাসির বাড়ি আমি যাচ্ছি না।" বলেই গটগট করে ইউনিভার্সিটি চলে গেল।

প্রমথর এই রিয়্যাকশনে আমি আশ্চর্য হইনি। জানি শেষমেষ ও ঠিকই যাবে। প্রমথটা ভোজনরসিক, আর সুভদ্রামাসির কুক সুজাতা দুর্দান্ত রান্না করে—বিশেষ করে বাঙালি রান্না। তবে ফ্রান্সিস্কার সঙ্গে কোনো প্ল্যান থাকলে অন্য কথা। একেনবাবু সুভদ্রামাসিকে চেনেন না, তাও একেনবাবুকে নিয়ে সমস্যা হবে না জানতাম। যে কোনো জায়গায় যেতে উনি এক পায়ে খাড়া। আমায় শুধু জিজ্ঞেস করলেন, "ম্যাডাম কি স্যার ডিপ্রেশনে ভুগছেন?"

"আরে না, প্রমথকে তো চেনেন। তবে হ্যাঁ, ওর জীবনটা একটু স্যাড ঠিকই।"

"কেন স্যার?"

"মা'র কাছে শুনেছি এদেশে পড়াশুনা করতে এসে এক সায়েবকে বিয়ে করেন। ওঁর বাবা-মা সেটা অ্যাকসেপ্ট করেননি। বহুদিন কোনো যোগাযোগ ছিল না দেশের সঙ্গে। তার ওপর নিজের ছেলেপুলে হয়নি। একটা বাচ্চা অ্যাডপ্ট করেছিলেন, সে আবার স্কুলে যাবার পথে অ্যাকসিডেন্টে মারা যায়।"

"মাই গড! কতদিন আগের ঘটনা স্যার?"

"তা অনেক বছর হল, আমার বয়স তখন চোদ্দো-পনেরো।"

"সে তো অনেক বছর আগেকার কথা।"

"তাতে কি, ছেলেমেয়ে হারানোর দুঃখ কখনো যায় নাকি! শুধু তাই নয়, কয়েক বছরের মধ্যে আবার বাবা-মা-স্বামী সবাইকে হারান।"

"কিন্তু স্যার, মা-বাবার সঙ্গে তো যোগাযোগ ছিল না বললেন।"

"ছেলে মারা যাবার পর হয়েছিল। তখন কলকাতাতে স্বামীকে নিয়ে বেড়াতে আসতেন নিয়মিত। ইনফ্যাক্ট তখনই আমি ওঁকে আর রিচার্ডমেসোকে দেখি। রিচার্ডমেসো বেশ ইন্টারেস্টিং লোক ছিলেন, খুব ক্রিপ্টিকালি কথাবার্তা বলতেন।"

"আপনি বলছিলেন স্যার কয়েক বছরের মধ্যে সবাই মারা যান..." একেনবাবু খেই ধরিয়ে দিলেন।

"ও হ্যাঁ, তখন আমি বি.এসসি পড়ছি। বাথরুমে পড়ে মাথা ফেটে মারা গেলেন সুভদ্রামাসির মা। হাসপাতালে থাকার সময়ে রক্তের দরকার— রিচার্ডমেসো আর আমি রক্ত দিয়েছিলাম। কিন্তু সুভদ্রামাসির মা'র জ্ঞান আর ফিরল না। এক বছর পেরোতে না পেরোতেই সুভদ্রামাসির বাবা মারা গেলেন একটা সিম্পল অ্যাপেনডিক্স অপারেশনে।"

"হোয়াট ওয়েন্ট রং স্যার?"

"হু নোজ। রিচার্ডমেসোকে জিজ্ঞেসও করেছিলাম। ওঁর উত্তর 'ট্রুথ অ্যাস অফটেন ইজ নট নোন।' এর পরপরই রিচার্ডমেসোর ক্যানসার ধরা পড়ে। বছর দুই-তিন বেঁচে ছিলেন। তারমধ্যেও কলকাতায় এসেছিলেন শুনেছি, কিন্তু আমি তখন বাইরে পড়তে চলে গেছি।"

"তার মানে স্যার, ম্যাডাম এখন একেবারেই একা।"

"হ্যাঁ, তার ওপর আর্থ্রাইটিস-এর কোপে গৃহবন্দি। দ্যাট্স দ্য স্যাড পার্ট।"

ঐ যাঃ, গল্প শুরু করতে গিয়ে ভুলেই গেছি স্থান-কাল-পাত্রের কথা। স্থান নিউ ইয়র্ক। কাল ২০০২ সাল। আমি বাপি দে, নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে ফিজিক্স পড়াচ্ছি বছর দুয়েক হল। প্রমথ আমার ছেলেবেলার বন্ধু। কেমিস্ট্রিতে পোস্ট ডক করছে একই ইউনিভার্সিটিতে। এই কাহিনীর মুখ্য চরিত্র অবশ্য একেনবাবু। এককালে উনি কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দাদপ্তরে কাজ করতেন। সেই সময়ে নিউ ইয়র্কে এসেছিলেন একটা এক্সচেঞ্জ পোগ্রামে। নিউ ইয়র্ক পুলিশ তখন ম্যানহাটানের মুনস্টোন মিস্ট্রি নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছিল, একেনবাবু সেটির সমাধান করেন। সেই থেকেই নিউ ইয়র্ক পুলিশের ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট একেনবাবুর গুণমুগ্ধ ভক্ত। অল্প কিছুদিনের জন্য দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। আবার ফিরে এসেছেন। এবার এসেছেন একটা ফুলব্রাইট ফেলোশিপ বাগিয়ে— ক্রিমিনোলজির উপর রিসার্চ করবেন। আমার আর প্রমথর সঙ্গে ওয়াশিংটন স্কোয়ারের কাছে একটা থ্রি-বেডরুম অ্যাপার্টমেন্ট শেয়ার করছেন।

একেনবাবু দেখলে অবশ্য ডিটেকটিভ বলে মনে হবে না। বেঁটেখাটো মোস্ট আনইম্প্রেসিভ চেহারা। জামাকাপড়ের অবস্থাও তথৈবচ। হাবেভাবে মনে হয় একটা স্টেট অফ কনফিউশনের মধ্যে আছেন। মাঝেমধ্যেই উলটোপালটা কথা বলেন। তবে যেটা সবচেয়ে ইরিটেটিং, সেটা হল কথায় কথায় 'স্যার' আর 'ম্যাডাম' বলা। দেশে হয়তো সেটা চলে, কিন্তু আমেরিকায় নয়। বিটকেল অ্যাকসেন্টের ইংরেজির মধ্যে স্যার আর ম্যাডামের বন্যা বইয়েও উনি যে দিব্যি করে খাচ্ছেন, তাতে অচেনা লোকেরা অবাক হলেও আমরা আর হই না। তলে তলে উনি যে একজন ধুরন্ধর ডিটেকটিভ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ও হ্যাঁ, ফ্রান্সিস্কার পরিচয়টা এখনও দেওয়া হয়নি। ফ্রান্সিস্কা সুইটজারল্যান্ডের মেয়ে, ভারি মিষ্টি চেহারা। কেমিস্ট্রিতে পিএইচ.ডি করছে। সেই সূত্রেই প্রমথর সঙ্গে আলাপ। সে আলাপটা এখন যে পর্যায়ে তাতে ওকে প্রমথর গার্লফ্রেন্ড বলা চলে। প্রমথ অবশ্য গার্লফ্রেন্ড কথাটা শুনলেই ক্ষেপে ওঠে। 'ফ্রেন্ড বলতে পারিস না, সঙ্গে গার্ল যোগ করতে হবে কেন!'

মেয়েটির চেহারাটাই শুধু মিষ্টি নয়, স্বভাবটাও চমৎকার। কেমিস্ট্রি সাবজেক্ট হলেও মিউজিক এবং আর্টের ব্যাপারেও প্রচুর ইন্টারেস্ট— যেটা আমাদের তিনজনের কারোর মধ্যেই তেমন নেই।

একেনবাবুর সঙ্গে সুভদ্রামাসির কথা শেষ হতে না হতেই ফ্রান্সিস্কার ফোন। প্রমথর খোঁজ করছে। প্রমথ ইউনিভার্সিটিতে চলে গেছে বলার পর আমার কি মনে হল, জিজ্ঞেস করলাম উইক-এন্ডে ওর কোনো প্ল্যান আছে কিনা।

"তেমন কিছু নেই।"

"তাহলে চলো না, আমার মায়ের এক বন্ধু সুভদ্রামাসির কাছে যাচ্ছি। তুমি গেলে, প্রমথও যাবে।"

আমি অবশ্য এক্সপেক্ট করিনি ফ্রান্সিস্কা রাজি হবে এভাবে যেতে। ও আমায় জিজ্ঞেস করল, "উনিই তো গান গাইতেন, তাই না?"

সুভদ্রামাসি এক কালে খুবই ভালো গাইতেন— মার কাছেই শুনেছি। কথা প্রসঙ্গে হয়তো সেটা একবার বলেছিলাম। কিন্তু ফ্রান্সিস্কার যে সেটা মনে থাকবে ভাবিনি।

আমি বললাম, "হ্যাঁ।"

"আই উইল কাম।"

ফ্রান্সিস্কার কথা শুনে আমি থ্রিলড। অর্থাৎ প্রমথ ব্যাটাকেও আসতে হবে।

।। ২।।

আমরা বেরোলাম প্রায় আড়াইটে নাগাদ। প্ল্যান ছিল ফ্রান্সিস্কাকে ওর অ্যাপার্টমেন্ট থেকে তুলে নিয়ে যাব। কিন্তু একেবারে শেষ সময়ে সেটা বাতিল করতে হল। শুক্রবার ফ্রান্সিস্কার একটা ইমপর্টেন্ট এক্সপেরিমেন্ট ছিল, যেটা ভন্ডুল হওয়ায় আজকে আবার করতে হচ্ছে! প্রমথ বলল, "ভালোই হল, ইংরেজিতে বকবক করতে হবে না।"

ওটা মুখের কথা, বুঝলাম ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

সুভদ্রামাসি থাকেন নিউ জার্সির উত্তর দিকে লেক ভালহাল্লা বলে একটা জায়গায়। আমাদের বাড়ি থেকে মাইল পঁয়ত্রিশ দূরে। নিউ জার্সি যেতে হলে হাডসন নদী পার হতে হয়। ব্রিজ বা টানেল দুটোই নেওয়া যায়। সেবার গিয়েছিলাম লিঙ্কন টানেল দিয়ে। এবার ধরলাম জর্জ ওয়াশিংটন ব্রিজ। কিন্তু এমনই কপাল, পড়লাম জ্যামে। পাক্কা পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগল শুধু ব্রিজ পার হতে। তারপর হাইওয়ে আই-৮০ ধরে মন্টভিল শহরে পৌঁছোতেই বাজল প্রায় চারটে। তখনও বেশ কিছুটা পথ বাকি।

লেক ভালহাল্লা মন্টভিল শহরের পাশে একটা পাহাড়ি শহরতলি। পাহাড়ের নীচে ভালহাল্লা লেক। তার পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে গাড়ি যাবার রাস্তা। সেই রাস্তা ধরে প্রায় আধমাইল গেলে, বাঁদিকে পড়ে সুভদ্রামাসির বাড়ি। এখানকার বাড়িগুলোর চারপাশে অনেকটা করে জায়গা। সামনে অল্প একটু ফুলের বাগান ছাড়া পুরোটাই গাছপালায় ভর্তি। বেশ জঙ্গল জঙ্গল চেহারা। আমি গাছপালা খুব একটা ভালো চিনি না। প্রমথ কিছু চেনে, অন্তত দাবি করে চেনে বলে। আমাদের কয়েকটা গাছ আর ঝোপ চেনাল। ওক, উইপিং উইলো, বার্চ, ডগউড, ফরসিথিয়া, আরও বেশ কয়েকটা নাম — এখন আর মনে পড়ছে না।

একেনবাবু দেখলাম একেবারে মুগ্ধ। আমাকে বললেন, "সত্যি স্যার, প্রমথবাবুর এ ব্যাপারে দেখছি অগাধ জ্ঞান। অ্যামেজিং!"

গাছপালা দেখতে দেখতে আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম।

"এই বাড়ি পার হয়ে চলে যাচ্ছিস যে!" প্রমথর চিৎকারে চমক ভাঙল।

"সরি," বলে গাড়িটা ব্যাক করে, সুভদ্রামাসির ড্রাইভওয়েতে ঢোকালাম।

বেল বাজিয়ে দেখি এক সায়েব দরজা খুলেছে। সেরেছে, বাড়ি ভুল করলাম নাকি!

প্রমথ চেঁচিয়ে উঠেছিল বলে, বাড়ির নম্বরটাও দেখিনি। প্রমথও মনে হল একটু হতচকিত। একেনবাবুর মুখ দেখে অবশ্য কিছুই বোঝা যায়না, কারণ উনি সবসময় একটা স্টেট অফ কনফিউসানের মধ্যে থাকেন!

আমাদের অবস্থা দেখে ভদ্রলোক মনে হল যেন একটু অ্যামিউজড। দরজাটা পুরোপুরি খুলে দিয়ে একটু সরে দাঁড়িয়ে বললেন, "আসুন, উনি আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।"

দরজা দিয়ে ঢুকলেই একটা ছোট্ট ফয়ার, আর তার বাঁ পাশে হল বসার ঘর। সুভদ্রামাসি সেখানেই ছিলেন।

"এসো, এসো, এত দেরি হল কেন? আমি তো ভাবলাম তিনটে চারটের মধ্যেই চলে আসবে।"

"সেই ভাবেই বেরিয়েছিলাম, কিন্তু জর্জ ওয়াশিংটন ব্রিজে আজ জ্যাম।"

"সেটাই রোহিত বলল, নিশ্চয় ব্রিজ বা টানেলে আটকা পড়েছ," সুভদ্রামাসি পরিষ্কার বাংলাতেই বললেন।

"এসো, তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই। এ হল রোহিত, রোহিত রয়। এককালে রিচার্ডের রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্ট ছিল। এখন অবশ্য ও একজন বিগ শট।"

আরে, ইনি তো বাঙালি! শুধু দেখতে সাহেবের মতো আর কথা বলেন ইংরেজিতে।

"একদম বাজে কথা, বিশ্বাস করবেন না," বলে রোহিত এগিয়ে এসে একে একে আমাদের সবার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন। আমি আর প্রমথ নিজেদের পরিচয় দিলাম।

সুভদ্রামাসি বললেন, "এদের একজন ফিজিক্সে ডক্টরেট, আরেকজন কেমিস্ট্রিতে।"

রোহিত চোখ কপালে তুলে বললেন, "আপনারা তো জিনিয়াস! বুঝলেন, ফ্রেশম্যান ইয়ারে ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রি — দুটো সাবজেক্টই ছিল আমার নাইটমেয়ার। কোনোমতে সি মাইনাস পেয়ে পাশ করেছি। এমন কি এখনও মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্ন দেখি, আবার ফিজিক্স কেমিস্ট্রি পরীক্ষা দিতে বসেছি, কিন্তু একটা প্রশ্নও বুঝতে পারছি না — ঘেমে নেয়ে অস্থির।"

"আপনি স্যার ভীষণ ফানি!" একেনবাবু মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন।

"দাঁড়ান, দাঁড়ান, আপনিও ফিজিক্স?"

"আর ইউ ম্যাড স্যার! আমার এঁদের মতো ডিগ্রি ফিগ্রি নেই — আমার বিদ্যে বি.এ পর্যন্ত।"

রোহিত কিছু বলার আগেই প্রমথ বলল, "আমাদের একেনবাবু একটু বিনয়ী। উনি ফিজিক্স কেমিস্ট্রির অনেক ঊর্দ্ধে — ক্রিমিনোলজির লোক।"

রোহিত সেটা শুনে খুব উৎসাহিত হলেন, "সত্যি! একদিন তাহলে আপনার সঙ্গে ভালো করে আলাপ করব। ঐ সাবজেক্টের কিছুই জানি না, কিন্তু খুব ফ্যাসিনেশন আছে।"

রোহিতের পরিচয় পরে আরেকটু বিশদ করে পেলাম। মা জার্মান। চেহারাটা মায়ের দিক থেকেই পেয়েছেন। জন্ম জার্মানিতে, তবে বড়ো হয়েছেন এদেশে। বাঙালির ছেলে হওয়া সত্ত্বেও, বাংলার সঙ্গে যোগাযোগ ছেলেবেলাতে ছিল না। ভারতবর্ষে প্রথম গেছেন বাবার মৃত্যুর পর, যখন কলেজে পড়তে ঢুকেছেন। পরে অবশ্য অনেকবারই গেছেন। একবার সুভদ্রামাসি আর রিচার্ডমেসোর সঙ্গেও গিয়েছিলেন। অ্যানথ্রপলজিতে আন্ডার-গ্রাজুয়েট করে মাস্টার্স করছিলেন, কিন্তু নেশা ছিল ফোটোগ্রাফির। তাই পড়াশুনো ছেড়ে হয়ে গেলেন ফ্রিলান্স ফোটো জার্নালিস্ট। সারা বিশ্ব ঘুরে ঘুরে ছবি তোলেন, আর সেই সম্পর্কে আর্টিকেল লেখেন। ন্যাশন্যাল জিওগ্রাফিক, লাইফ, টাইমস ইত্যাদি বড়ো বড়ো

ম্যাগাজিনেও ওঁর তোলা ছবি আর লেখা ছাপা হয়েছে। রোহিত অবশ্য বেশিক্ষণ থাকতে পারলেন না। ওঁর ফিঁয়াসে সেদিনই আসছেন লন্ডন থেকে। তাঁকে রিসিভ করতে এয়ারপোর্টে চলে গেলেন।

রোহিত চলে যেতে আমরা সবাই বসার ঘরে আরাম করে বসলাম। সুভদ্রামাসি দেখলাম রোহিতকে খুব স্নেহ করেন। বললেন, "অনেক গুণ ছেলেটার। এই বাড়িটা ওই আমাদের খুঁজে দিয়েছিল। ও অবশ্য বলে আমাদের নিউ ইয়র্কের অ্যাপার্টমেন্টের উপর লোভ ছিল বলে এই খোঁজাখুঁজিগুলো করেছে। তারপর যখন রিচার্ডের ক্যানসার ধরা পড়েছে তখনও প্রচুর সাহায্য করেছে আমাদের।"

"তোমাদের সেই নিউ ইয়র্কের অ্যাপার্টমেন্টে উনি থাকেন?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"হ্যাঁ, ওটা কিনেছে। কিন্তু থাকে আর ক'দিন, বাইরে বাইরেই তো ঘুরছে! এই তো আবার থাইল্যান্ড যাচ্ছে — ওখানকার জঙ্গলে গিয়ে ছবি তুলবে। এক্কেবারে মাথার স্থির নেই। একবার এটা করে — একবার ওটা ধরে। যাক, এবার এই বৃটিশ মেয়েটার সঙ্গে ভাব হয়েছে। যদি একটু ঠান্ডা হয়।"

সুভদ্রামাসির বসার ঘরটা সত্যিই বিশাল। সিলিংটা খুব উঁচু — যাকে এদেশে বলে ক্যাথিড্রাল সিলিং। সিলিং-এর দুই দিকে দু'টো বড়ো বড়ো স্কাইলাইট। একদিকে বিশাল একটা ফায়ার প্লেস। তার দুপাশে দেয়াল জুড়ে অনেক রকমের মুখোশ। আমি আর প্রমথ অবশ্য এগুলো দেখেছি। একেনবাবু এই প্রথম এলেন। সেগুলোর দিকে উনি বার বার তাকাচ্ছেন দেখে সুভদ্রামাসি বললেন, "এটা ছিল রিচার্ডের শখ। ঘুরে ঘুরে এগুলো সংগ্রহ করেছে।"

একেনবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে মুখোশগুলো দেখতে লাগলেন। তারপর ঘরটা একবার চক্কর দিয়ে চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, "আপনার বাড়িটা কিন্তু ম্যাডাম আউট অফ দ্য ওয়ার্লড।"

"আমাকে তুমি মাসিমা ডেকো," সুভদ্রামাসি বললেন। "কিন্তু বাড়িটা তো এখনও দেখইনি!"

"না না যতটুকু দেখেছি ম্যাডাম, মানে মাসিমা — সত্যি, এরকম জায়গা নিউ ইয়র্কে থেকে কল্পনা করা যায় না।"

"দেখেছেন," সুভদ্রামাসিকে বলল প্রমথ, "বাপির অ্যাপার্টমেন্টের কিরকম নিন্দা করছেন!"

"আরে ছি ছি স্যার, নিন্দা কখন করলুম? আপনি না স্যার, সত্যি!"

সুভদ্রামাসি সস্নেহে হেসে বললেন, "চলো একেন, তোমাকে বাড়িটা দেখিয়ে দিই।"

"আপনার কষ্ট হবে না তো?"

"আরে একটু কষ্ট হোক। হাঁটা চলা না করলে, পরে আরও কষ্ট হবে। আমাকে বরং ওই লাঠিটা দাও।"

তিন পা-ওয়ালা একটা লাঠি সোফার একপাশে কার্পেটের ওপর শোয়ানো ছিল। একেনবাবু সেটা তুললেন। সুভদ্রামাসিকে সোফা থেকে উঠতে আমি একটু সাহায্য করলাম। দেখলাম লাঠি নিয়ে সুভদ্রামাসি বেশ সহজেই হাঁটতে পারছেন। কিচেনে সুভদ্রামাসির কুক সুজাতা তখনও রান্না করছেন। কেরালার মহিলা, বেঁটে শক্তপোক্ত চেহারা। কোঁকড়া চুল টানটান করে খোঁপায় বাঁধা। মুখটা গোলগাল। তবু কোথায় যেন একটা কাঠিন্য আছে।

“সুজাতাকে তো তোমাদের মনে আছে?” আমরা মাথা নাড়লাম। একেনবাবুর সঙ্গে সুজাতার পরিচয় করিয়ে দিলেন সুভদ্রামাসি। “আমার বহুদিনের সাথি সুজাতা— সুখে দুঃখে সব সময়ে আমার পাশে আছে।”

সুভদ্রামাসি সত্যিই খুব সুইট। সুজাতা ওঁর কুক-কাম-হেল্পার, কিন্তু যতটুকু আমি দেখেছি কথায় / বার্তায় কে মনিব কে কর্মচারী — সেটা বোঝার উপায় নেই।

সুজাতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেই আপ্লুত স্বরে একেনবাবু বললেন, “ফুড স্মেলস ভেরি গুড।”

“থ্যাঙ্ক ইউ।”

কিচেনের সঙ্গে লাগোয়া ব্রেকফাস্টের জায়গা। সেখান থেকে ফ্যামিলি রুমে যাওয়া যায়। বসার ঘর দিয়েও যাওয়া যায়। বসার ঘরটা বাইরের অভ্যাগতদের জন্য। বিশেষ পরিচিতরা ভেতরে ফ্যামিলি রুমেই বসে। সেখানেও একটা ফায়ার প্লেস। ঘরের একদিকে শুধু কাচের দেয়াল। সেখান থেকে গাছপালা জঙ্গল দেখা যায়। উলটোদিকের দেয়ালে একটা সুন্দর স্ক্যান্ডেনেভিয়ান স্টাইলের এন্টারটেইনমেন্ট সেন্টার। তার একদম নীচে রয়েছে ডিভিডি প্লেয়ার। মাঝখানে বেশ বড়ো একটা টিভি। একেবারে উপরের তাকে সুদৃশ কাচের জারের মধ্যে একটা ছোট্ট নারীমূর্তি — সাইজে ইঞ্চি পাঁচ-ছয়ের মতো হবে। উপরটা সোনার নীচটা রূপোর, খুবই আন-ইউসুয়্যাল!

“আগে তো এটা দেখিনি, উপরটা কি সত্যিই সোনার?” প্রমথ প্রশ্ন করল।

“গোল্ড-প্লেটিং,” সুভদ্রামাসি উত্তর দিলেন। “আগে বেডরুমে ছিল, তাই দেখনি।”

আমি জিজ্ঞেস করলাম, “কোত্থেকে কিনলে?”

“এর বয়স এক-শো বছরেরও বেশি। আমার দাদুর বাবা তাঁর বৌমা, মানে আমার দিদিমাকে দিয়েছিলেন।” তারপর একটু হেসে বললেন, “এটার আবার একটা হিস্ট্রি আছে। মধ্যে এটা একবার চুরিও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরে চোরই আবার এটা ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়।”

“বেশ অদ্ভুত চোর! কবে চুরি হয়েছিল?”

“সে আমার জন্মের আগের ঘটনা। এটা থাকত ঠাকুরঘরে — একটা কাঠের বাক্সের মধ্যে। বাক্সটা আরও পুরোনো, আমার দাদুর ঠাকুমার বাক্স! মায়ের যেদিন বিয়ে, সেদিন সকালে দিদিমা ঠাকুর ঘরে গিয়ে দেখেন বাক্সটা উধাও। এই মূর্তিটা ছিল মায়ের ভীষণ প্রিয়। তাই দিদিমা বলেছিলেন মা যখন শ্বশুরবাড়িতে যাবে, তখন এটাও সঙ্গে যাবে। চুরি গেছে শুনলে মা ভীষণ কষ্ট পাবে বলে বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত মাকে কিছু জানাননি দিদিমা। মা শ্বশুরবাড়ি চলে যাবার পর কয়েকদিন বাদেই তুলো আর কাপড়ে মুড়ে মূর্তিটা কেউ জানলার ফাঁক দিয়ে ঘরে ফেলে পালিয়ে যায়।”

“ভেরি স্ট্রেঞ্জ ম্যাডাম... মানে মাসিমা,” একেনবাবু বললেন।

“আমার দিদিমা আমায় বলেছিলেন, চোর নিশ্চয় ভেবেছিল, এটা লক্ষ্মীমূর্তি।

জাগ্রত লক্ষ্মী চুরি করলে ঘরে অলক্ষ্মী আসে। সেই ভয়েই ফেরৎ দিয়েছিল ওটা।”

“ননসেন্স!” প্রমথ বলল। “আপনি এসব বিশ্বাস করেন?”

“ছেলেবেলায় করতাম, এখন আর করি না। এখন মনে হয় ওটা কোনো প্র্যাকটিক্যাল জোক — চেনাজানা কেউ করেছিল। তবে দাদুর নাকি খুব মন খারাপ হয়েছিল বাক্সটার জন্য। ওটা ছিল দাদুর ঠাকুমার। দাদুর বাবা যখন খুব ছোটো তখন উনি মারা যান। মারা যাবার সময়ে নাকি বলে গিয়েছিলেন, ওটা যেন ছেলেকে দেওয়া হয়।”

ফ্যামিলি রুমের যেদিকে কাচের দেওয়াল তার লাগোয়া দেয়ালে একটা নীচু বিল্ট-ইন বইয়ের আলমারি। তার নীচের দুটো তাকই বইয়ে ঠাসা। আলমারির উপরে সুন্দর ফ্রেমে-বন্দি দুটো ফোটো, পাশে একটা চামড়া দিয়ে বাঁধানো খাতা, আর তার ওপরে একটা বেশ মোটা ডয়েরি বা নোটবই। চামড়ায় বাঁধানো খাতার উপরে বড়ো করে লেখা 'আওয়ার ফ্যামিলি'। ফোটোগ্রাফ দুটোর একটা রিচার্ডমেসোর, অফিসে বসে কাজ করছেন। আরেকটা কম বয়সি একটা ছেলের। অনুমান করলাম সুভদ্রামাসির সেই অ্যাডপ্টেড ছেলে। দেয়ালে বেশ কয়েকটা ফ্যামেলি পোট্রেট টানানো। সুভদ্রামাসির বাবা-মা আর দাদু-দিদিমার ছবি। সুভদ্রামাসির কাছে শুনলাম যে রিচার্ডমেসো নাকি কাঠের কাজ করতে খুব ভালোবাসতেন। উনি নিজেই কাঠের ফ্রেম তৈরি করে ছবিগুলোকে লাগিয়েছেন।

প্রমথ ফিসফিস করে বলল, "রিচার্ডমেসো নিশ্চয় শ্বশুরকে দেখতে পারতেন না।"

আমি অবাক চোখে তাকাতে বলল, "দেখছিস না, দাদু-দিদিমার ছবি বাঁধিয়ে রেখেছেন,

কিন্তু ঠাকুরদা-ঠাকুরমা মিসিং!"

"চুপ কর, ইডিয়ট।" আমি বিরক্ত হয়ে বললাম।

সুভদ্রামাসির দাদুর ছবিটা ইন্টারেস্টিং। মাথায় পাগড়ি বাঁধা — বেশ রাজকীয় ছবি। সুভদ্রামাসির কাছে শুনলাম যে উনি এবং ওঁর বাবা — দুজনেই মধ্যপ্রদেশে কোনো এক রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। রিচার্ডমেসোর সম্পর্কে আরও একটা জিনিস সুভদ্রামাসির কাছে জানলাম। কাঠের কাজ ছাড়া রিচার্ডমেসোর আরেকটা ব্যাপারে বিরাট উৎসাহ ছিল — সেটা হল জিনিওলজি। দুই পরিবারের ফ্যামিলি-ট্রি তৈরি করছিলেন তিনি।

'আওয়ার ফ্যামিলি' বলে যে বাঁধানো খাতাটার কথা লিখেছি — সেটা হল ওঁর সেই কাজের অসমাপ্ত ফসল।

"কাজটা তো খুব সহজ ব্যাপার নয়," আমি বললাম।

"ঠিকই বলেছ। আমেরিকা বা ইউরোপে হয়তো একটু সহজ। ওদের চার্চে খোঁজ করলে অনেক খবরই উদ্ধার করা যায়। অবশ্য তার জন্য নানান জায়গায় যেতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশে তো সেই সুবিধা নেই। শুনেছি পুরীর পান্ডাদের কাছে কিছু খবর থাকে। যাই হোক, ওটাই ছিল ওর হবি। একজন প্রফেশানাল জিনিওলজিস্টের সাহায্যও মাঝেমধ্যে নিয়েছে। আমি বলতাম শুধু শুধু পয়সা নষ্ট করছ। ও বলত, পয়সা কার জন্য রেখে যাব বলো।" কথাটা বলতে বলতে সুভদ্রামাসির মুখটা কেমন যেন করুণ হয়ে গেল। নিশ্চয় ছেলের কথা মনে পড়ছে।

আমি আলোচনার মোড় ঘোরানোর জন্য খানিকটা অভদ্রের মতোই বলে ফেললাম, "সুভদ্রামাসি, আমার কিন্তু খিদে পেয়ে যাচ্ছে।"

"হ্যাঁ, চলো, সুজাতা নিশ্চয় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।"

কী খেলাম সেটা বর্ণনা করে পাঠকদের চটিয়ে দিতে চাই না। এটুকু বলতে পারি ওই খাওয়ার জন্য ৩৫ মাইল কেন, আমি ১০০ মাইল যেতেও রাজি।

খাওয়াদাওয়ার পরে সুভদ্রামাসি একটা খাম বার করে আমায় দিলেন। "এটা তোমার মা-কে দিও, খুশি হবে।"

"কী এটা দেখতে পারি?"

"নিশ্চয়।"

খাম থেকে বের হল একটা ব্ল্যাক-এন্ড-হোয়াইট ছবি। দুই কিশোরী গলা জড়াজড়ি করে বসে আছে। তাদের সামনে ছোটো বাক্সের উপর যেটা শোয়ানো, সেটা চিনতে অসুবিধা হল না — কাচের জারের মধ্যে রাখা নারীমূর্তিটা।

"এঁরা কারা বলো তো?" সুভদ্রামাসি জিজ্ঞেস করলেন।

"তোমার ছোটোবেলার ছবি?"

"না, আমার মায়ের আর তোমার দিদিমা'র।"

"মাই গড, এত পরিষ্কার ছবি!" আমি সত্যিই একেবারে হতবাক। আমাদের বাড়ির পুরোনো অ্যালবামে মায়ের ছেলেবেলার ছবি আছে। আমার দিদিমার বিয়ের ছবিও আছে। কিন্তু সেগুলোর এত বিবর্ণ চেহারা, এই ছবির সঙ্গে কোনো তুলনাই হয় না। এরকম চমৎকার রেসলুশ্যান, ভালো ক্যামেরা ছাড়া এখনও পাওয়া যায় না।

সুভদ্রামাসি বললেন, "এটা একটা পুরোনো ছবি, আমার কাছে ছিল। রোহিত কাউকে দিয়ে কম্পিউটার আর কীসব ব্যবহার করে এটা করিয়েছে।"

"অ্যামেজিং স্যার, ট্রুলি অ্যামেজিং!" ছবিটা হাতে নিয়ে মাথা দোলাতে দোলাতে একেনবাবু বললেন।

"মা সত্যিই ভীষণ খুশি হবে এটা পেয়ে। কবে এটা করালে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"তোমাদের যেদিন ফোন করলাম, সেদিনই এটা পেলাম। তখনই ভাবলাম ভালোই হল — তুমি যাচ্ছ, তোমার হাত দিয়েই ছবিটা পাঠিয়ে দেব। একটা চিঠিও আছে ওর মধ্যে — মাকে মনে করে দিও।"

আমরা যখন সুভদ্রামাসির বাড়ি থেকে ফিরলাম, তখন রাত প্রায় বারোটা। একেনবাবু ঘুমকাতুরে, এগারোটা বাজতে না বাজতেই বিছানা নেন। সকালে ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে সুভদ্রামাসির গল্প হল। ছবিটার কথাও উঠল।

একেনবাবু বললেন, "বুঝলেন স্যার ছবিটা দেখতে দেখতে আমার মনে পড়ছিল 'লাইট অফ এশিয়া'র কথা।"

"তার মানে?" প্রমথ জিজ্ঞেস করল।

"মানে হিমাংশু রাইয়ের ফিল্ম 'লাইট অফ এশিয়া'-র কথা বলছি স্যার। ওই ফিল্মের কতগুলো স্টিল ছবি একটা জার্মান ওয়েবসাইটে কিছুদিন আগে দেখেছিলাম। সেগুলোও ছিল এরকম স্পষ্ট। অথচ স্যার ঐ একই ফিল্মের স্টিল অন্য কোনো বইয়ে দেখুন। সেই ছবিগুলোতে মানুষ বসে আছে না হনুমান — বোঝার উপায় নেই।"

"আপনি মশাই এত ওয়েবসাইট দেখতে শুরু করলেন কবে থেকে?" প্রমথ জিজ্ঞেস করল। " এমনি তো ভাব দেখান, কম্পিউটার ইন্টারনেট — কিছুই আপনার মাথায় ঢোকে না!"

"সত্যি স্যার, প্রমথবাবু এমন করেন না!" একেনবাবু অনুযোগ-ভরা চোখ নিয়ে আমার দিকে তাকালেন। প্রমথকে বললেন, "আমি কি স্যার টেকনোলজির কিছু জানি নাকি? আপনারাই তো যা সার্ফ করতে শিখিয়েছেন। ছবিটা হঠাৎ চোখে পড়েছিল তাই বললাম।"

"গুড, তাহলে শুনুন, ব্যাপারটা কি," প্রমথ বিজ্ঞের মতো বলল। "এগুলোকে বলা হয় ডিজিটাল এনহ্যান্সিং। এনলার্জড ছবিকে অসংখ্য ছোটো ছোটো বিন্দু বা পিক্সেল দিয়ে ভাগ করে, নানা রকম অ্যালগরিদম ব্যবহার করে সেই বিন্দুগুলোর রং বেশি কালচে বা বেশি সাদা করা হয়। ফলে ছবির রেসল্যুশন বেড়ে যায়।"

প্রমথর এই বিজ্ঞ বিজ্ঞ কথা আমি অনেক সময়ই বুঝি না। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় পুরো গুলতাপ্পি চালাচ্ছে। আমি একেনবাবুর দিকে তাকিয়ে বললাম, "কিছু বুঝলেন মশাই?"

"আবছা আবছা বুঝছি স্যার। উনি বড়ো কঠিন কঠিন শব্দ ব্যবহার করেন।"

আমি প্রমথকে চ্যালেঞ্জ করলাম, "তুই এত জানলি কোত্থেকে?"

"এটা সবাই জানে। তুই যে জানিস না তোর লজ্জা পাওয়া উচিত। আবার ফিজিক্স পড়াচ্ছিস!"

একেনবাবুর চিন্তা ইতিমধ্যেই অ্যাজ ইউসুয়্যাল বোঁ করে অন্যদিকে চলে গেছে, "বেশ আছেন স্যার আপনারা, কেমন দুজনে দেশে যাচ্ছেন!"

"তা আপনি গেলেও তো পারেন, আপনার পা কে বেঁধে রেখেছে!" আমি বললাম।

"কী যে বলেন স্যার। এই সময়ে গেলে পনেরো-শো ডলারের ধাক্কা।"

"আপনিও তো মশাই মহা হাড়-কেপ্পন!" প্রমথ বলল, "দাঁও মেরে মোটা অঙ্কের ফুলব্রাইট বাগিয়েছেন — সেখান থেকে পনেরোশো ডলার খসাতে পারেন না।"

"দেখুন স্যার," আমার দিকে অসহায় মুখ করে তাকিয়ে একেনবাবু বললেন, "প্রমথবাবু খালি আমাকে ফুলব্রাইটের খোঁচা দেন — যেন আমি কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা পাচ্ছি!"

"ওর কথা শুনবেন না," আমি বললাম। "তাছাড়া আমরা চলে গেলে একজনকে তো অ্যাপার্টমেন্টটা সামলাতে হবে!"

"তাহলে?" একেনবাবু সমর্থন পেয়ে প্রমথকে উদ্দেশ্য করে বললেন।

"তাহলে থাকুন, শুধু শুধু আফশোস করছেন কেন! হ্যাঁ দেখবেন, এটাকে একটা খাটাল বানিয়ে ফেলবেন না। আপনার যেরকম জিনিসপত্র ছত্রাকার করে রাখার হ্যাবিট।"

## ।। ৩।।

কলকাতায় পৌঁছে ক'দিন এবাড়ি ওবাড়ি দৌড়াদৌড়ি করতে করতে কেটে গেল। আমাদের আত্মীয়-স্বজনের সংখ্যা অল্প নয়। প্রায় দু-বছর বাদে আসছি, তাই মা জোর করে সবার সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে গেলেন। পেটপুরে প্রচুর নলেনগুড়ের সন্দেশ, জলভরা, রসগোল্লা, সরভাজা, আর রাবড়ি খেলাম। তারপরেই শুরু হল ঝামেলা। মা সুর ধরলেন, "এবার একেবারে বিয়ে করে আমেরিকায় ফিরে যা।" আমি যত বলছি, আমার বিয়ে করার এখন কোনো ইচ্ছে নেই। মা তত চেপে ধরেন। মা'র ধারণা আমি এবার বিয়ে না করলে কোনো আমেরিকান মেয়েকে বিয়ে করে বসব। "দেখ, আমি ভালো ইংরেজি জানি না, তোর বউয়ের সঙ্গে ইংরেজিতে যেন কথা বলতে না হয়।"

শেষমেষ আমি বলতে বাধ্য হলাম, "তুমি যদি এরকম শুরু কর, তাহলে আমি টিকিট চেঞ্জ করে কালকেই চলে যাব।"

মা খুব কষ্ট পেলেন কথাটা শুনে, কিন্তু এছাড়া মাকে থামানোর আর কোনো উপায় ছিল না। মা বললেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, আর বলব না।"

কিন্তু হালটা যে ছাড়েননি সেটা বুঝলাম। কারণ একটু বাদেই বললেন, "চল আজ

বিকেলে সুলতার বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। অনেকদিন যাওয়া হয়নি। তোকেও দেখতে চেয়েছে।"

সুলতামাসির মেয়ে বন্দনা আমার থেকে বছর তিনেকের ছোটো। এক সময়ে সুলতামাসিরা আমাদের পাশের বাড়িতে থাকতেন। ছেলেবেলায় বন্দনা আর আমি একসঙ্গে অনেক খেলাধুলো করেছি। পরে সুলতামাসিরা যোধপুর পার্কে চলে গেলেও প্রায়ই আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হত। হয় আমরা যেতাম অথবা ওঁরা আসতেন।

খেলাধুলোর বয়স পার হবার পর বন্দনার সঙ্গে গল্প-আড্ডা অনেক হয়েছে। ভারী সহজ, স্বচ্ছ মেয়ে। সোজাসুজি কথা বলে। কিছু কিছু মেয়ে আছে যারা বড়ো হতে হতে ব্লসম করে। বন্দনা সেরকম। ছোটোবেলায় বোঝা যেত না, কিন্তু বছর তেরো-চোদ্দতেই ও দারুণ রূপসি হয়ে উঠল। যাদবপুরে আমি যখন এম.এসসি পড়ছি, তখন ও ইংলিশ অনার্স নিয়ে বি.এ পড়ছে। আমাদের ক্লাসের একটা ছেলে ওকে খুব জ্বালাচ্ছিল। বন্দনা আমাকে একদিন সেকথা বলাতে আমি বললাম, "তোকে দেখে সবাই পাগল হয়ে যায়, কী করবি বল?"

"কই, তুমি তো পাগল হও না?"

"সে তো তোকে ছোটোবেলা থেকে দেখেছি বলে। ছোটোবেলায় মাথায় দুটো বিনুনি করে হাঁড়ির মতো একটা মুখ নিয়ে ঘুরে বেড়াতিস। সেটা চোখ বুজে একবার ভেবে নিলেই মোহ কেটে যায়!"

সেই শুনে বন্দনা ভীষণ হাসল। "খুব বিচ্ছিরি চেহারা ছিল আমার — তাই না?"

"ভীষণ," আমি গম্ভীর মুখ করে বললাম।

"তোমারও তো কদম ফুলের মত খাড়া খাড়া চুল ছিল।"

"সে তো এখনও আছে।"

বন্দনা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "নাঃ, এখন আর অতটা নেই।"

হঠাৎ আমার কী যে হল জানি না! বললাম, "বন্দনা, আমার সঙ্গে প্রেম করবি?"

বন্দনার মুখটা কেমন যেন হয়ে গেল, চোখটা ছলছল করে উঠল। বলল, "তুমি আমার বন্ধু, বাপিদা! তোমাকে হারাতে চাই না।"

সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়েছিলাম। "যাঃ, তোর সঙ্গে ফাজলামি করছিলাম।"

আমি জানি বন্দনা বুঝেছিল, সেটা ফাজলামি নয়। আর আমিও বুঝেছিলাম বন্দনার মনের কথা। ও কোনো কথাই কখনো অস্পষ্ট করে বলেনি।

তার কিছুদিন বাদেই আমি আমেরিকায় চলে এলাম। তারপর এক আধবারই দেখা হয়েছে। ও এম.এ পাশ করে মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানিতে ঢুকেছিল। পরে সেটা ছেড়ে দিয়ে শুনেছি একটা বুটিক শপ খুলেছে।

অনেকদিন বাদে সুলতামাসিদের বাড়ি গিয়ে আমার ভালোই লাগল। মেসোমশাই সবে রিটায়ার করেছেন। এখন মাথায় ঢুকেছে একটা পোলট্রি ফার্ম করবেন। বেশ কিছু বইপত্র জোগাড় করে পড়ে ফেলেছেন। মেমারি-তে ওঁর দেশের বাড়িতে ফার্মটা করা হবে। সুলতামাসির তাতে প্রবল আপত্তি। মেসোমশাই সত্যিই কতটা ফার্ম করতে চান, না সুলতামাসিকে জ্বালাতে চান — সেটা অবশ্যই একটা প্রশ্ন। কিন্তু চায়ের আড্ডাটা ভালোই জমল।

চা খাওয়ার পর বন্দনা একটু ভিতরে যেতে সুলতামাসি বললেন, "বাপি, আমাদের সবার ইচ্ছে, তোমার আর বন্দনার বিয়ে হোক। কিন্তু তোমরা এযুগের ছেলেমেয়ে —

তোমাদের তো আমরা জোর করতে পারব না। বন্দনার বহু সম্বন্ধ এসেছে, কিন্তু ও রাজি হয়নি। আমার ধারণা তোমাকে বিয়ে করতে আপত্তি করবে না। এখন তোমার ওকে পছন্দ হবে কিনা সেটাই প্রশ্ন।”

আমি এরকম সরাসরি প্রস্তাবে যথেষ্ট হতচকিত হলাম। তবে বুঝতে পারলাম যে সুলতামাসি এটা মার সঙ্গে পরামর্শ করেই করেছেন। ওঁরা জানেন না, কিন্তু বন্দনার মনের কথাটা আমি খুব স্পষ্টই জানি। এই অবস্থায় সবচেয়ে সহজ পথটাই আমি নিলাম। বললাম, “সুলতামাসি, মা'কে বলেছি এই মুহূর্তে আমি বিয়ের কথা ভাবছি না।”

“তোমাকে এক্ষুনি আমরা বিয়ে করতে বলছিও না,” সুলতামাসি বললেন।

আমি এবার একটু মুশকিলে পড়লাম।

“দেখো, তোমরা দুজনে কথা বলো। তোমরা যা চাইবে তাই হবে।” বলে সুলতামাসি, মা আর মেসোমশাই অদৃশ্য হলেন।

এইরকম সমস্যায় আমি পড়ব বলে প্রস্তুত হয়ে আসিনি। কি করণীয় ভাবছি, তখন বন্দনা ঘরে ঢুকল।

“একি তুমি একা বসে আছ, আর সবাই কোথায়?”

“আর সবাই আমাকে সমস্যা দিয়ে চলে গেছেন।”

“কী সমস্যা?”

“তোকে বিয়ে করতে চাই কিনা জানতে চান।”

“তুমি কি বললে?” বন্দনার মুখটা ফ্যাকাশে, গলার স্বরেও একটা চাপা উত্তেজনা।

আমি বললাম, “এই মুহূর্তে আমার কাউকে বিয়ে করার প্ল্যান নেই।”

বন্দনা আমার হাত দুটো চেপে ধরল, “থ্যাঙ্ক ইউ।”

“তার মানে?”

“তোমাকে 'না' বলতে আমার খুব কষ্ট হত বাপিদা!”

“তুই কি বিয়ে করবি না ঠিক করেছিস?”

বন্দনা চুপ করে রইল।

এইবার আমি ধরতে পারলাম। “লাকি ম্যানটা কে?”

বন্দনা লাল হল। “কী করে বুঝলে কেউ আছে, আমারও তো তোমার মতো এখনই বিয়ে না করার প্ল্যান থাকতে পারে।”

“না পারে না, নইলে গালটা টমাটোর লাল হত না। বল, নামটা কি?”

বন্দনা লাজুক মুখে বলল, “প্রভাস মিত্র।”

“কী করেন এই প্রভাস মিত্র?”

“শান্তিনিকেতনে ইংরেজি পড়াচ্ছে।”

“তাহলে সমস্যাটা কী?”

“সমস্যাটা কুল-ঠিকুজির। বিশ্বাস করতে পারো?”

“মাই গড! তুই ব্রাহ্মণ আর ও কায়স্থ বলে, না কুষ্ঠি মিলছে না?”

“আরও গভীর। কায়স্থর বাড়িতে মানুষ হওয়া রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া একটা ছেলে।”

“ননসেন্স! ও যে চমৎকার ছেলে — সে তো আমি ওকে না দেখেও বুঝতে পারছি।”

“কী করে?”

“কারণ তুই ওকে পছন্দ করেছিস!”

বন্দনা কাছে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল, “আই মিসড্ ইউ বাপিদা!”

বন্দনা কী মেখেছে জানি না। কিন্তু সেই সুগন্ধের সঙ্গে ওর শরীরের ঘ্রাণ আর নৈকট্য

মুহূর্তের জন্য আমাকে আচ্ছন্ন করল। কিন্তু ঘোর কাটিয়ে আমি বললাম, "ভালো কথা, আমি আর প্রমথ কাল শান্তিনিকেতনে যাচ্ছি।"

"সত্যি! তাহলে ওর সঙ্গে দেখা কোরো, খুব খুশি হবে।"

"তুইও চল না।"

"না, মেলার ভীড়ে যেতে আমার ভালো লাগে না। আমি মেলা শেষ হলে যাব।"

সুলতামাসিকে সেদিন কী ভাবে এড়িয়েছিলাম — সেটা এ কাহিনির সঙ্গে যোগ করব না। প্রভাস এই গল্পের সঙ্গে যুক্ত, তাই বন্দনার কথাটা একটু ফলাও করেই বলা হয়ে গেল। শুধু এটুকু বলি যে পরে বন্দনার হয়ে আমিও ওকালতি করলাম সুলতামাসি আর মেসোমশাইয়ের সঙ্গে। মনে হল যে ওঁরা এবার হাল ছেড়েছেন। ওঁদের ধারণা ছিল, আমি এলে হয়তো একটা কিছু হয়ে যাবে। আমিও ওঁদের মেয়ের সঙ্গে সুর মেলাব — সেটা বোঝেননি। আমার মায়ের উপরও রাগ হল। মা প্রভাস মিত্রের ব্যাপারটা জানতেন না। সব শুনে সুলতামাসির উপরই চটে উঠলেন।

"আচ্ছা, এই ব্যাপারটা জানা সত্ত্বেও, কেন তোর সঙ্গে সম্বন্ধ করার চেষ্টা করছিল?"

আমি মাকে খোঁটা দিলাম, "তোমারও তো সন্দেহ আমি কোনো আমেরিকান মেয়ের সঙ্গে ঘুরছি, কই তুমি তো তাতে হাল ছাড়ছ না!"

"তুই সত্যিই ঘুরছিস?"

মা'র করুণ মুখ দেখে আমার খারাপ লাগল। মাকে জড়িয়ে ধরে বললাম, "না, তোমাকে খ্যাপাচ্ছি!"

## ।। ৪ ।।

এর আগে আমি বার দুই শান্তিনিকেতনের পৌষমেলায় গেছি। দু'বারই প্রমথর সঙ্গে। পূর্বপল্লীতে প্রমথর বড়োমাসির একটা বাড়ি আছে। বাড়িটা দেখাশোনা করার জন্য একজন লোক আছে। নাম বনমালী। সেই ঘরদোর পরিষ্কার রাখে। কেউ ওখানে গিয়ে থাকলে রান্নাবান্না করে দেয়। এমনিতে প্রায় সারা বছরই বাড়িটা ফাঁকা পড়ে থাকে। কেবল পৌষমেলার সময় বহু লোক সেখানে এসে হাজির হয়। এবার প্রমথ বড়োমাসিকে অনেক আগে থেকেই বলে রেখেছিল কাউকে ঘর না দিতে। তাতে কাজ কিছুটা হয়েছিল। শুনলাম ওঁর এক বন্ধুর ছেলে আর তার বউ শুধু আসছে। তার মানে আমরা চারজন। বাড়িতে তিনটে ঘর — দুটো বাথরুম। সুতরাং খুব আরামেই থাকা যাবে।

প্রমথ এসি চেয়ার কার বুক করেছিল। এর আগে সেকেন্ড ক্লাসে চেপে গিয়েছি। সিট রিসার্ভ করতাম, কিন্তু লাভ বিশেষ হত না। ডেইলি প্যাসেঞ্জাররা, যারা অনেকে টিকিটও কাটে না, তারা জোর করে এসে ঠেলেঠুলে বসত। এসি চেয়ার কার দেখলাম সেদিক থেকে চমৎকার। ডেইলি প্যাসেঞ্জারদের জুলুমবাজি নেই। টিকিট চেকার আসে এবং টিকিট চেক করে। সিটগুলোও গদির — বসে আরামই লাগে। মেঝেটা একটু অপরিস্কার। কিন্তু একটু বাদেই একটি বাচ্চা এন্টারপ্রেনার ছোট্ট একটা ঝাড়ু নিয়ে তার কিছুটা সংস্কার করল। প্রায় সবাই দেখলাম কিছু না কিছু ছেলেটাকে দিল।

প্রমথ মন্তব্য করল, "ভিক্ষে করার থেকে এটা ভালো।"

হয়তো তাই। কিন্তু এতটুকু ছেলে পয়সার জন্য খেলাধুলো না করে কাজ করছে ভাবতে মনটা কেমন জানি করে উঠল। প্রমথকে সেটা বলতেই ও ধাতানি দিল,

"তিন দিনের যোগী ভাতকে বলিস পেস্‌সাদ। ওসব সায়েবি বোলচাল ছাড় তো। কাজ করে খাচ্ছে — একটা ওয়ার্ক এথিক্স গ্রো করছে। ভিক্ষে করলেও তো মুখ ব্যাঁকাতিস!"

গাড়ি চলতে শুরু করার কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখি রবীন্দ্রসংগীত শুরু হয়েছে। সাউন্ড সিস্টেমটা অবশ্য খুব একটা ভালো নয়। প্রমথ একটা মোটা গল্পের বই নিয়ে এসেছে, সেটায় মন দিল। আমি একটা খবরের কাগজ কিনেছিলাম হাওড়া স্টেশনে। সেটা খুলে পড়তে গিয়ে নজর পড়ল অন্যপাশে বসা ডিজাইনার সার্ট আর জিন্স পরা এক যাত্রীর দিকে। বিদেশ থেকে অল্পদিন হল এসেছেন বোঝা যায়, মুখে এখনও চকচকে ভাবটা আছে। লম্বা চেহারা, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা, নাকের নীচে একটা চিলতে গোঁপ। জুতোটাও বেশ ফ্যান্সি। শৌখিন লোক বুঝতে অসুবিধা হয় না। ভদ্রলোক আমার দিকে তাকাতেই আমি চোখটা সরিয়ে নিলাম। হাঁ করে তাকিয়ে আছি দেখলে কী ভাববেন। কিন্তু কেন জানি না পত্রিকা পড়ার ফাঁকে বার বার ভদ্রলোকের দিকে আমার চোখ চলে যাচ্ছিল। ভদ্রলোক বসেছেন জানলার ধারে। কিন্তু বাইরের দিকে না তাকিয়ে মন দিয়ে একটা মোটা চামড়ায় বাঁধানো খাতা থেকে কী জানি পড়ছেন, আর একটা ক্যালকুলেটর দিয়ে নানান হিসেব করছেন।

কিছুক্ষণ বাদে আমায় একবার বাথরুমে যেতে হল। বাথরুমটা বন্ধ, কেউ ওখানে রয়েছে। দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি, হঠাৎ দেখি পেছনে সেই ভদ্রলোক এসে দাঁড়িয়েছেন। ভদ্রলোকের গলায় সোনার নেকলেসটা আগে নজরে পড়েনি। চেনের নীচে "BS" লেখা লকেট ঝুলছে। নিশ্চয় নামের আদ্যক্ষর। কিন্তু কী ট্রাজেডি — BS দেখলে প্রথমেই মনে আসে Bull Shit!

আমি "হ্যালো" বললাম।

উত্তরে উনিও একটু হেসে "হ্যালো" বললেন।

"বাঙালি?" আমি ইংরেজিতেই জিজ্ঞেস করলাম।

"না, কিন্তু বাংলা জানি।" উচ্চারণটায় একটু হিন্দি টান আছে।

আমি বললাম, "বাঃ, বাংলা তো আপনি বাঙালিদের মতন বলেন।"

"কলকাতায় বহুদিন ছিলাম।"

"আর এখন?"

"নিউ ইয়র্কে।"

"আরে! আমিও তো নিউ ইয়র্কে থাকি।"

"তাই নাকি! স্মল ওয়ার্লড।"

"পৌষমেলায়?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"ওয়েল, সর্ট অফ। তবে আমায় আজকেই ফিরে যেতে হবে।"

"সেকি মেলা তো সবে শুরু হচ্ছে!"

"আই হ্যাভ সাম বিজনেস।"

এই সময়ে বাথরুমের লোকটি বেরিয়ে আসায় কথাবার্তা আর হল না। আমি ফিরে আসার বেশ কিছুক্ষণ বাদে ভদ্রলোক ফিরলেন। ফিরেই দেখলাম চোখ বুজে একটা ঘুম লাগিয়েছেন। নামটাও জানা হল না। কিছুক্ষণ জানলা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে দেখতে

চললাম। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়ালও করিনি। এসে পর্যন্ত এত হইচই-এর মধ্যে কেটেছে যে জেট ল্যাগটা এখনও ভালো করে কাটেনি। প্রমথর ডাকে ঘুম ভাঙল, তখন বোলপুরে পৌঁছে গেছি!

আমরা যখন প্রমথর বড়োমাসির বাড়ি পৌঁছলাম তখন বেলা প্রায় দুটো। বনমালী আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। আমাদের জন্য দুটো সিঙ্গল বেড পাতা ঘর পরিষ্কার করে রেখেছে। সেখানে ব্যাগ রাখতে রাখতে প্রমথ জিজ্ঞেস করল, "আর যাদের আসার কথা তাঁরা এসেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"তাঁরা কোথায়?"

"মেলায় গেছেন। একটু বাদেই ফিরবেন।"

কথা শেষ হতে না হতেই বাইরের থেকে একটা গলা শুনলাম, "এই যে আপনারা এসে গেছেন!"

তাকিয়ে দেখি বেঁটেখাটো ফর্সা নাদুসনুদুস চেহারার এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকেছেন — পেছন পেছন একজন মহিলা। ভদ্রলোকের গলায় জড়ানো একটা মেরুন রঙের মাফলার। গায়ে উলের ফুলহাতার সাদা সোয়েটার। প্যান্টটা সম্ভবতঃ পলিয়েস্টারের, চকচকে কালো। ভদ্রমহিলাও গৌরাঙ্গী। ভদ্রলোকের সমান বা একটু লম্বাই হয়তো হবেন। মুখটা ঢলঢলে। পরনে লালপেড়ে সবুজ শাড়ি আর ম্যাচিং ব্লাউজ। কপালে লাল রঙের একটা বড়ো গোল টিপ। মহিলাকে সুন্দরী বলা যাবে না — কিন্তু একটা আলগা শ্রী আছে।

"নমস্কার, আমি শ্যামল বসু। আমার স্ত্রী রিতা।"

আমরাও উঠে দাঁড়িয়ে নিজেদের পরিচয় দিলাম।

ভদ্রলোক খুব হাসিখুসি। অল্প দুচার কথার পর বললেন, "বুঝলেন, কাল থেকে আপনাদের আসার জন্য দিন গুনছি। একা বৌয়ের সঙ্গে আর কতক্ষণ গল্প করা যায় বলুন!" ;

প্রমথ রিতার দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনার বরের সাহস তো কম নয়!"

"বুঝুন কি রকম লোকের সঙ্গে ঘর করছি!" এক ঝলক হেসে রিতা অদৃশ্য হলেন।

শ্যামলবাবু একটু নাটকীয় ভঙ্গিতে গলাটা নামিয়ে বললেন, "আপনারা আসবেন বলে মাছ রান্না করেছে ও। অথচ দেখুন, কালকে কত কাকুতি মিনতি করলাম। বললাম, 'রাত্রে একটু মাছ করবে?' আমায় মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, 'এসেছ মেলা দেখতে, অত মাছ মাছ করছ কেন;' এবার বুঝলেন তো শুধু গল্পের জন্য নয়। আপনারা এসেছেন— খাওয়াদাওয়াটাও ভালো হবে আশা করছি।"

আমি বললাম, "আচ্ছা এটা কেন করছেন! আমরা তো আপনাদের অতিথি নই। সবাই বেড়াতে এসেছি।"

"এসব বলে আমার বউকে বিগড়ে দেবেন না তো। দিব্বি ভালো খাওয়া জুটবে ভাবছিলাম।"

" মেলা কেমন দেখলেন?" প্রমথ জিজ্ঞেস করল।

"চমৎকার। তবে নাকে বেশ ভালো করে রুমাল চেপে ঘুরবেন। জল ছেটাচ্ছে বটে, কিন্তু তাও অসম্ভব ধুলো।"

"ভিড় কিরকম?"

"এখনও খুব দেখলাম না। শুনলাম ভিড় শুরু হবে আজ বিকেল থেকে। সকালে এলেন না— ফাংশানটা মিস করলেন।"

আজ ৭ই পৌষ। নিশ্চয় উপাসনার কথাটা বলছেন। জিজ্ঞেস করলাম, "কিরকম দেখলেন উপাসনা?"

"নট ব্যাড। তবে ফ্র্যাঙ্কলি বলছি, আমার মন্ত্র-ফন্ত্র বা বাণীর থেকে নাচ-গানই ভালো লাগে বেশি। নাচ লাগালে আরও জমত। কেন যে নাচটা বাদ দেয় বুঝলাম না।"

"ওটা বোধহয় বসন্ত উৎসবের জন্য তুলে রেখেছে।" প্রমথ বলল, "এক সঙ্গে আপনাদের সবকিছু দেখাতে চায় না।"

প্রমথর মন্তব্যে যে শ্লেষটা ছিল, শ্যামলবাবু সেটা বোধহয় ধরতে পারলেন না।

"তাই হয়তো হবে।"

"ওখান থেকে মেলার মাঠে গেলেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"হ্যাঁ, দেখলাম সবাই যাচ্ছে, আম্রকুঞ্জের পাশ দিয়ে শালবীথি ধরে সোজা মেলার মাঠ। সাত সকালে গেছি, চা পর্যন্ত খাওয়ার সময় পাইনি। প্রথমেই কালোর দোকানে ঢুকে চা-টা খেয়ে, মেলায় ভালো করে একটা চক্কর মেরে তারপর এসেছি। তা আপনারা কি এই প্রথম আসছেন?"

শ্যামলবাবু সত্যিই গল্প করতে ভালোবাসেন। প্রমথ এক ফাঁকে ফিসফিস করে আমাকে বলল, "একেনবাবুর সঙ্গে এঁর জমত ভালো।"

আমি ভাবছিলাম খাওয়া দাওয়ার পরে কী ভাবে ওঁর কবল থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এমন সময়ে বাইরে থেকে কে যেন আমাদের নাম ধরে ডাকল। আমি বেরিয়ে এসে দেখি চাদর গায়ে ধুতিপাঞ্জাবি পরা একজন সুদর্শন যুবক দাঁড়িয়ে।

"আপনি কি বাপিদা?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, আপনি?"

"আমাকে আপনি চেনেন না। আমি প্রভাস মিত্র।"

"কে বলল চিনি না, খুব ভালো করে আপনাকে চিনি।"

প্রভাস আমার বলার ধরন শুনে হেসে ফেলল। "আমাকে তুমি করেই বলবেন। বন্দনা আর আমি একসঙ্গে পড়েছি।"

"বেশ, কিন্তু তুমিও আমাকে তুমি বলবে বন্দনার মতো। ভেতরে এসো, আমার বন্ধু প্রমথর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।"

প্রভাস শান্তিনিকেতনে পড়ায় শুনে উৎসাহিত শ্যামলবাবু প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, পৌষমেলার সিগ্নিফিকেন্সটা কি বলুন তো?"

প্রভাস বলল, "ভাগ্যিস আপনি বিশ্বভারতীর ইন্টারভিউ বোর্ডে ছিলেন না থাকলে বিপদে পড়তাম।"

"না না, সিরিয়াসলি, এর ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু জানা দরকার।"

"আমি যতদূর শুনেছি, এটা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উইলে ছিল। মহর্ষির মৃত্যুর পর বলেন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনের ভার নেন, তখন এই মেলা চালু করেন। তারপর রবীন্দ্রনাথের আমল থেকে এটা ধীরে ধীরে বড়ো হতে থাকে।"

শ্যামলবাবু বুঝলাম খুবই ইমপ্রেসড হয়েছেন প্রভাসের কথা শুনে। বললেন "আপনাকে মশাই একটু সময় দিতে হবে। শান্তিনিকেতনের বাড়িঘরগুলো, এই উত্তরায়ন, উদয়ন, শ্যামলী — এগুলো যদি একটু চিনিয়ে দেন। কাল একটা রিক্সাওয়ালাকে নিয়ে ঘুরলাম। ব্যাটা বলে ও সব জানে। শ্যামলী বলে একটা বাড়ি দেখাল— যেটা দোতলা পাকা বাড়ি। তারপর আমি ধমক দিতে স্বীকার করল, হুগলির ছেলে। হপ্তা দুই হল মামার রিক্সা চালাতে বোলপুরে এসেছে।"

"উত্তরায়ন বাড়িটাও দেখাল নাকি?" প্রমথ প্রশ্ন করল।

এটাই প্রমথর দোষ। কেউ একটা কিছু ভুল কথা বললে — তাঁকে না খুঁচিয়ে পারে না। শ্যামলবাবুর আর দোষ কি, আমিও বহুদিন উত্তরায়নকে একটা বাড়ি বলেই ভাবতাম। শ্যামলবাবু ভালো মনেই উত্তর দিলেন, "দেখিয়েছিল, কিন্তু আমি ওর একটা কথাও বিশ্বাস করি না। কি মশাই, দেখিয়ে দেবেন তো?" প্রভাসকে আরেকবার জিজ্ঞেস করলেন শ্যামলবাবু।

"বেশ তো, আমি তো এখানেই আছি।"

"দুপুরে খেয়েছেন?" শ্যামলবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি সকালে খুব ভালো করে খাই। দুপুরে কিছু খাই না।"

"একদিন না হয় খেলেন। দাঁড়ান," বলে প্রভাসের আপত্তি সত্বেও শ্যামলবাবু রান্নাঘরে বোধহয় রিতাকে জানাতে গেলেন।

"সত্যি আমি দুপুরে খাই না," প্রভাস আমার দিকে তাকিয়ে বলল।

"বসো আমাদের সঙ্গে, খেতে হবে না। গল্পটা তো হবে।"

।। ৫ ।।

খাওয়াদাওয়ার পর শ্যামলবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "মেলায় কখন যেতে চান?"

প্রমথ উলটে জিজ্ঞেস করল, "আপনাদের কখন সুবিধা?"

"আমরা খুব ফ্লেক্সিবল। তবে দুপুরে নিশ্চয় আপনারা একটু ঘুমোবেন।"

বাঁচা গেল! মনে মনে ভাবলাম। মুখে বললাম, "সেই ভালো, আপনারা দুজন একটু জিরিয়ে নিন। আমরা ট্রেনে খুব ঘুমিয়েছি।"

"আপনারা কি তাহলে এখন মেলায় যাবেন?"

"মেলায় না। ভাবছি প্রভাসের সঙ্গে শান্তিনিকেতনটা একটু ঘুরে দেখি। তোমার অসুবিধা নেই তো প্রভাস?"

"এতটুকু নয়।"

"এক্সলেন্ট! তাহলে আমরা একটু ঘুরে-টুরে তারপর মেলায় যাব। বিকেলে মেলাতেই আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে।"

শ্যামলবাবু বললেন, "মেলার ঐ ভিড়ে খুঁজে পাবেন?"

"ঠিক খুঁজে নেব, একদম ভাববেন না," প্রমথ বলল। "না পেলে তো আমরা ফিরেই আসছি। রাত্রে এখানে দেখা হবে।"

শ্যামলবাবু আড্ডাবাজ লোক। মনে হল সঙ্গ হারিয়ে একটু মনঃক্ষুণ্ণ হলেন।

শ্যামলবাবু আর রিতা শুতে চলে যাওয়ার খানিক বাদেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে পূর্বপল্লীর রাস্তা ধরে রেললাইনের দিকে এগোলাম। রাস্তার বাঁ দিকে এককালে খোয়াই ছিল — মাইলের পর মাইল লালমাটির উঁচু নিচু জমি — মাঝে মধ্যে কয়েকটা করে তালগাছ। সে খোয়াই অবশ্য অদৃশ্য হতে শুরু করেছে আমার জন্মের আগে থেকেই।

কিন্তু আগেরবার যখন এসেছি, তখনও কিছু কিছু ফাঁকা জায়গা চোখে পড়ত। এখন শুধু বাড়ি আর বাড়ি। পূর্বপল্লীর পুরোনো বাড়িগুলোর সঙ্গে লাগোয়া জমি থাকত প্রচুর। বিশ্বভারতী ট্রাস্টের জমি দু'বিঘার কমে লিজ দেওয়া হত না। এখন সেসব গেছে। নতুন পূর্বপল্লীতে তিনকাঠা পাঁচকাঠার প্লটও বিক্রি হচ্ছে। গায়ে গায়ে লেগে বাড়ির সারি। শান্তিনিকেতন পশ্চিমবঙ্গের আরেকটা মফস্বল শহর হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

"আপনাদের কোনো তাড়া নেই তো?" প্রভাস প্রশ্ন করল।

প্রভাস আমাকে দুয়েকবার চেষ্টা করে তুমি বললেও প্রায়ই 'আপনি'-তে ফিরে আসছে। আমি ওকে শোধরাবার চেষ্টা করে হাল ছেড়েছি। যা ওর সুবিধা বলুক।

"না, কেন বলত?"

কাঁধের ঝোলাটা দেখিয়ে প্রভাস বলল, "আমাকে একটা বই ফেরত দিতে হবে অবনপল্লীতে। কাছেই, বেশি সময় লাগবে না।"

"লাগুক না সময়, হাঁটার জন্যই তো বেরোনো। বুঝেছ, একটা জিনিস বেশ লাগছে — বাড়ির এই নামগুলো। বাঙালিরা যে কাব্যপ্রেমিক, সেটা বাড়ির নামগুলো দেখলেই বোঝা যায়।"

"নামগুলো কাব্যিক, প্রমথ বলল। "কিন্তু গুরুদেব দেখলে হার্টফেল করতেন।

'রূপসী না লিখে লিখেছে "রুপসি"!"

প্রভাস মুচকি হেসে বলল, "বানানের পরীক্ষায় এখানকার অনেক কন্ট্রাক্টারই বোধহয় ফেল করবেন।"

"আজকাল 'রুপসি' বানানটাই বোধহয় চলে," আমি বললাম।

"ইডিয়েটের মতো কথা বলিস না, 'রূপসি' চলতে পারে, 'রুপসি' চলে না।

"না চললেও এসে যায় না," প্রভাস বলল। "আফটার অল প্রপার নাউন।"

"তার মানে?"

"ধরুন,আপনার কোনো বন্ধুর নাম সূর্য। তিনি নিজের নামের বানান লিখলেন 'সুর্য'। এতে আপত্তির কী আছে?"

"কিছুই নেই, শুধু বাংলার বাপের শ্রাদ্ধ," প্রমথ গম্ভীরভাবে বলল।

"না, না, সিরিয়াসলি। বাপিদার বন্ধু তো সত্যি করে সূর্য নন। কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আমি সূর্যকে চিনি কিনা। আমি বলব, নিশ্চয় চিনি। মেঘ না থাকলে সারা দিনই তো চোখে পড়ছে। কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করেন, সুর্যকে চিনি কিনা। আমাকে বলতেই হবে চিনি না। কারণ বাপিদার সেই বন্ধুকে আমি সত্যিই চিনি না। এক্ষেত্রে সুর্য হলেন শুধু বাপিদার বন্ধু, সে নামের অন্য অর্থ থাকার কী প্রয়োজন?"

"কথাটা মন্দ বলনি," আমি বললাম। "এক বাক্যে বাড়ির মালিকদের পাপ খন্ডন।"

"এটা আমার কথা নয়। যাঁর বাড়ি যাচ্ছি, আমাদের মাস্টারমশাই শিশিরবাবুর কথা। ওঁর বাড়ির নাম নীলিন।"

"তাঁর অর্থ কি?"

"নিলীন কথাটার অর্থ আছে, কিন্তু নীলিনের নেই। সেই সূর্য আর সুর্যের ব্যাপার। আমি একদিন ওঁকে বলেছিলাম, "বানানটা কারেক্ট করিয়ে নিন, চোখে বড্ড লাগে।" তার উত্তরে এই কথাগুলো বলে উনি বলেছিলেন, শান্তিনিকেতনে এই নামে আর দ্বিতীয় বাড়ি পাবে না।"

কয়েকমিনিটের মধ্যেই আমরা গন্তব্যস্থলে গিয়ে পৌঁছলাম। ছোট্ট একতলা বাড়ি,

সংস্কারের অভাবে একটু জরাজীর্ণ। সামনে বেশ কিছুটা জমি। ইঁটের দেয়াল জায়গায় জায়গায় ধ্বসে পড়েছে। সেখান দিয়ে কুকুর ছাগল, এমন কি গরু মহিষও ঢুকে পড়তে পারে। গেটটাও হাট করে খোলা। তার একটা পাল্লার পাশে গাছের অনেক মরা ডাল স্তুপাকৃতি করে রাখা। দেখলে মনে হয় অনেকদিন ধরেই সেগুলো ওখানে পড়ে আছে, সুতরাং গেটটা বোধহয় খোলাই রাখা হয়। এতটা জমি, কিন্তু কয়েকটা বড়ো ইউক্যালিপ্টাস, দুটো পেয়ারা আর একটা খেজুর গাছ ছাড়া আর কিছুই দেখলাম না। একটা পেয়ারা গাছকে আবার উইপোকা ধ্বংস করছে। মরা ডালগুলো হয়তো ওই পেয়ারা গাছেরই।

এমন সময়ে শুনলাম একটা কেঁউ কেঁউ আওয়াজ। একটা নেড়ি কুত্তাকে দুটো অল্প বয়সি ছেলে দড়ি দিয়ে বেঁধে বাড়ির পেছন থেকে টানতে টানতে নিয়ে বেরিয়ে এল।

"এই কী হচ্ছে?" বলে প্রভাস একটা বকুনি দিতেই ছেলেদুটো কুকুর ফেলে দেয়ালের ফাঁক দিয়ে ভোঁ-দৌড়! কুকুরটাও মুক্তি পেয়ে দড়ি সুদ্ধুই দ্রুত পালাল।

"মাস্টারমশাই ভালো লোক বলে যে যার খুশি এখানে ঢুকে বদমায়েশি করে!" বিরক্ত হয়ে প্রভাস বলল।

"ওঁর একটা মালি রাখা উচিত," আমি বললাম।

কম্পাউন্ডের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে প্রমথ মন্তব্য করল, "ঠিকই বলেছিস, কয়েকটা ফুল গাছ থাকলে বাড়িটা এত ন্যাড়া লাগত না!"

প্রভাস বোধহয় আমাদের কথায় একটু ব্যথা পেল। বলল, "পঁচাশি বছরের বৃদ্ধ। একা মানুষ, বইপত্র নিয়েই পড়ে থাকেন।"

বাড়ির দরজার সামনে ছোট্ট বারান্দা। সেখানে বেতের চেয়ারের উপর একটা পত্রিকা পড়ে আছে। প্রমথ সেই চেয়ারে গ্যাঁট হয়ে বসে পত্রিকার পাতা উলটোতে লাগল। প্রভাস কড়া নাড়তে নাড়তে উচ্চস্বরে ডাক দিল, "মাস্টারমশাই!"

কিন্তু ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ এল না।

"ওঁর কাজের লোকটা দু'দিন হল গ্রামে গেছে। উনি আবার কানেও ভালো শোনেন না।" আমাদের উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বলে প্রভাস আবার জোর গলায় ডাকল, "মাস্টারমশাই, মাস্টারমশাই।"

উত্তর নেই।

"তাহলে কি কোথাও গেছেন?" প্রভাস আত্মগত ভাবেই কথাটা বলল।

"আমি একটু দেখি," বলে প্রমথ চেয়ার থেকে উঠে দরজায় একটা ধাক্কা দিতেই একটা কপাট পুরো খুলে গেল।

"ও মাই গড!" প্রমথ এক পা পিছিয়ে চেঁচিয়ে উঠল। "আই থিঙ্ক হি ইজ ডেড!"

আধখোলা দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম মেঝেতে কেউ পড়ে আছে। শুধু কোমরের নীচটা দেখা যাচ্ছে, উপরটা কপাটের আড়ালে। রক্ত আর রক্ত, সারা জায়গাটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য আমরা হতচকিত হয়ে গেলাম। প্রভাস ভেতরেও ঢুকল না, দৌড়ে পাশের বাড়িতে গিয়ে প্রবল বেগে কড়া নাড়তে শুরু করল। আমিও ওর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। দরজা খুললেন একজন মাঝবয়সি ভদ্রলোক। ধুতিটা লুঙ্গির মতো করে পরা, গায়ে গেঞ্জি, চাদরটা গায়ের একপাশে ঝুলছে — বোধ হয় ঘুমের তোড়জোড় করছিলেন।

"কি ব্যাপার?"

"ডাক্তারবাবু, এক্ষুণি আসুন। মাস্টারমশাই বোধ হয় মারা গেছেন।"

"সেকি!"

ডাক্তারবাবু, সেই অবস্থাতেই ভেতর থেকে একটা ডাক্তারি ব্যাগ আর স্টেথিসস্কোপটা নিয়ে এসে বললেন, "চলুন।"

অন্য কপাটটা খোলা যাচ্ছে না। ডাক্তারবাবু (পরে নাম জেনেছি ডাক্তার অরুণ চৌধুরী) কাঁধটা একটু পাশ করে দরজার ফাঁক দিয়ে গলে ভেতরে গেলেন। আমি, প্রমথ আর প্রভাসও ওঁর পেছন পেছন ঢুকলাম।

প্রভাসের মাস্টারমশাইয়ের দেহটা আড়াআড়িভাবে পড়ে আছে। ঘাড়টা উঁচু হয়ে দরজা আর দেয়ালের কোণে আটকা। ঘাড়টা বোধহয় ভেঙেই গেছে। মাথার পেছনটা নিশ্চয় ফেটেছে, কারণ রক্তের ধারাটা ওখান থেকেই বেরিয়েছে মনে হল। বাঁ-হাতের ঠিক পাশেই একটা তালা চাবি-আটকানো অবস্থায় মেঝেতে পড়ে আছে। হাতের লাঠিটা তার একটু দূরে। তালা আর লাঠিটা দেখে মনে হয় বোধহয় বেরচ্ছিলেন বা ঘরে ঢুকছিলেন।

ডাক্তার চৌধুরি হাঁটু গেড়ে বসে বৃদ্ধের বুকে স্টেথিসস্কোপ বসিয়ে গলার পাশের শিরাটা আঙুল দিয়ে টিপে ধরলেন। আহত বা মৃতদের দিকে আমি তাকিয়ে থাকতে পারি না। তাই ঘরের চারিদিকটা একবার দেখলাম। দামী কোনো আসবাবপত্র চোখে পড়ল না। একটা বড়ো তক্তপোশ আর বেতের কয়েকটা চেয়ার। তক্তপোশে অবশ্য বসারও জায়গা নেই স্তুপাকৃত বই সেখানে জড় করে রাখা। দেয়ালের একটা শেলফে মাটির আর কাঠের তৈরি নানান মূর্তি। দু'দিকের দেয়ালে কয়েকটা ছবি। একটা যামিনী রায়ের ধাঁচে আঁকা। আরও হয়তো দেখার মতো কিছু ছিল, কিন্তু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার মানসিক অবস্থা আমার ছিল না।

ডাক্তার চৌধুরী পরীক্ষা শেষ করে বললেন, "প্রাণ নেই, ডেড।"

"উনি কি হঠাৎ পড়ে গিয়ে মারা গেলেন? প্রভাস জিজ্ঞেস করল।

"অসম্ভব নয়। তবে অপঘাতে মৃত্যু, তাড়াতাড়ি পুলিশকে একটা খবর দেওয়া দরকার।"

ডাক্তার চৌধুরী স্টেথিসস্কোপটা গলায় ঝোলাতে ঝোলাতে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর কেমন একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন, "আপনারা কখন এলেন এখানে?"

প্রভাসই উত্তর দিল, "এই এক্ষুণি! দেখেই আপনাকে ডাকতে গেছি।"

"গা-টা এখনও পুরো ঠান্ডা হয়নি। অল্প কিছুক্ষণ হল মারা গেছেন। চলুন, আমার বাড়ি থেকেই পুলিশকে ফোন করবেন।"

"আপনি শিওর উনি বেঁচে নেই?" প্রভাস বিশ্বাস করতে পারছে না।

"শিওর।"

আধঘন্টার মধ্যেই একটা জিপে চেপে দু'জন পুলিশ এল। ওঁদের মধ্যে যিনি পদস্থ তিনি বোধহয় সাব-ইনস্পেক্টর র‍্যাঙ্কের হবেন। আমরা কেন এসেছিলাম, ঠিক কখন এসেছিলাম, ঢুকে কী দেখেছি, ভেতরে ঢুকে কিছু নাড়াচাড়া করেছি কিনা, কোনো সন্দেহজনক শব্দ শুনেছি কিনা, কোনো সন্দেহভাজন কাউকে দেখেছি কিনা — এরকম হাজারও প্রশ্ন করলেন।

প্রমথ আবার সন্দেহভাজন বলতে কী বোঝাচ্ছেন জিজ্ঞেস করাতে সাবইনস্পেক্টর মশাই খুব বিরক্ত হলেন। প্রায় খেঁকিয়ে উঠলেন, "আর কাউকে দেখেছেন আশেপাশে?"

আমি দুটো ছেলের কথা বললাম।

"ছেলেদুটোকে দেখলে চিনতে পারবেন?"

"মনে হয় না, এক ঝলকের জন্য দেখেছি।"

প্রমথ আর প্রভাসও বলল যে ওরা শিওর নয় চিনতে পারবে বলে।

এরমধ্যে থানার ও.সি নিজেই এসে হাজির হলেন। ভাগ্যক্রমে প্রভাসকে উনি ভালো করে চিনতেন। নইলে সাব-ইনস্পেক্টর মশাইয়ের কাছে আমাদের আরও অনেক ভোগান্তি হত বলে আমার বিশ্বাস।

বাড়ি ফিরতে প্রায় বিকেল পাঁচটা হল। শ্যামলবাবুরা ইতিমধ্যে মেলায় চলে গেছেন। আমাদের সবার যা মানসিক অবস্থা, তাতে মেলায় গিয়ে আনন্দ করার প্রশ্ন ওঠে না।

"দিনটা কি সুন্দর ভাবে শুরু হয়েছিল, আর কী হয়ে গেল!" বিষণ্ণভাবে বলল প্রভাস।

প্রভাসের মানসিক অবস্থা আমি যথেষ্ট অনুমান করতে পারছিলাম। জীবনে এই প্রথম প্রভাস এইরকম অপঘাত মৃত্যু চোখের সামনে দেখল। আমি আর প্রমথ অবশ্য এইরকম ঘটনার সম্মুখীন আগেও আরেকবার হয়েছি। প্রমথর অ্যাপার্টমেন্টেই এক রাতের জন্য এক গেস্ট এসে খুন হন! যাই হোক, সে গল্প এখানে নয়। শুধু এটুকুই যোগ করি যে সেই সূত্রেই একেনবাবুর আসল পরিচয় আমরা পেয়েছিলাম।

আমি আর প্রমথ দুজনেই প্রভাসকে বললাম, আমাদের সঙ্গে রাতটা কাটাতে। ঘুম আমাদেরও যে খুব একটা হবে তা নয়। ঘুমোনোর চেষ্টা না করে বরং কিছুক্ষণ গল্পগুজব করলে হয়তো মানসিক দিক থেকে কিছুটা আরাম হবে। প্রভাসকে বেশি বলতে হল না। ও রাজি হয়ে গেল।

বনমালী চা দিয়ে গেল। প্রভাস হঠাৎ বলল, "একটা কথা কি জানেন, উনি যেন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন।"

"তার মানে?" প্রমথ জিজ্ঞেস করল।

"বেশ কিছু দিন ধরে যখনই ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, আমাকে দিয়ে নানান লোকের নানান জিনিস ফেরত পাঠিয়েছেন। একদিন বললেন, 'এই বইটা বিকাশবাবুকে ফেরত দিয়ে এসো। আমাকে বহুদিন আগে দিয়েছিলেন, কিন্তু ফেরত দেওয়া হয়নি।'

বিকাশবাবুও এককালে বিশ্বভারতীতে পড়াতেন — এখন শ্যামবাটিতে থাকেন। তাঁকে যখন বইটা দিলাম, তিনি অবাক! তিনিও ভুলে গিয়েছিলেন বইটার কথা। এমন কিছু দামি বই নয়, কিন্তু মনে করে করে মাস্টারমশাই যেন নিজেকে ঋণমুক্ত করছিলেন! আমাদের এক সহকর্মী মাস্টারমশাইকে একটা লাঠি দিয়েছিল। কিছুই নয় সাদামাটা অতি সাধারণ লাঠি। মাস্টারমশাই হাঁটতে হাঁটতে একদিন হঠাৎ আছাড় খেয়ে পড়ে যান। ওঁর লাঠি নর্দমায় পড়ে যায়। যেখানে পড়েছিলেন তার পাশেই আমার সেই সহকর্মীর বাড়ি। উনি দৌড়ে এসে মাস্টারমশাইকে তোলেন। তারপর ওঁর বাবার একটা লাঠি মাস্টরমশাইকে দেন। সেটা মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে ছিল বেশ কিছুদিন। সহকর্মীর বাবা মারা গেছেন, সেই লাঠির কোনো প্রয়োজনই তাঁর ছিল না। আমাকে বলেছিলেন 'ওটা মাস্টারমশাইয়ের কাছেই থাক, ওঁর কাজে লাগুক।'

দিন দশেক আগে মাস্টারমশাই আমাকে বললেন, 'তুমি আমাকে একটা লাঠি কিনে এনে দিও তো।'

আমি বললাম, 'কেন, লাঠিটাতে আপনার অসুবিধা হচ্ছে?'

মাস্টারমশাই বললেন, 'না। কিন্তু লাঠিটা তো আমার নয়। ওটা আমি ফেরত দিতে চাই।'

এছাড়াও প্রায়ই দেখি নিজের বইগুলো ঘাঁটছেন। সেখানে খুঁজছেন অন্য কারো বই ওঁর কাছে আছে কিনা। বেশ কয়েকটা বই আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'তুমি এগুলো

ফেরত দেওয়ার বন্দোবস্ত করতে পারো?'

বইগুলো যাঁদের তাদের কয়েকজনকে আমি চিনিও। একজন মারাও গেছেন বেশ কিছুদিন হল। আমি সেটা বলতেই বললেন, 'তা হোক, ওর ছেলেমেয়েদের কাউকে দিয়ে দিও। আমি সব কিছু ফেরত দিয়ে দিতে চাই।'

আমি একদিন বলেই ফেলেছিলাম, 'কবে নিয়েছিলেন বইটা?'

মাস্টারমশাইয়ের উত্তর, 'প্রায় বছর দশেক আগে। আমার ব্যাপার তো জানোই, একসঙ্গে এতগুলো বই পড়ি যে এক-একটা শেষ করতে অনেক সময় লেগে যায়। তারপর যা হয় বইগুলো পড়েই থাকে। যার বই সেও চায় না। আমারও খেয়াল থাকে না।'

'যাঁর কাছ থেকে আপনি বইগুলো ধার নিয়েছিলেন, তাঁদের কাছেও নিশ্চয় আপনার অনেক বই আছে।'

'তা হয়তো আছে, কিন্তু তার সঙ্গে বই ফেরত না দেওয়ার সম্পর্ক কি।' একটু যেন বিরক্ত হয়েই মাস্টারমশাই আমায় বলেছিলেন।

আমি বলেছিলাম, 'না,না, আমি ফেরত দিয়ে দেব। কিন্তু আপনার স্মরণশক্তি দেখে সত্যিই অবাক হচ্ছি। আট দশ বছর আগে বই ধার করেছেন, কিন্তু ঠিক মনে আছে কার কাছে থেকে কোন বই নিয়েছিলেন।'

'স্মরণশক্তির আবার কি দেখলে। ফেরত দিতে তো ভুলেই গিয়েছিলাম।'

'তা হোক, কিন্তু ধার করেছিলেন সেটা তো মনে আছে।'

'তা আমার মনে থাকে, কিন্তু মাঝে মাঝে ভীষণ ভুলও হয়। বছর পাঁচেক আগে এক ভদ্রলোকের সাথে হঠাৎ করে দেখা হল — মানে তিনিই খোঁজ করে আমার কাছে এসেছিলেন। আমার পরিচিত একজনের জামাই। তাকে দেখে হঠাৎ মনে পড়ল, একটা জিনিস আমার ফেরত দেওয়া হয়নি। অথচ যাকে দেবার, সে আর বেঁচে নেই!'

'তার ছেলেমেয়েরা নেই?'

'তা আছে। সেটাও ফেরত দিতে হবে। আরও এরকম কত জিনিস হয়তো রয়ে যাচ্ছে। নিজের স্মরণশক্তির উপর এক সময়ে আমার আস্থা ছিল — এখন আর ততটা নেই।'"

এক নাগাড়ে কথাগুলো বলে প্রভাস কিছুক্ষণ চুপ রইল। প্রমথ চুপ, আমিও ঠিক কি বলব ভেবে পেলাম না।

একটু বাদে প্রভাস বলল, "বন্দনা ওঁর ভীষণ ভক্ত ছিল। খবরটা শুনলে ও ডিভাস্টেটেড হয়ে যাবে।"

"এখন না হয় নাই জানালে, ক'দিন বাদেই তো ও আসছে।" আমি বললাম।

"বন্দনা ওঁকে বরাবর দাদুই ডেকেছে। উঃ, কী অদ্ভুত ভাবে চলে গেলেন!"

"হয়তো মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন," আমি বললাম। "আগেও তো একবার বললে পড়ে গিয়েছিলেন। এবার পড়েছেন বেকায়দায়।"

"কেন জানি না আমার মন বলছে তা নয়।"

"তুমি কি ভাবছ, মার্ডার?"

"না, না কে এমন নৃশংস কাজ করবে? কেন করবে? একজন সাধু-সজ্জন বৃদ্ধ!"

"হয়তো অ্যাকসিডেন্ট!" প্রমথ মন্তব্য করল।

"অ্যাকসিডেন্ট!"

"কেউ হয়তো কিছু চুরি করতে এসেছিল, উনি হঠাৎ এসে পড়ায়, পালাবার চেষ্টা

করছিল, ধাক্কাধাক্কিতে উনি পড়ে গেছেন।”

চিন্তাটা আমার মনেও এসেছিল। প্রভাসের মুখটা হঠাৎ কেমন ফ্যাকাশে লাগল।

“কি হল?” আমি প্রশ্ন করলাম।

“ওঁর খিড়কির দরজার খিল ভেঙে গিয়েছিল — ছিটকিনিও নড়বড়ে ছিল। কাজের লোক দেশে চলে গেছে শুনে আমিই গতকাল ওখানে একটা তালা লাগিয়ে দিয়েছিলাম। ওটা খোলা থাকলে, চোর হলে নিশ্চয় ওখান দিয়ে পালাতে পারত! মাস্টারমশাইয়ের পক্ষে তো কাউকে তাড়া করার প্রশ্ন ওঠে না।”

ওর কথাটা খুবই যুক্তিপূর্ণ। কিন্তু আমি ওকে বললাম, “কি ঘটেছে আমরা তো জানি না প্রভাস। তুমি এসব এখন ভাবছ কেন?”

## ।। ৬।।

শ্যামলবাবুরা এলেন প্রায় দশটার সময়। তাঁদের সঙ্গে মাস্টারমশাই শিশিরবাবুকে নিয়ে খানিকক্ষণ কথা হল। শ্যামলবাবুর স্ত্রী রিতা দেখলাম বেশ ভয় পেয়েছেন। প্রভাসকে জিজ্ঞেস করলেন, “এরকম মার্ডার এখানে হয়?”

“সচারাচর হয় না। তবে মার্ডার কিনা এখনও তো জানা যায়নি।”

“কে জানে আমার কিন্তু ভীষণ ভয় করছে। এখানকার বাড়িগুলো আবার সব এক-তলা আর আমাদের খাটও একেবারে জানলার পাশে।”

“ধ্যাৎ, তুমি বড্ড বেশি ভয় পাও,” শ্যামলবাবু বললেন। “আমরা এখানে এতগুলো লোক রয়েছি। কি বলেন?” আমাদের সমর্থন চাইলেন শ্যামলবাবু। সেটা কতটা স্ত্রীকে সাহস দেবার জন্য, কতটা নিজেকে আশ্বস্ত করার জন্য, সেটা প্রশ্ন।

রাত হয়ে গেছে, ওঁরা আর বেশিক্ষণ বসলেন না, শুতে চলে গেলেন। একটু বাদেই ঘরের ভেতর থেকে জানলা বন্ধ করার শব্দ পেলাম। কিছু অস্পষ্ট কথাবার্তা ভেসে এল, আর তার পরই শুনলাম খাট সরানোর আওয়াজ। আমরা নিজেরা কে কখন ঘুমোলাম খেয়াল নেই। প্রমথ কম্বল মুড়ি দিয়ে গল্প করছিল। হঠাৎ সোফাতে শুয়েই নাক ডাকতে শুরু করল। প্রভাস একটা কুশন নিয়ে, সেটা মাথায় দিয়ে চৌকিতে লম্বা হল। আমি শোবার ঘর থেকে ওকে একটা কম্বল্ল এনে দিয়ে নিজেও শুয়ে পড়লাম।

পরদিন আমার ঘুম ভাঙল বেলা করেই। দেখলাম সবাই উঠে পড়েছে। প্রভাস বাড়ি চলে গেছে। বলে গেছে দুপুরের দিকে আবার আসবে। সবার এক প্রস্থ চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। আমি ওঠাতে বনমালী সবার জন্যেই আবার চা নিয়ে এল। চা শেষ করার আগেই সাইকেল করে পুলিশের একটি লোক এসে হাজির। হাতে একটা ফাইল।

“কী ব্যাপার?”

“ও.সি সাহেব পাঠিয়ে দিলেন। আপনাদের স্টেটমেন্টগুলোতে সই করতে হবে।”

দু’টো স্টেটমেন্ট — একটা প্রমথর, একটা আমার। পড়ে দেখলাম, যা বলেছি তাই আছে। যদিও ইংরেজি ভাষাটাকে দুয়েক জায়গায় মার্ডার করা হয়েছে। আমার নিজের ইংরেজি জ্ঞান বিরাট সে দাবি করতে পারব না। কিন্তু তাও ভুল ইংরেজি দেখলে বড্ড

অস্বস্তি হয়। আমি স্টেটমেন্টের উপর কলম চালাতে যাচ্ছি দেখে প্রমথ বলল, "বেশি ওস্তাদি করিস না, চটে গেলে ঝামেলায় পড়বি।" কথাটা অসঙ্গত নয়। দুজনেই স্টেটমেন্টে সই করে দিলাম।

"কিছু কিনারা হল?" প্রমথ পুলিশটিকে জিজ্ঞাসা করল।

"ও.সি সাহেব জানেন," বলে লোকটা চলে গেল।

চা-টা খেয়ে শ্যামলবাবুদের সঙ্গেই মেলায় ঘুরতে গেলাম। কাল এখানে আসার পর থেকে যে হুজ্জুৎ গেছে! যার জন্য শান্তিনিকেতনে এসেছি — সেটাই দেখা হয়ে ওঠেনি। বড়ো রাস্তায় পৌঁছতেই দেখলাম দল বেঁধে লোকেরা মেলার দিকে যাচ্ছে। যারা হাঁটতে রাজি নয়, তারা উঠেছে সাইকেল রিকশায়। রিকশার দাপট তবু সহ্য করা যায়। কিন্তু অসহ্য লাগে যখন মোটর গাড়ি হাঁকিয়ে লোকেরা মেলায় আসে। এমনিতেই এখানে ধুলো বেশি। এক একটা গাড়ি যায়, নাকে রুমাল চেপে তার জের সামলাতে সামলাতে আরেকটা গাড়ি এসে পড়ে। মেলায় ঢুকে গাড়ির কবল থেকে অন্তত বাঁচলাম।

আজকে দেখলাম মেলার মাঠে প্রচুর জল ঢালা হয়েছে। নাকে রুমাল চেপে ঘোরার প্রয়োজন নেই। তবে কী ভিড় কী ভিড়! খাবার দোকানের স্টলগুলো করতে দেওয়া হয়েছে মেলার একপ্রান্তে। সেখানে খাওয়া দাওয়ার সঙ্গে চলছে বাঙালিদের ফেভারিট পাস্ট টাইম — আড্ডা। শুনেছি এককালে এই মেলায় আশেপাশের গ্রামের লোক আর বহু সাঁওতাল কেনা-বেচা করতে আসত। মেলা প্রাঙ্গণে বসত তাদের পসরা সাজিয়ে। এটা বাস্তবিকই ছিল একটা গ্রামের মেলা। সেরকম অল্প কয়েকজনকে মেলায় ঢোকার মুখে দেখলাম। কিন্তু সংখ্যায় তাদের হাতে গোনা যায়। মেলার ভেতরে দোকানের পর দোকান শহুরে বুটিক। আর সেই সঙ্গে ইলেকট্রনিক্স, ইন্সিওরেন্স, স্টেশনারি, মোটর সাইকেল, কীসের স্টল নেই! দোকানগুলো থেকে একটু দূরে — একটা বিশাল শামিয়ানা খাটানো। সেখানে বাউল গানের আসর বসেছে। একটা বড়ো স্টেজ জুড়ে বসেছে বাউলের দল। সামনে একটা দাঁড়ানো মাইক। সেখানে একতারা বাজিয়ে একটি কমবয়সি বাউল গাইছে, আর গুবগুবি বাজিয়ে সঙ্গ দিচ্ছে একজন বুড়ো বাউল। প্রমথ, শ্যামলবাবু, বা রিতা কেউই বাউল গানে ইন্টারেস্টেড নন। আমার ভালো লাগে। বললাম, "তোরা এগো, আমি একটু বাদেই আসছি।"

আমি মোটেই সংগীত রসিক নই, কিন্তু নাচের সঙ্গে গানগুলো মন্দ লাগছিল না। মিনিট পাঁচেকও দাঁড়াইনি, কে যেন পেছন থেকে আমার কাঁধে হাত দিয়েছে। ফিরে দেখি প্রভাস। "তুমি এখানে কখন এলে?"

"এই এক্ষুণি।"

"আজ সকালে পুলিশের একটি লোক এসেছিল। আমাদের স্টেটমেন্টে সই করিয়ে নিয়ে গেল!"

"হ্যাঁ, আমি সকালে ও.সি-র ওখানে গিয়েছিলাম। তখন শুনলাম যে আপনাদের কাছে স্টেটমেন্ট সই করাতে লোক গেছে।"

"রহস্যের সমাধান কিছু হল?"

"মনে হয় না কিছু হবে বলে। এগুলো হল ওদের রুটিন এনকোয়ারি। আপাততঃ ওঁদের চিন্তা পৌষমেলায় কোনো ঝামেলা যেন না হয়। অনেক ভি আই পি-রা মেলায় আসেন। তাঁদের কিছু হলে, উপর মহলে অনেক জবাবদিহি করতে হবে।"

"কিন্তু এটা তো মার্ডারও হতে পারে?"

"হতেই পারে। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। তবে হ্যাঁ, উনি যদি বড়োসড়ো রাজনৈতিক নেতা বা সেলিব্রিটি হতেন — তাহলে অন্যকথা।"

"কিছু চুরি গেছে?"

"বলতে পারব না। তবে দামি যে দুয়েকটা জিনিস বাড়িতে ছিল — সেগুলোর কোনোটাই খোয়া যায় নি।"

আমার মুখে বিস্ময়ের ভাব লক্ষ্য করে প্রভাস বলল, "আমি অরিজিনাল পেন্টিংগুলোর কথা বলছি — নন্দলাল, রামকিঙ্কর আর যামিনী রায়ের আঁকা ছবিগুলো।"

"এছাড়া অন্যকিছু?"

"ও.সি বললেন, কি ছিল না জানলে, কী চুরি হল জানা যাবে কি করে?" যাইহোক, উনি রাজি হয়েছেন আমার সঙ্গে একবার মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে যাবেন। যদি অস্বাভাবিক কিছু আমার নজরে পড়ে।"

"মানে ওঁর ইন্টারেস্ট তুমি ব্যাপারটাতে ইন্টারেস্ট নিচ্ছ বলে।"

"আমার ধারণা তাই। ও.সি জানেন ভাইস-চ্যান্সেলার আমাকে খুব স্নেহ করেন। ভাইস-চ্যান্সেলার আর ওঁদের আই.জি হলেন ক্লাসমেট। ওঁরা সবাই অনেক ভেবেচিন্তে চলেন!"

হয়তো এটা নিয়ে সত্যিই মাথা ঘামানোর কিছু নেই। শিশিরবাবুর মৃত্যু হয়তো স্বাভাবিকভাবেই ঘটেছে। দরজা খুলে ঢুকে কোনো কারণে উলটে পড়ে মাথায় চোট লেগেছিল। তবু মনে হল, একেনবাবু আমাদের সঙ্গে এলে ভালো হত। এদিকে সম্পূর্ণ আধখ্যাপা, কিন্তু রহস্যের মধ্যে এসে পড়লেই, ওঁর মাথাটা যেন মিরাকেলের মত কাজ করে!

## ।। ৭ ।।

কলকাতায় ফিরেও শিশিরবাবুর মৃত্যুটা আমায় হন্ট করছিল। শিশিরবাবুর মৃতদেহটা যেভাবে মাটিতে পড়েছিল, তাতে মনে হয় উনি যখন বাড়িতে ঢুকছিলেন তখনই জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যান। কিন্তু তাই যদি হবে, তাহলে দরজাটা ওরকম পরিপাটি ভাবে ভেজানো থাকবে কেন? এটার কোনো সদুত্তর নেই। কেউ বাড়িতে ঢুকে হাত পেছন করে দরজা ভেজিয়ে সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করে না। যে-ভাবে ওঁর দেহ পড়ে ছিল, তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে পড়ার আগে উনি ঘরের ভেতরের দিকে মুখ করে ছিলেন। দরজাটা ভেজিয়ে ছিটকিনি না আটকিয়ে উলটোদিকে ঘুরবেন কেন? এর একটা সম্ভাব্য উত্তর হয়তো ছিটকিনি খুলে বেরোতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কিছু একটা ভুলে ফেলে যাচ্ছেন বলে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন।

কেন জানি না, এটা খুব যুক্তিযুক্ত মনে হল না। তাহলে কি কোনো আততায়ী বাড়িতে ঢুকে অপেক্ষা করছিল? কিন্তু সে বাড়ির ভেতর ঢুকল কি করে? তালা ভেঙে নিশ্চয় ঢোকেনি। সেক্ষেত্রে তালা আর চাবি ভেতরে মেঝেতে পড়ে থাকত না। তারচেয়েও বড়ো কথা, বাড়ির দরজায় তালা না দেখে কেউ বাড়িতে ঢুকেছে বলে শিশিরবাবুর নিশ্চয়

সন্দেহ হত। একা একা ওভাবে ঢুকতেন না।

আর একটা সম্ভাবনাও বাদ দিতে পারি না। যদি ধরি নিই উনি বাড়িতে ঢুকছিলেন না, বেরোচ্ছিলেন, আর তখনই আততায়ী এসে দরজায় কড়া নাড়ে। উনি দরজা খুলতেই ঠেলে ভেতরে ঢুকে ওঁকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়। উদ্দেশ্য ছিল হয়তো চুরি করা। খুনটা অ্যাকসিডেন্ট, যাকে বলা যেতে পারে ইনভলান্টারি ম্যানস্লটার। কিন্তু কী নিতে লোকটা এসেছিল?

কলকাতা ছাড়ার দুদিন আগে প্রভাসের ফোন পেলাম। যেটুকু বুঝলাম, সেটা হল ও.সি নিজেই শিশিরবাবুর মৃত্যুর তদন্ত করছেন। এর মধ্যে প্রভাসকে নিয়ে শিশিরবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলেন, যদি প্রভাসের চোখে পড়ে দামি কোনো জিনিস অদৃশ্য হয়েছে! কিন্তু সেরকম কিছুই প্রভাসের নজরে আসেনি। তবে একটা জিনিস দেখে ও বেশ অবাক হয়েছে। সেটা হল, একগুচ্ছ পুরোনো চিঠি খাবার টেবিলের উপর পড়েছিল। শিশিরবাবু খাবার টেবিলে কাগজপত্র কখনোই রাখতেন না। কথাটা ও.সি-কে বলায় তিনি জানান যে চিঠিপত্রগুলো মেঝেতে ছিল, ওঁর লোকেরাই ওগুলো তুলে টেবিলে রেখেছে। চিঠিপত্রগুলো বাস্তবিকই পুরোনো। প্রভাস শুধু দুয়েকটা চিঠির ওপরেই চোখ বুলিয়েছে। সেগুলো প্রেমপত্র। প্রভাসের মনে হয়েছে লেখার ছাঁদ মেয়েলি। স্টাইলটাও। মনে হয় শিশিরবাবুকে উদ্দেশ্য করেই এককালে কেউ সেগুলো লিখেছিলেন। প্রশ্ন হল, চিঠিগুলো কোথায় ছিল, আর মেঝেতে পড়েছিল কেন? কেউ কি এই চিঠিগুলোর মধ্যে কোনো একটা বিশেষ চিঠির খোঁজে এসেছিল? কিন্তু এই পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে লেখা প্রেমপত্রে এমন কী কথা লুকিয়ে থাকতে পারে যার জন্য এত বছর বাদে কেউ সেটা চুরি করতে আসবে? হয়তো অন্য কোনো দরকারি কাগজ চিঠিগুলোর সঙ্গে ছিল। সেইটে বার করবার সময়েই চিঠিগুলো মাটিতে পড়ে গেছে। তালা-চাবির ব্যাপারে আমার মনের মধ্যে যে চিন্তাটা ঘুরছিল, সেটাও প্রভাতের কথায় পরিষ্কার হল। পুলিশের লোকরা বাড়ির আশেপাশে পরীক্ষা করতে গিয়ে দরজার বাইরে বারান্দার মেঝেতে একটা চাবি পেয়েছে। চাবিটা বাইরের তালার। কিন্তু বাইরের চাবিতে যে ফিঙ্গার-প্রিন্ট পাওয়া গেছে তার সঙ্গে ভেতরের চাবির ফিঙ্গার প্রিন্টের মিল নেই। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই এক বা একাধিক লোক শিশিরবাবুর ঘরে ঢুকেছিল এবং কোনো কাগজপত্রের খোঁজে এসেছিল। ও.সি-রও ধারণা এটা সম্ভবত কোনো ইচ্ছাকৃত খুন নয়। কেউ বা কারা কিছু চুরি করতে এসেছিল। দুবর্ত্তৃতরা বাড়িতে থাকাকালীন শিশিরবাবু ফিরে আসেন। তখন ধাক্কাধাক্কি হয় — তাতেই বৃদ্ধ পড়ে গিয়ে মারা যান। তবে মনে হল শান্তিনিকেতনের পুলিশের উপর প্রভাসের বিশেষ আস্থা নেই। সবকিছু বলার পর আমাকে জিজ্ঞেস করল, "একেনবাবু কি এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন?"

আসলে একেনবাবুর কথা একটু ফলাও করেই সেদিন প্রভাসকে বলেছিলাম। বললাম, "বলতে পারি, কিন্তু তোমাদের শান্তিনিকেতনের পুলিশ কি ওঁর কথা শুনবে?"

প্রভাস কিছু বলার আগে, বন্দনা ফোনটা ধরল। নিশ্চয় প্রভাসের কাছে বেড়াতে গেছে। বলল ওরা ঠিক করেছে সিভিল ম্যারেজ করবে। তিরিশ দিনের নোটিস দিতে হবে। ওদের দুজনেরই খুব ইচ্ছে বিয়েতে আমি সাক্ষী হই। আমি কি যাওয়াটা একটু পেছোতে পারি?

"কোনো উপায় নেই রে, আমার ক্লাস শুরু হচ্ছে। তবে আমার বেস্ট উইশেস রইল।"

বন্দনা মনে হল একটু দুঃখিত হয়েছে। কিন্তু আসলে ও বেশ বুঝদার মেয়ে।

নিউ ইয়র্কে ফিরে দেখলাম প্রমথ যে ভয়টা করেছিল — ঠিক তাই। একেনবাবু অ্যাপার্টমেন্টটাকে একটা নর্দমা বানিয়ে রেখেছেন। সিঙ্কটায় নোংরা বাসন স্তুপ হয়ে আছে। কফি টেবিলে অন্ততঃ আট-দশ দিনের নিউ ইয়র্ক টাইমস ডাঁই করে রাখা। বসার ঘরের চারিদিকে জামা-কাপড় ছড়ানো — ওঁর শোবার ঘরের কথা বাদই দিলাম। একেনবাবুর এক্সকিউজ হল — উনি ঠিক করেছিলেন গতকাল সারাদিন বাড়ি ঘরদোর একটু গোছাবেন, কিন্তু হঠাৎ ওঁকে একটা সেমিনারে যেতে হয়েছে...।

প্রমথ বলল, "আপনি ঘর পরিষ্কার কি শুধু আমাদের জন্য করছিলেন? নিজে পিগ-এর মতো ছাড়া থাকতে পারেন না?"

"না, না, তা কেন স্যার। আসলে কি জানেন, পরিষ্কার করলেই তো আবার নোংরা হয়। তাই প্রতিদিন না করে, মাঝেমাঝে করব ভেবেছিলাম।"

প্রমথ রান্নাঘর নিয়ে পড়ল। আমি আর একেনবাবু বাইরের ঘরটা গোছাতে শুরু করলাম। তার ফাঁকে ফাঁকে একেনবাবুকে শিশিরবাবুর মৃত্যুর ঘটনাটা বিস্তারিত ভাবে বললাম।

প্রমথ রান্নাঘর থেকে খোঁটা দিল। "সলভ করুন না মিস্ট্রিটা, মুখে তো অনেক হ্যানা করেছি ত্যানা করেছি বলেন।"

"আচ্ছা, দেখুন তো স্যার, কবে আমি বললাম ওসব কথা!" আমাকে সাক্ষী মানলেন একেনবাবু।

"না তা বলেননি। কিন্তু সত্যি একটু ভাবুন তো ব্যাপারটা নিয়ে।"

"আপনার কী মনে হয় স্যার?"

"আমার মনে হয় এর মধ্যে কিছু একটা গোলমাল আছে। শিশিরবাবু বড়োলোক নন। সাধারণ চোরের পক্ষে অন্য কোনো পয়সাওয়ালা লোকের বাড়িতে হানা দেওয়াটা অনেক বুদ্ধিমানের কাজ হত।"

"তা হত স্যার। কিন্তু শিশিরবাবুর বাড়িতে ঢোকাটা যতটা সহজ ছিল, অন্য বাড়িতে হয়তো অতটা সহজ ছিল না... মানে, আমি যা শুনলাম। বাড়ির কাজের লোকটা ছিল ছুটিতে, শিশিরবাবু নিজে লাঠি হাতে খুট খুট করে চলেন — সুতরাং, হাতেনাতে ধরা পরার সম্ভাবনাটা কম। একটু ভেবে দেখুন তো স্যার, ওঁর বাড়িতে কী থাকতে পারে যেটা খুব দামি?"

"দামি যা যা ছিল — যেমন, নন্দলাল, রামকিঙ্কর আর যামিনী রায়ের অরিজিনাল পেন্টিং, তার কোনোটাও চুরি যায়নি!"

"সেগুলোর দাম তো বেশ কয়েক লাখ টাকা, তাই না?"

"রাইট।"

"দ্যাট্স কনফিউজিং!"

"কনফিউজিং বলে কনফিউজিং! এছাড়া আর কি থাকতে পারে একজন বৃদ্ধ প্রফেসরের বাড়িতে?"

"ঠিক কথা স্যার, আসুন একটু বসা যাক।" বলে একেনবাবু সোফায় গিয়ে বসলেন। আমিও ওঁর সঙ্গে একটু বিশ্রাম নিতে বসলাম।

কিছুক্ষণ পা নাচিয়ে একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা স্যার, এই প্রভাসবাবু

লোকটি কেমন? রিলায়বেল মনে হল?”

“কেন, আপনি প্রভাসকে সন্দেহ করছেন নাকি!”

“না না, এই সব ব্যাপারে অনেক সময়ে চেনা-পরিচিত লোকরা জড়িত থাকে কিনা, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।”

প্রমথ ইতিমধ্যে কিচেন থেকে বেরিয়ে এসেছে। “তাহলে আমাকে আর বাপিকেও সন্দেহ করুন না, আমরা এমন কি রিলায়বেল?”

একেনবাবু নির্বিকারভাবে বললেন, “আপনারা তো স্যার শিশিরবাবুর চেনা জানা নন।”

প্রমথ ছাড়ল না। “প্রভাস যদি শিশিরবাবুর মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত থাকে, তাহলে আমাদের নিয়ে গেল কেন?”

“কী মুশকিল স্যার, এর উত্তরটা তো আপনারাই দিতে পারবেন! ভেবে দেখুন স্যার, উনি আপনাদের নিয়ে শিশিরবাবুর বাড়ি গেলেন। গিয়ে সবাই দেখলেন শিশিরবাবু ডেড। আপনারা ধরেই নিলেন যে প্রভাসবাবুও এই প্রথম ডেডবডিটা দেখছেন আর আপনারা হয়ে গেলেন তার সাক্ষী। ঐ বাড়িতে পুলিশ যদি ফিঙ্গার-প্রিন্ট নেয়, তাহলে শুধু প্রভাসবাবুর প্রিন্ট পাবে না, আপনাদেরও পাবে। আর আপনারা তো পুলিশকে বলেইছেন আপনারা সবাই একসঙ্গে গিয়েছিলেন ওঁর বাড়িতে। কেস ক্লোজড।”

“দাঁড়ান মশাই, একটু আস্তে,” প্রমথ বলল। “প্রথমত, কোনো ছবি চুরি যায়নি। তাহলে আর কী মহামূল্য জিনিস ও বাড়িতে থাকতে পারে?”

“কেন স্যার, বই!”

“তার মানে?”

“আপনারাই তো বললেন স্যার শিশিরবাবু রিটায়ার্ড অধ্যাপক — বইপত্র নিয়ে পড়ে থাকতেন। কিছু কিছু পুরোনো বইয়ের দাম তো সাংঘাতিক হয়। হয় না স্যার?”

“কোয়েশ্চেন না মেরে উত্তরটা দিন না,” প্রমথ বিরক্ত হয়ে বলল।

“আমার নিজেরই জানা ছিল না স্যার। সেদিন ক্রিস্টির একটা ক্যাটালগে দেখলাম স্যামুয়েল জনসনের ১৭৫৫ সালের ডিকশানারি বিক্রি হচ্ছে ২৫ হাজার ডলারে। তারমানে প্রায় পনেরো লাখ টাকা — জাস্ট একটা পুরোনো বই, এমন কি অটোগ্রাফ করাও নয়। অটোগ্রাফড বই হলে কত দাম হত ভাবুন?”

কেন জানি না, আমার বুকটা ধ্বক করে উঠল। পুরোনো বইয়ের মূল্য সাধারণ চোর বুঝব না, কিন্তু প্রভাসের মতো লোক বুঝবে। বন্দনা বিয়ে করবে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই। প্রভাস যদি সত্যিই এই খুনের সঙ্গে জড়িত থাকে... আমি ভাবতে পারছিলাম না, ঠিক কী করা উচিত হবে।

হঠাৎ শুনলাম প্রমথ বলছে, “ননসেন্স! পাশের বাড়ির ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, আমরা আসার কিছুক্ষণ আগেই শিশিরবাবু মারা গেছেন। প্রভাস আমাদের সঙ্গে সারা সকাল গল্প করছিল। সেটা কী করে হয়? এখন আপনি যদি বলেন যে ঐ ডাক্তারও প্রভাসের সঙ্গে জড়িত — তাহলে অবশ্য অন্যকথা।”

বাঁচিয়েছে, আমি মনে মনে ভাবলাম। কিন্তু হঠাৎ একটা খটকাও লাগল। কেন, প্রভাস ঘরে না ঢুকেই উর্ধশ্বাসে পাশের বাড়ি ছুটে গেল। আর ডাক্তার চৌধুরিও কেন সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলেন। ওঁরও এ ব্যাপারে জড়িত থাকা কি সম্ভব?

“কমপ্লিকেটেড ব্যাপার স্যার।” একেনবাবু সোফায় বসে আবার পা নাচাতে লাগলেন। “তবে ডাক্তারবাবুকেও সন্দেহের ঊর্দ্ধে রাখা যায় না।”

হঠাৎ মনে হল বইয়ের জন্য কখনোই উনি খুন হতে পারেন না। একেনবাবুকে

বললাম, "প্রভাসের কাছে ওঁর অনেক বই-ই রয়েছে। বইয়ের জন্য সে এমন একটা কাজ করতে যাবে কেন। চাইলেই তো উনি ওকে বই দিতেন।"

"এগুলো তো আপনার শোনা কথা স্যার, আর সবই প্রভাসবাবুর কাছ থেকে তাই না?"

একেনবাবুর কথা শুনে সত্যিই দমে গেলাম।

প্রমথ জিজ্ঞেস করল, "কী মশাই, সমাধান করতে পারবেন?"

"খেপেছেন স্যার, দশ হাজার মাইল দূরে বসে!"

"সেটা না পারলে কিরকম ডিটেকটিভ মশাই আপনি!"

"শুনছেন স্যার, প্রমথবাবুর কথা?"

"শুনছি, কিন্তু এখন করণীয়টা কি বলুন?"

"আপাতত এক কাপ কফি খাওয়া যাক স্যার।"

এবার আমার একেনবাবুর ওপর রাগ হল। বললাম, "দেখুন, প্রভাস বিয়ে করছে আমার অতি পরিচিত মেয়ে বন্দনাকে। ও যদি সত্যিই খুনি হয়, তাহলে এ বিয়ে হতে পারে না। আপনাকে এটা নিয়ে কাজে লাগতে হবে।"

"আরে কী মুশকিল, উনি মার্ডারার হতে যাবেন কেন?"

"সন্দেহের কথাটা তো আপনিই তুললেন!"

"স্যার, আপনাদের নিয়ে আর পারা যায় না!"

এবার প্রমথ বলল, "না সিরিয়াসলি, আপনি এই কেসটা নিয়ে একটু ভাবুন। কী, ভাববেন তো?"

"না ভাবলে কি আপনারা আস্ত রাখবেন। তাহলে আরেকবার শুনি, ভালো করে শুনি সব কিছু। তবে কফি পেলে স্যার, মাথাটা একটু খেলত।"

## ।। ৯ ।।

একেনবাবু প্রভাস সম্পর্কে এমন একটা সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়েছেন যে রাত্রে ভালো করে ঘুম হল না। বন্দনাকে স্বপ্ন দেখলাম। আমায় বলছে, 'তুমি জেনেও আমাকে কেন সতর্ক করনি? কী দোষ করেছি তোমার কাছে?'

প্রভাস কে কি পুলিশ ধরেছে? চমকে মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে গেছে আমার। ডাক্তার চৌধুরীর একটা কথা, যেটা নিয়ে আগে ভাবিনি — সেটা মাথায় ঘুরতে লাগল। কেন উনি বললেন, 'এই একটু আগে শিশিরবাবু মারা গেছেন।' বললেন খানিকটা অযাচিত ভাবে। কেন? প্রকারান্তরে আমাদের জানিয়ে দিলেন যে সেক্ষেত্রে শিশিরবাবুর মৃত্যুর সঙ্গে প্রভাসের যোগ থাকা অসম্ভব। কিন্তু আমাদের জানিয়ে লাভটা কি হল?

সকালে একেনবাবু উঠতেই আমি বললাম, "একটা উপকার আপনাকে করতেই হবে।"

"বলুন স্যার।"

"আপনাকে এক সপ্তাহের মধ্যে বলতে হবে, প্রভাস এর মধ্যে কোনও মতে জড়িত

কিনা।"

"কী ব্যাপার স্যার, এই রকম একটা টাইম লিমিট দিচ্ছেন?"

"বিয়ের আর দিন পনেরো বাকি," ওঁকে বললাম, "কোনোমতেই বন্দনার যেন সর্বনাশ না হয়।"

"তাতো বটেই স্যার। তবে আপনি স্যার বোধহয় অযথা দুশ্চিন্তা করছেন। যাইহোক, শান্তিনিকেতনের ও.সি-র নাম মনে আছে আপনার?"

"হ্যাঁ আছে। ইনফ্যাক্ট, আমাকে উনি ওঁর একটা ভিসিটিং কার্ড দিয়েছিলেন।"

আমি আমার কার্ডের বাক্স থেকে বার করে এনে ওঁর হাতে দিলাম।

"দুলাল মিত্র! বাঃ, আমি তো ওকে চিনি। আমার কলিগ ছিল এক সময়ে।"

"সত্যি! তাহলে ওঁকে একটা ফোন করুন না।"

একেনবাবু ইতস্ততঃ করছেন দেখে বললাম, "আরে মশাই ফোন ইজ অন মি। যা ফোন করার দরকার, করুন।"

দুলাল মিত্রকে অফিসে পাওয়া গেল না। একেনবাবু নিজের পরিচয় দিতে বাড়ির নম্বরটা পাওয়া গেল। দুলালবাবু কোথায় জানি বেরোচ্ছিলেন, তাই অল্পক্ষণই একেনবাবুর সঙ্গে কথা বলতে পারলেন। ফোন নামিয়ে একেনবাবু বললেন, "প্রভাসবাবুকে নিয়ে ভাববেন না। হি ইজ ক্লিয়ার।"

"ক্লিয়ার?"

"হ্যাঁ স্যার। আপনারা যখন শিশিরবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলেন। তার আধঘন্টা আগে কাছেই একটা বাড়িতে শিশিরবাবু বই ফেরৎ দিতে গিয়েছিলেন। সুতরাং ওঁর মৃত্যুর অল্প পরেই আপনারা সেখানে গিয়েছিলেন।"

"বাঁচা গেল।"

"আমিও বাঁচলাম স্যার। যে-রকম একটা টাইম লিমিট চাপিয়েছিলেন ঘাড়ে!"

"ইনভেস্টিগেশনের কিছু এগিয়েছে?"

"কিছু এগিয়েছে। দুলাল মিত্র এক সময়ে ভালো ভালো ক্রাইম সলভ করেছে। কিন্তু এখন ওর উপর যা কাজের চাপ, তাতে এর পিছনে কতটা সময় দিতে পারবে জানি না।"

প্রভাস নির্দোষ জেনে অবশেষে স্বস্তি পেলাম। প্রভাস-বন্দনার বিয়ের দিন এগিয়ে আসছে। আশাকরি বন্দনা সুখী হবে। প্রমথ এমনিতে গানটান বিশেষ শোনে না, আজ কেন জানি একটা সিডি চালিয়েছে।

"আমারও পরাণ যাহা চায় তুমি তাই, তুমি তাই গো ........
যদি আর-কারে ভালোবাস, যদি আর ফিরে নাহি আস,
তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও, আমি যত দুখ পাই গো।।"

আশ্চর্য এটা কি আমারই মনের কথা!

সুভদ্রামাসির জন্য মা একটা আচারের শিশি পাঠিয়েছিল, আর সেই সঙ্গে একটা চিঠি। ভাবছিলাম সে দুটো বাক্সে পুরে পার্সেল করে পাঠিয়ে দেব। ইতিমধ্যে আমরা ফিরেছি কিনা জানতে সুভদ্রামাসি ফোন করলেন। মা'র খবর নিলেন। আচার পার্সেলে পাঠাব শুনে বললেন, "না, না, তোমরা বরং একদিন সময় করে এসো—তখন এনো।"

প্রমথ বা একেনবাবু কাউকেই নারাজ দেখলাম না। আমি শিওর তার কারণ সেদিন সুভদ্রামাসির কুক সুজাতার ফ্যান্টাস্টিক রান্না। শনিবারে আমার বিশেষ কাজ ছিল না। একেনবাবুও সেদিন ফ্রি! প্রমথ আর ফ্রান্সিস্কা সিনেমা যাবে প্ল্যান করছিল। আগের বার ফ্রান্সিস্কা সুভদ্রামাসির বাড়ি যাবে বলেও যেতে পারেনি। তাই এবার বলল, সিনেমা নয়, আমাদের সঙ্গেই যাবে। আমি সুভদ্রামাসিকে ফোন করে জানিয়ে দিলাম আমরা আসছি। ফ্রান্সিস্কার কথা আগেরবার উনি শুনেছিলেন। শুনে সন্তোষও প্রকাশ করেছিলেন আমাদের মধ্যে অন্ততঃ একজনের গার্লফ্রেন্ড হয়েছে।

আচার পেয়ে সুভদ্রামাসি খুব খুশি হলেন। বললেন, "তোমার মা জানে লেবুর আচার আমার ভীষণ পছন্দ। মাসিমা, মানে তোমার দিদিমা, এটা অপূর্ব বানাতেন। ছেলেবেলায় মাসিমার কাছে গেলেই লেবুর আচার আমার বরাদ্দ ছিল। তোমার মাও ভালো বানায়।"

মা-র চিঠিটা দিলাম। মা খুব সেন্টিমেন্টাল হয়ে গিয়েছিল দিদিমা আর সুভদ্রামাসির মা'র কমবয়সি ছবি দেখে। পার্কিন্সন্স হবার পর থেকে, মা ভালো করে আর লিখতে পারে না। দুয়েকটা পুরোনো কথা তাই আমাকে দিয়ে লিখিয়েছিল। কলকাতার অনেক গল্প হল। আমাদের শান্তিনিকেতনে যাবার কথা আর শিশিরবাবুর মৃত্যুর ঘটনাও কথা প্রসঙ্গে এল। সুভদ্রামাসি বললেন, শিশিরবাবু নামটা ওঁর চেনা চেনা লাগছে, রিচার্ডের কাছেই বোধহয় শুনেছেন। কিন্তু কী সূত্রে মনে করতে পারলেন না। কলকাতায় থাকাকালীন শান্তিনিকেতনে রিচার্ড একবার বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানেই নিশ্চয় শিশিরবাবুর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।

খাবারের আয়োজন এবারও দারুণ। আমরা পরম তৃপ্তি করে খেলাম। ফ্রান্সিস্কাকে নিয়ে আমাদের একটু চিন্তা ছিল। ও শুধু সবকিছু খেল তাই নয়, কিছুক্ষণের মধ্যেই সুভদ্রামাসির ফেভারিট পার্সন হয়ে গেল! খাবার পর সুভদ্রামাসি ওকে শাড়ি গয়না দেখালেন।

শাড়ি পরা শিখতে চায় শুনে, একটা শাড়ি আর একটা ব্লাউজ বার করে ওকে পরিয়েও দিলেন। ব্লাউজটা পুরোনো — সুভদ্রামাসির কমবয়সের ব্লাউজ। বেশ ফিট করে গেল ফ্রান্সিস্কার। দেশের আচ্ছাদনে সুন্দর লাগছিল ওকে দেখতে। প্রমথ বিমুগ্ধ।

একেনবাবু গম্ভীরভাবে মন্তব্য করলেন, "যাই বলুন স্যার, শাড়ির অ্যাপিলই আলাদা।"

ফ্রান্সিস্কার মা নেই, আর সুভদ্রামাসির সন্তান নেই। তাই বোধহয় একজন আরেকজনের অভাব পূরণ করল। সুভদ্রামাসি পরম উৎসাহে ওকে বাড়ি দেখাতে লাগলেন। ফ্রান্সিস্কাও ওঁর হাত ধরে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। কোন জিনিসটা কী, কত পুরোনো, কোত্থেকে এসেছে— তার বিস্তারিত খবর নিল। তবে আমার মাঝে মাঝে ভয় করছিল। সুভদ্রামাসির ব্যালেন্স এখন আর ভালো নেই, যদিও ফ্রান্সিস্কা ওঁর হাত ধরে আছে। কিন্তু কাচের বড়ো বড়ো ফুলদানি, জার ইত্যাদি নামিয়ে যখন উনি দেখাচ্ছিলেন, ভয় করছিল হাত থেকে ফসকে রক্তারক্তি না ঘটে। একবার তো বলেই ফেললাম।

সুভদ্রামাসি হাসতে হাসতে বললেন, "ভাবিস না, যখন ব্যালেন্স ছিল তখনও ভেঙেছি, হাত-পাও কেটেছি। তবে তোরা তো আছিস, কেটে-ছড়ে রক্তারক্তি হলে বুড়ি মাসিকে না হয় একটু রক্ত-টক্ত দিস।"

আমি বললাম, "যাঃ, ঠাট্টা করো না।"

সুভদ্রামাসি দেখলাম খুব মুডে আছেন। বললেন, "কেন দিবি না নাকি?"

ওঁর আমি মুডটা নষ্ট করতে চাইলাম না। বললাম, "নিশ্চয় দেব, যদি তুমি নিতে পার।"

"পারব না কেন, রক্তের ব্যাপারে আমার মস্ত সুবিধা, আমি হলাম ইউনিভার্সাল রিসিভার।"

প্রমথ বলে উঠল, "এখন আর ইউনিভার্সাল রিসিভার কেউ নয় মাসি — আরও বহু ফ্যাক্টর নিয়ে ডাক্তারদের মাথা ঘামাতে হয়।"

ফ্রান্সিস্কা বুদ্ধিমতী। আমাদের কথাবার্তা ঠিক না বুঝলেও আমার উদ্বিগ্নতার কারণটা আঁচ করতে পারল। এরপর দেখলাম সুভদ্রামাসিকে কিছু নামাতে না দিয়ে নিজেই সাবধানে নামিয়ে নামিয়ে দেখছে। ফ্রান্সিস্কা যখন বাড়িঘর দেখতে ব্যস্ত, আমরা তিনজন ফ্যামিলি রুমে কফি নিয়ে বসলাম। কী করণে যাদবপুরের প্রসঙ্গ ওঠায়, আমি আর প্রমথ পুরোনো দিনের কথায় মশগুল হয়ে গেলাম। একেনবাবু দেখলাম উঠে গিয়ে সুভদ্রামাসিদের জিনিওলজির অ্যালবামে চোখ বোলাচ্ছেন আর মাঝে মাঝে বইয়ের আলমারি থেকে স্টুয়ার্টমেসোর কালচারাল অ্যান্থ্রপলজির বই ঘাঁটছেন।

কিছুক্ষণ বাদে ফ্রান্সিস্কা সুভদ্রামাসিকে নিয়ে ফিরে এল আর এসেই মাসিকে বলল গান গাইতে।

সুভদ্রামাসি বললেন, "দেখো কান্ড, এখন কি আর তেমন গাইতে পারি!"

ফ্রান্সিস্কা চোখ গোল গোল করে আমাদের বলল, "তোমরা জানো, মা'র গানের রেকর্ড আছে?"

তথ্যটা জানা ছিল না। আর এও জানা ছিল না এর মধ্যেই ফ্রান্সিস্কার সঙ্গে সুভদ্রামাসি মা-মেয়ের সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলেছেন! যাইহোক, ফ্রান্সিস্কার অনুরোধ এড়াতে না পেরে সুভদ্রা মাসি দুটো রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলেন। এখনও গলা অপূর্ব।

আমি বললাম, "সত্যি সুভদ্রামাসি, তুমি আর রেকর্ড করাও না কেন?"

"দূর, কবে চর্চা ছেড়ে দিয়েছি।"

তবে বুঝলাম একটু-আধটু চর্চা এখন করতে হবে, কারণ ফ্রান্সিস্কার সঙ্গে চুক্তি হয়েছে, প্রতিমাসে একবার সুভদ্রামাসির কাছে এসে ফ্রান্সিস্কা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখবে।

আমি বললাম, "চমৎকার আইডিয়া, আমরাও আসব।"

প্রমথ বলল, "ও কিন্তু আসবে খাবার লোভে।"

"সেটা তো আনন্দের কথা। মাসির বাড়িতে তো খেতেই আসে সবাই। ও যখন গান শিখবে, তোমরা না হয় গল্প গুজব কোরো। বেসমেন্টে একটা পুল টেবিলও আছে।"

ফেরার পথে ফ্রান্সিস্কা একেবারে উচ্ছ্বসিত। "শি ইজ সো লাভিং," বার বার বলল কথাটা। "উই জাস্ট গট কানেক্টেড লাইক দ্যাট! আর বাড়িটা দেখেছো কী টেস্টফুলি ডেকোরেটেড?"

কথার পিঠে কথা বলা একেনবাবুর স্ট্রং পয়েন্ট নয়। উনি বললেন, "আপনি যে গান গান, সেটা কিন্তু জানতাম না ম্যাডাম।"

একেনবাবুর কাছে 'ম্যাডাম' শুনে প্রথমবার ফ্রান্সিস্কার মুখের অবস্থা হয়েছিল দেখার মতো। যদিও একেনবাবুর মোটামুটি একটা পিকচার আগে থেকেই প্রমথ ফ্রান্সিস্কাকে দিয়েছিল। প্রথম পরিচয়ের পর একাধিক বার একেনবাবুকে 'ম্যাডাম' বলা থেকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেছে ফ্রান্সিস্কা। একেনবাবু প্রত্যেকবারই জিব কেটে বলেছেন, 'সরি

ম্যাডাম, ওটা আমার মুদ্রাদোষ হয়ে গেছে।' আজকাল আমরাও যেমন ওঁর স্যার নিয়ে মাথা ঘামাই না। ফ্রান্সিস্কাও ম্যাডাম শব্দটা ইগনোর করে।

ফ্রান্সিস্কা বলল, "কলেজে আমার মিউজিক মাইনর ছিল। যদিও ফাঁকি দিয়েছি খুব।"

"আপনি ম্যাডাম, অসাধারণ ট্যালেন্টেড। স্কি, গান,পড়াশুনা — সত্যি অ্যামেজিং!"

ফ্রাম্সিস্কা একটু লাল হয়ে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ, ডিটেকটিভ!"

ফ্রান্সিস্কা একেনবাবুকে পছন্দ করে। সব সময় ডিটেকটিভ বলেই ডাকে। তারপর বলল, "আচ্ছা ডিটেকটিভ, তুমি মা-র বাড়িতে ঐ মূর্তিটা দেখেছ? ওটা অপূর্ব সুন্দর, না?"

"ইয়েস।"

"মা বললেন, ওটা চুরি হয়ে গিয়েছিল। পরে চোর ফেরত পাঠিয়ে দেয়। আই ওয়াজ সো সারপ্রাইজড! ওই রকম মূর্তি যদি সত্যিই কেউ চুরি করে, তাহলে ফেরত পাঠিয়ে দেবে কেন! তোমার কি মনে হয়?"

"আমি আপনার সঙ্গে একমত। ভেরি কনফিউজিং!"

"আই থিঙ্ক ইউ শুড সলভ দিস মিস্ট্রি।"

"দাঁড়াও, দাঁড়াও," প্রমথ বলল, "একেনবাবু দশদিন আগে একটা মার্ডার সলভ করতেই হিমসিম খাচ্ছেন — আর এটা তো ষাট বছরের আগের চুরি।"

"মার্ডার নিয়ে পুলিশ ভাবুক। বাট দিস ওয়ান ইজি সো ইন্টারেস্টিং। আমি রিয়েলি ফ্যাসিনেটেড মূর্তিটা দেখে। বাই দ্য ওয়ে, ড্যু ইউ নো, মা কি বলেছে?"

"না।"

"ঐ মূর্তিটা উনি আমায় দিয়ে যাবেন।" বিজয়িনীর মতো মুখ করে ফ্রান্সিস্কা বলল।

"নো ওয়ান্ডার তুমি ওকে তেল দিচ্ছিলে," প্রমথ বলল। "মা মা বলে ডাকা, গান শিখব বলা। নাউ আই আন্ডারস্ট্যান্ড।"

ফ্রান্সিস্কা প্রমথর হাতে একটা থাপ্পড় দিয়ে বলল, "ডোন্ট বি সিলি!"

বাড়ি ফিরে প্রভাসের একটা সংক্ষিপ্ত ইমেইল পেলাম। শিশিরবাবুর ইনভেস্টিগেশনটা চলছে। ওদের বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে — ফেব্রুয়ারীর ১৫ তারিখে। আমাকে মিস করবে বলে দুঃখ করেছে।

খবরটা জানাতেই প্রমথ অ্যাস ইউস্যুয়াল খোঁচা দিল, "এটা কি গুড নিউজ না ব্যাড নিউজ?"

"ডোন্ট বি স্টুপিড।"

একবার ভুল করে বন্দনার প্রতি আমার দুর্বলতার কথাটা প্রমথকে বলে ফেলেছিলাম, তার জের এখনও পোয়াতে হচ্ছে!

## ।। ১১ ।।

বন্দনা আর প্রভাসের বিয়ে নেক্সট উইকে হচ্ছে। আজকাল অনলাইনে গিফ্ট কিনে উপহার

দেওয়া যায়। যদিও সেটা খুব একটা সস্তায় হয় না। আমি গিফ্ট-ইন্ডিয়া ডট কম-এ দিয়ে একটা ব্রোঞ্জের বুদ্ধমূর্তি অর্ডার করলাম। বন্দনার জন্যই ওটা কিনলাম। আমাদের বাড়িতে একটা বুদ্ধমূর্তি ছিল, নেপাল থেকে বাবা কিনে এনেছিলেন। বন্দনা সেটা খুব ভালোবাসত। পুরোনো কথা। এখন হয়তো ভুলেও গেছে। প্রমথ অবশ্য আমার থেকে অনেক বেশি দূরদর্শী। ওর মা'কে বলে এসেছিল একটা ভালো শাড়ি কিনে রাখতে। সেই সঙ্গে বলে এসেছে বিয়েটা গোপনে হচ্ছে, কাউকে যেন কিছু না বলেন, শুধু বিয়ের পরে বন্দনার হাতে যেন শাড়িটা পৌঁছে দিলেই হবে। আমি মা'কে কিছু বলিনি, পেটে কথা রাখতে পারে না বলে।

কলেজে যাবার আগে ইমেইল চেক করতে গিয়ে বন্দনার একটা মেসেজ পেলাম। ওর বাবা-মা বিয়ে দিতে রাজি হয়েছেন। রেজিস্ট্রিটা যেমন হবার তেমন হবে। হিন্দু বিয়েটা হবে ছ' সপ্তাহ বাদে। লিখেছে, 'তোমার ওকালতি বোধ হয় কিছুটা কাজ করেছে। তার থেকেও বোধ হয় বেশি কাজ হয়েছে যখন জানিয়েছ, তুমি ওদের জামাই হতে চাও না।' বন্দনা মিথ্যে বলেনি। অথচ, কথাটা সম্পূর্ণ সত্যিও নয়। এনিওয়ে, শিশিরবাবুর কোনো কথা বন্দনার চিঠিতে নেই। আশাও করিনি। ও এখন নিজের বিয়ে নিয়ে মশগুল। ফ্র্যাঙ্কলি, শিশিরবাবুর মৃত্যু নিয়ে প্রধান যে চিন্তাটা ছিল, সেটা দূর হওয়ায় আমিও ওসব নিয়ে বিশেষ ভাবছি না। একেনবাবুর ব্যাপারটা আলাদা। উনি সাধারণত আগবাড়িয়ে কোনো কিছুতে জড়ান না। কিন্তু একবার জড়িয়ে গেলে, জট না ছাড়া পর্যন্ত চুপচাপ থাকতে পারেন না। দুদিন আগেও দুলাল মিত্রের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেছেন। গতকাল দেখলাম দুলাল মিত্রের কাছ থেকে ওঁর নামে একটা মোটা খাম এসেছে। কিন্তু খামের মধ্যে কি আছে সেটা আর জানা হয়নি, কারণ একেনবাবু এক দিনের জন্য মায়ামি গেছেন একটা কনফারেন্সে। ফিরবেন আজ বিকেলে। তখন জানতে পারব।

ফ্যান্সিস্কার ফোন এল। এই শনিবার সুভদ্রামাসির কাছে গান শিখতে যেতে চায়। জিজ্ঞেস করল, আমাদের সুবিধা হবে কিনা। তাহলে সুভদ্রামাসিকে ফোন করবে। বিনি পয়সায় ভোজে আপত্তিটা কোথায়! প্রমথ নিশ্চয় রাজি হয়েছে। একেনবাবুরও মনে হয় না আপত্তি হবে বলে। বললাম, "গো অ্যাহেড।"

একেনবাবু এলেন বিকেল বেলায়। বললাম, "আপনার একটা বড়ো খাম এসেছে দুলাল মিত্রের কাছ থেকে।"

"এসে গেছে স্যার! কই দিন।"

খামটা এগিয়ে দিতেই সেটা ছিঁড়ে একতাড়া কাগজ বার করলেন।

"কী ওগুলো?"

"যে চিঠিগুলো শিশিরবাবুর বাড়িতে মেঝেতে পেয়েছিল, তারই কপি।"

একেনবাবু চোখ বুলিয়ে চিঠিগুলো আমাকে দিলেন। গোটা আটেক পুরোনো চিঠি। লেখাগুলো কিছু কিছু জায়গায় অস্পষ্ট হয়ে গেছে। অনেকদিন ভাঁজ করা অবস্থায় ছিল, ভাঁজের জায়গাগুলো ভালো পড়া যাচ্ছে না। বোঝাই যায় প্রেমপত্র। হাতের লেখা সব একই ছাঁদের। সুতরাং শিশিরবাবুর কোনো বান্ধবী হবেন। বান্ধবী বলছি, কারণ প্রভাসের কাছে শুনেছি উনি বিয়ে করেননি। তথ্যটা সঠিক কিনা জানি না।

"কোনো চিঠিতেই তারিখ নেই," একেনবাবু বললেন।

"তারিখ জানলে সুবিধা হতো?"

"কে জানে স্যার, তবে এইটেই মনে হয় শেষ চিঠি।" একেনবাবু একটা চিঠির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। আঁকাবাঁকাভাবে এক লাইনের চিঠি।

‘এটা রেখে দিও, আর কাল ভোর চারটের সময় ট্যাক্সি নিয়ে বাইরে অপেক্ষা কোরো।’

খুব তাড়াহুড়ো করে লেখা। জেরক্স-এ আসল কাগজের একটা ছাপ বাইরে পড়ে। সেই ছাপ থেকে বোঝা যাচ্ছে, যে কাগজে লেখা হয়েছিল — সেটা চিঠি লেখার কাগজ নয়, এক টুকরো ছেঁড়া কাগজ।

জিজ্ঞেস করলাম, “কী বুঝছেন?”

“কে জানে স্যার, এইসব প্রেম-ফ্রেম বুঝি না। আমার আবার অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ। বাবা বললেন করতে, আমি করলাম।”

“সেটা বুঝলাম। কিন্তু দুশো টাকার ডাক টিকিট লাগিয়ে ও.সি সাহেব এটা পাঠালেন, কিছুই মিলল না বলছেন।”

“আপাতত নয় স্যার। তবে ভবিষ্যতের কথা আমরা কতটুকু জানি।” খামের মধ্যে চিঠিগুলো ভরতে ভরতে একেনবাবু বললেন।

আমি বললাম, “টু ব্যাড, চিঠিগুলো ছেলেদের লেখা নয়।”

“কেন বলুন তো স্যার?”

“তাহলে আপনি গিন্নীকে চিঠিগুলো কপি করে পাঠাতে পারতেন।”

“এই সব চিঠি পেলে স্যার ও হার্ট ফেল করত। ভাবত নির্ঘাৎ আমি কারোর সঙ্গে প্রেম-টেম করছি।”

প্রমথ বাড়িতে এসে চিঠিগুলো দেখল। ও আবার খুব টেকনিক্যালি সবকিছু দেখে। বলল, “দেখলি একটা বানান ভুল নেই। তুই হলে একগণ্ডা বানান ভুল লিখতি। বিশেষ করে এই ‘সরস্বতী’ আর ‘যথেষ্ট’ বানানটা।”

আমায় মানতে হবে ওই দুটো বানান আমি সবসময়ে ভুল করি, আর প্রমথ সেটা কারেক্ট করে প্রভূত আনন্দ পায়।

## ।। ১২ ।।

শনিবার সুভদ্রামাসির বাড়িতে ফ্রান্সিস্কার রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা শুরু হল। আমরা নির্বাসিত হলাম বেসমেন্টে। সুভদ্রামাসির বেসমেন্টে আগে কোনোদিন আসিনি। বিশাল বেসমেন্ট, পুরোটাই ফিনিশড। শুধু যেখানে ফার্নেস আর জলের হিটারটা আছে সেটা পার্টিশন দিয়ে ঘেরা। মেঝেটা দামি কার্পেটে ঢাকা। একদিকে পুল টেবিল, ট্রেড মিল, আর এক্সারসাইজ বাইক। নিশ্চয় রিচার্ডমেসো ওগুলো ব্যবহার করতেন। অন্যদিকে একটা ফুল ফাইভ-পিস সোফাসেট। দেয়াল জুড়ে লম্বা বিল্ট-ইন বুকশেলফ।

সেখানে সাজানো অজস্র বই।

একেনবাবু কয়েকটা বই নিয়ে সোফায় বসলেন। আমিও বই ঘাঁটতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু প্রমথ বলল, “একটু পুল খেললে মন্দ হয় না।”

তিনজনে একসঙ্গে পুল খেলা যায় না। একেনবাবু দেখলাম খেলায় খুব একটা উৎসাহী নন।

আমি পুল খেলা এদেশে এসে শিখেছি। নিয়মটা জানি এইটুকুই। প্রমথ বলল ও শুধু একদিন খেলেছে। অথচ দিব্বি আমাকে নাকানি চোবানি খাওয়াতে শুরু করল।

আমি ওর একদিন খেলা-র সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করাতে, বলল, "চুপ কর, তোকে হারাতে আবার প্র্যাকটিস করতে হবে নাকি!"

আমি তার উপযুক্ত জবাব দেবার আগেই একেনবাবু এসে বললেন, "স্যার, ট্রুলি অ্যামেজিং!"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী পড়ছেন অত মন দিয়ে?"

"কী করে জিনিওলজি কনস্ট্রাক্ট করতে হয়। এইসব নিয়ে যে এত বই আর অর্গানাইজেশন আছে, আমার ধারণাই ছিল না!"

"মনে হচ্ছে আপনি এখন জিনিওলজির কিক্-এ আছেন," প্রমথ টিপ্পনি কাটল।

"তা আছি স্যার। সত্যি দেখুন তো, এই ধরুন রবীন্দ্রনাথ। তিনি তো জন্মেছেন ১৮৬১-তে। তাঁর সম্পর্কে আমরা খুঁটিনাটি কত কিছু জানি। এবার দেখুন স্যার, রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় আপনার ঠাকুরদার বাবার থেকেও বড়ো।"

এবার একটু হিসেব করতে হল। আমার বাবা জন্মেছেন ১৯৪৫ সালে। বছর পঁচিশ-তিরিশ বয়সে যদি পূর্বপুরুষদের সন্তান হয়েছিল ধরা যায়, তাহলে রবীন্দ্রনাথ আর আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা এক বয়সি হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়।

"তা হবেন সম্ভবত।"

"এবার বলুন স্যার, আপনার ঠাকুরদা কী করতেন?"

"তিনি কলেজে পড়াতেন।"

"ঠাকুরদার বাবা?"

"শুনেছি উকিল ছিলেন, খুব শিওর নই।"

"তাঁর বাবা?"

"কোনো ধারণাই নেই।"

"দ্যাট্স দ্য পয়েন্ট স্যার। আমরা নিজেদের হিস্ট্রি কিছুই জানি না।"

"জানার কি খুব প্রয়োজন আছে?" প্রমথ প্রশ্ন তুলল। "ধরুন, আপনার ঠাকুরদার ঠাকুরদা ছিলেন অতি জোচ্চর, বদমাইশ লোক — দুনিয়া ঠকিয়ে খেতেন। কিংবা ধরুন তিনি ছিলেন অতি মহৎ সাধুসজ্জন এক ব্যক্তি। তাতে আপনার কী এসে গেল?"

একেনবাবু মাথা নাড়লেন, "না স্যার, রুটটা ইম্পর্টেন্ট। আপনি যাই বলুন না কেন।"

"ননসেন্স!" প্রমথ একেনবাবুর বক্তব্য খারিজ করল।

পুল খেলাটা বিশেষ জমছিল না। তাই সবাই উপরে চলে এলাম। এসে দেখি ফ্রান্সিস্কার গান শেখা পুরোদমে চলছে। ওদের ডিস্টার্ব না করে, আমরা লিভিংরুমে এলাম। আমি ঘরের আরাম কেদারায় শুয়ে গান শুনছি, একেনবাবু নীচ থেকে বই এনে মগ্ন হয়ে পড়ছেন। প্রমথ একটু ঘুর ঘুর করে সুজাতার সঙ্গে গল্প-গুজব করতে গেল। নিশ্চয় রান্নার টিপস নিচ্ছে। ও রাঁধতে ভালোবাসে, তবে খুব লিমিটেড মেনু। সুতরাং ও যে সুজাতার সঙ্গে কথা বলছে, তাতে আমি উৎসাহিত হলাম।

শুয়ে শুয়ে একটু ঝিমুনি এসে গিয়েছিল। প্রমথর ডাকে চমক ভাঙল। "কিরে শুয়ে শুয়ে নাক ডাকছিস?"

"সেকি রে অনেকক্ষণ ঘুমোলাম নাকি!"

"তা আধঘন্টা তো হবেই।"

"সুভদ্রামাসিরা কোথায়?"

“রান্নাঘরে।”

“গান শেখা শেষ?”

“হ্যাঁ, কিন্তু এখন ওখানে যেতে পারবি না। আমাকেও তাড়িয়ে দিল।”

“তার মানে?”

“সোশিওলজিক্যাল ডিসকাশনস হচ্ছে — ইন্টার-রেশিয়াল ম্যারেজের সুফল -কুফল নিয়ে।”

অনেকদিন থেকেই আঁচ করেছি প্রমথর ব্যাপারে ফ্রান্সিস্কা এখন খুব সিরিয়াস।

চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, “সুভদ্রামাসি, আমার কি ওখানে যাওয়া বারণ?”

“কেন বারণ হবে?”

“প্রমথ যে বলল।”

“ও পালাতে চাইলে আমি কি করব?”

কিছুক্ষণের মধ্যেই সুভদ্রামাসি আর ফ্রান্সিস্কা আমাদের সঙ্গে এসে বসল। আমিই বললাম, “তোমরা নাকি মিক্সড ম্যারেজ নিয়ে আলোচনা করছিলে।”

“তা একটু করছিলাম।”

“আচ্ছা, সুভদ্রামাসি, তুমি যখন মেসোমশাইকে বিয়ে করবে বলে বাবা-মাকে বললে, তখন তাঁদের রিয়্যাকশন কী হয়েছিল?”

“শোনো ছেলের কথা,” সুভদ্রামাসি সস্নেহে আমার দিকে তাকালেন।

“বলো না।”

“বাবার ভীষণ আপত্তি ছিল। চিঠি লেখাই বন্ধ করে দিয়েছিল।”

“আর তোমার মা-র?”

“মা অতটা আপসেট হয়নি, যদিও আমার ভয় ছিল মা-কে নিয়েই। বাবাকে আমি একজন লিবারেল ইন্ট্যালেকচুয়াল ভাবতাম। লন্ডন-ফেরত ফিলসফির লোক। মা’র যেটুকু পড়াশুনো দেশেই, দাদু-দিদিমার ফ্যামিলি ছিল খুব কনসার্ভেটিভ। কিন্তু মা লিখেছিল, ‘তোমার বাবার সঙ্গে সম্বন্ধ করে বিয়ে হয়েও ওঁকে আমি ভালোবাসতে পেরেছি। তুমিও সেটা পারতে বলে আমার বিশ্বাস। তাও আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমার বন্ধুকেই যদি বিয়ে করো, আমাকে সেটা মানতেই হবে। শুধু মনে রেখো, ভালোবাসার যে উন্মত্ততা এখন অনুভব করছ, সেটা কিন্তু জিইয়ে রাখা কঠিন। দুই কালচারে দুই ধর্মের মধ্যে তোমরা বড়ো হয়েছ, সেই ব্যবধান অতিক্রম করার শক্তি তুমি যেন পাও।’।”

“মাই গড, তোমার মনে আছে কথাগুলো?”

“খুব, ওই চিঠিটা যে আমি কতবার পড়েছি!” বলে সুভদ্রামাসি খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, “চলো, তোমাদের নিশ্চয় খুব খিদে পেয়ে গেছে। এবার খেয়ে নেওয়া যাক।”

খেতে খেতে একেনবাবু হঠাৎ বললেন, “মাসিমা, আমি রিচার্ডমেসোকে দেখিনি, কিন্তু উনি রিমার্কেবল।”

সুভদ্রামাসি হেসে বললেন, “তা তো আমি জানি, কিন্তু তুমি সেটা আবিষ্কার করলে কী করে?”

“আমি আপনাদের জিনিওলজিটা সেদিন পড়ছিলাম। আজকেও কয়েকটা পাতা উলটোলাম — কী ভাবে সব ইনফরমেশন জোগাড় করেছেন। বিশেষ করে আপনার দাদুর ঠাকুরদার খবরগুলো।”

একেনবাবুর কথা শুনে সুভদ্রামাসিকেও চিন্তা করতে হল, “কার কথা বলছ একেন?”

"কেন শিবনারায়ণ গুপ্তর কথা।"

"ওরে বাবা তুমি তো আমার গুষ্টির খবর জেনে ফেলেছ!"

"না, ম্যাডাম, মানে মাসিমা — আমি ওঁর লেখা আর নোটগুলো পড়ে মুগ্ধ!"

সুভদ্রামাসিকে বোঝালাম, "প্রমথর ভাষায় একেনবাবু এখন জিনিওলজির কিক্-এ আছেন।"

"আহা বেশ তো। রিচার্ড কত কষ্ট করে ওগুলো লিখেছে, একজন তো মন দিয়ে পড়ছে।"

"প্রতিটি পাতা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছি। কোথায় কোথায় ঘুরেছেন — ব্রাসেলস, প্যারিস, মিউনিক... একটা বিরাট রিসার্চ।"

"সেটা করেছে। একেবারে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল কয়েক বছর।"

"কিন্তু এতসব খবর জোগাড় করলেন কি করে?"

"রোহিতই যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিল বাবু পিন্টো বলে এক জিনিওলজি কনসাল্টেন্টের সঙ্গে। রোহিতেরই বয়সি, খুব এন্টারপ্রাইজিং। সেও খুব ইন্টারেস্ট পেয়েছিল কাজটায়। রিচার্ডের সঙ্গে ইউরোপে গিয়েছিল।"

প্রমথ বলল, "ব্যাস, আপনি এবার একটা লিড পেয়ে গেলেন। বাবু পিন্টোর সঙ্গে যোগাযোগ করে আপনার ফ্যামিলি ট্রি-টাও শুরু করে দিন।"

"কী যে বলেন স্যার, এসব অনেক পয়সার ব্যাপার। তবে একটু টিপস যদি পেতাম কি করে কাজটায় এগোব..."

"কথা বলে দেখতে পারো," সুভদ্রামাসি সস্নেহে বললেন। "আমার কাছে এসেছে বাবু কয়েকবার, ছেলেটা ভালো।"

## ।। ১৩ ।।

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। এবার দেশ থেকে ফেরার সময় বাড়ির পুরোনো অ্যালবামটা নিয়ে এসেছি। সেখানে বাবার বেশ কয়েকটা ছবি আছে। মা-র খুব ইচ্ছে বাবার একটা ছবি ডিজিটালি এনহ্যান্স করি, যেরকম সুভদ্রামাসি ওঁর মা আর আমার দিদিমার ছবিটা করেছেন। আমি রোহিত রয়কে ধরব ঠিক করেছিলাম, কিন্তু দেখলাম একেনবাবু আরেকজন এক্সপার্টের খোঁজ পেয়েছেন। তাকে দিয়ে বউয়ের একটা ছবি ফ্রেম করিয়ে নাইট স্ট্যান্ডের উপর রেখেছেন।

আমি বললাম, "একেনবাবু এই লোকটিকে আমারও লাগবে। বাবার কয়েকটা ছবি এনেছি।"

"নিশ্চয় স্যার।"

"কত নিল আপনার কাছ থেকে?"

একেনবাবু কিছু বলার আগেই প্রমথ বলল, "ক্ষেপেছিস, উনি গাঁটের পয়সা খরচা এসব করবেন। নিশ্চয় পরস্মৈপদী।"

"কি, সত্যি নাকি?"

"আসলে স্যার, এখনও দেওয়া হয়নি কিছু। মানে স্টুয়ার্ট সাহেবের খুব চেনা জানা লোক আর কি।"

"তাহলে বুঝে নে,"প্রমথ বলল।

"সে যাই হোক, খুব বেশি না হলেই হল। দুটো কপি করিয়ে নেব তাহলে। একটা আমার কাছে রাখব।"

"আমায় দিন না ছবি, আমি করিয়ে আনব।"

"কোন ছবিটা করি বলুন তো," বলে আমি অ্যালবাম খুললাম। তারমধ্যে মা'কে সুভদ্রামাসির দেওয়া ছবিরও একটা কপি ছিল; কলকাতার স্টুডিও থেকে কপি করে এনেছিলাম নিজের কাছে রাখব বলে।

একেনবাবু সেটা দেখে বললেন, "যাই বলুন স্যার, ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের ফোটো স্পেশালিস্টের কাজ আরও ভালো।"

আমি বললাম, "এটা কিন্তু অরিজিন্যাল নয়, অরিজিন্যালটা মায়ের কাছে।"

"না, না এটাও খারাপ নয়। কিন্তু আমার ফ্যামিলির ছবিটা খুব ন্যাচারাল হয়েছে।"

"নিজের বউয়ের ছবি তো ভালো লাগবেই। শুধু শুধু ফোটো-স্পেশালিস্টকে গালমন্দ করছেন কেন!" প্রমথ মন্তব্য করল।

"চুপ কর তো, একটা ছবি সিলেক্ট কর এখান থেকে — যেটা বড়ো করা যায়।"

"আমি বলি স্যার, অ্যালবামটা ওঁর কাছে নিয়ে চলুন। কোনটে বড়ো করলে ভালো হবে উনি বলতে পারবেন।"

"ভদ্রলোক থাকেন কোথায়?"

"খুব দূরে নয়, থার্টি নাইন্থ স্ট্রীট আর নাইন্থ অ্যাভেনিউয়ের কাছে।"

একেনবাবু ফোন করে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিলেন। ঠিক হল ওখানে গিয়ে ছবিটা দিয়ে কোথাও লাঞ্চ খেয়ে আমরা ফিরব।

আজকে বেশ ঠান্ডা পড়েছে। স্টুয়ার্ট সাহেবের ফোটো-স্পেশালিস্টকে ছবি দিয়ে কাছেই একটা ছোট স্যান্ডউইচ শপ ছিল — সেখানে ঢুকলাম। একেনবাবু প্রথমেই যা করেন — মেনুতে চোখ বুলিয়ে আর্তনাদ করলেন।

"এ একেবারে মার্ডার স্যার। এইটুকু তো দোকান, কিন্তু দামের বহর দেখেছেন?"

ফ্র্যাঙ্কলি, খুব একটা বেশি দাম মেনুতে দেখলাম না। নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটানে দামগুলো একটু চড়াই হয়।

"আপনি একটা কাজ করুন না, প্রমথ বলল, "মোড়ের মাথায় হট ডগের ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে চলে যান।"

"লাঞ্চ ইজ অন মি," আমি ঘোষণা করলাম।

একেনবাবু একটু লজ্জা পেলেন, "না, না, সে কি স্যার, সব ডাচ ট্রিট।"

কথাটা একেনবাবু শিখেছেন ফ্রান্সিস্কার কাছ থেকে। ও একদিন এসেছিল, সেদিন প্রমথ বাইরে। আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম বাইরে কোথাও খাওয়ার। ফ্রান্সিস্কা বলেছিল, "ও-কে, কিন্তু ডাচ ট্রিট।"

একেনবাবু আমার দিকে একটু অবাক হয়ে তাকাতে, আমি বলেছিলাম, "হিজ হিজ, হুজ হুজ।"

কথাটা খুব মনে ধরেছিল। পরে আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আচ্ছা, কথাটা এল কোত্থেকে? ডাচরা কি খুব ইন্ডিপেন্ডেন্ট — কেউ কারোর কাছ থেকে কিছু নিতে চায় না।"

“আই হ্যাভ নো ক্লু। আপনি বরং ফ্রান্সিস্কাকে জিজ্ঞেস করুন।”

“নাঃ, উনি তো সুইস। ইউরোপের লোকেদের মধ্যে অনেক রাইভ্যালরি থাকে স্যার। অনেস্ট অ্যাসেসমেন্ট পাব না।”

“কেন, আপনি তো ফ্রন্সিস্কাকে খুব পছন্দ করেন। ওকে অবিশ্বাস করবেন?”

“আরে ছি, ছি, স্যার, আপনি একেবারে হিউমার বোঝেন না।”

“ঠিকই, কী করে বুঝব যে আপনি গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে হিউমারিস্ট হবার চেষ্টা করছেন।”

ডাচ ট্রিটের কথা ভেবেই বোধহয় একেনবাবু শুধু কফি আর একটা ডোনাট অর্ডার করলেন। জোর করেও ওঁকে দিয়ে অমলেট বা কোনো স্যান্ডউইচ অর্ডার করাতে পারলাম না। আমি আর প্রমথ অর্ডার দিলাম দুটো বড়ো চীজ বার্গার আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের।

খেতে খেতে প্রমথ হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, “আচ্ছা রবীন্দ্রনাথের লেখা শীতের উপর ক'টা গান তোর মনে আছে?”

“কেন বলত?”

“কারণ অল্পই লিখেছেন। ঋতু নিয়ে ওঁর লেখায় খালি পাবি বর্ষা। হ্যাঁ, বসন্তও আছে, কিছু শরৎ আর কিছু গ্রীষ্ম — ব্যাস। বর্ষাকালে ঘরবন্দী হয়ে থাকতেন, আর এন্তার লিখতেন। ভদ্রলোক নিউ ইয়র্কে থাকলে দেখতিস কলম দিয়ে শীতের গানের ফুলঝুরি বেরত।”

প্রমথর মতো নিরস লোকের কাছে বর্ষার রূপ নিয়ে আলোচনা করা অর্থহীন। তবে ওর লজিকের বিরুদ্ধে বড়ো কোনো আগ্ুমেন্ট আমার মাথায় এল না। বাস্তবিকই খেয়ে দেয়ে আবার এই ঠান্ডায় রাস্তায় বেরতে হবে ভাবতেও গায়ে জ্বর আসে।

একেনবাবু এদিকে মন দিয়ে আমাদের বাড়ির অ্যালবামের পাতা উলটে উলটে ছবিগুলো দেখছেন। মাঝে মাঝেই ‘এটা কার ছবি,’ ‘তিনি কোথায়,’ ‘কি করেন,’ ইত্যাদি প্রশ্ন ছুঁড়ছেন। ছবিতে আমার দিদিমার কয়েকটা ছবি ছিল। কিন্তু সেগুলো বেশি বয়সের। একেনবাবু বললেন, “যাই বলুন স্যার, আপনার দিদিমা কিন্তু ওঁর সৌন্দর্য ঠিক ধরে রেখেছিলেন!”

প্রমথ বলল, “এই তেলটা আপনি বাপিকে কেন দিচ্ছেন — যাতে ও বিল পে করে?”

“না,না স্যার সিরিয়াসলি। মাসিমার দেওয়া ছবিতে যেমন দেখতে ছিলেন, প্রায় সেই একই চেহারা ধরে রেখেছেন অনেক পরে তোলা এই ছবিগুলোতে।” বলে অ্যালবামের পাতাটা আমাদের দিকে এগিয়ে দিলেন।

আমি একেনবাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে একমত। সত্যি দিদিমা চিরদিনই খুব সুন্দরী ছিলেন।

“কি নাম ছিল স্যার আপনার দিদিমার?”

“নয়নতারা।”

“আপনার মা আর সুভদ্রামাসির জেনারেশন অফ ফ্রেন্ডশিপ।”

এটা প্রশ্ন না কমেন্ট বুঝলাম না। “হ্যাঁ, তা ঠিক।”

“সুভদ্রামাসির মা'র নাম কী ছিল স্যার?”

“বোধ হয় নলিনী। বোধ হয় কেন, নলিনীই — এবারই মা-র কাছে শুনেছি।”

“আপনার মায়ের নাম স্যার?”

“সুরমা।”

"বাঃ।"

"তার মানে?"

"নয়নতারা–নলিনী আর সুভদ্রা–সুরমা। বেশ ন–য়ে স–য়ে মিল স্যার।"

"আপনি মশাই সামথিং!" প্রমথ বলল।

"কেন স্যার?"

"কী ফালতু জিনিস নিয়ে টাইম ওয়েস্ট করতে পারেন?"

আমি কপট রাগ দেখিয়ে বললাম, "এই, তুই আমার মা–দিদিমার নাম ফালতু বলছিস কেন?"

"তাই বলছি নাকি! শুধু একেনবাবুর এই ন–ত্ব স–ত্ব–র সমালোচনা করছি।"

এই সব আগরম বাগরম বকতে বকতে আমাদের খাওয়া শেষ হল। খাবার শেষে আমিই জোর করে বিল পেমেন্টে করলাম। একেনবাবু মাথা ঝাঁকিয়ে 'থ্যাঙ্ক ইউ,' 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার' এতবার বললেন যে সবাই নির্ঘাৎ ভাবছিল আমি ওঁকে মিলয়ন ডলার দান করেছি!

এমন সময়ে একটা বিশ্রি ব্যাপার ঘটল। আমরা রাস্তার দিকে বসে ছিলাম। দু' জন টিনএজার এসে আমাদের দিকে তাকিয়ে অসভ্যের মতো আঙুল দেখিয়ে অশ্রাব্য গালিগালাজ শুরু করল। প্রমথ রেগে দাঁড়িয়ে উঠতেই ওদের একজন জানলার কাঁচের উপর মার্কার পেন দিয়ে চার অক্ষরের একটা অশ্লীল শব্দ লিখে দৌড়ে পালাল। সব কিছু ঘটে গেল কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে। ওয়েটারটি তখনও কাছেই ছিল। ওদের এই অসভ্যতা দেখা মাত্র ম্যানেজারকে বলাতে তিনি ছুটে বাইরে গেলেন। ছেলেগুলো ইতিমধ্যে অদৃশ্য হয়েছে। অত্যন্ত বিরক্ত মুখে ফিরে এসে ভদ্রলোক একটা স্কুইজি নিয়ে বাইরে গিয়ে লেখাটা মুছতে লাগলেন।

ওয়েটার বলল, "এটা মাঝেমাঝেই ঘটে, ইদানিং কতগুলো দুষ্টু ছেলের এটাই হচ্ছে খেলা।"

ভদ্রলোক ভেতরে ঢুকতেই ক্যাশিয়ার মেয়েটি বলল, "ও ভাবে তাড়া করতে যেও না, ওদের কাছে ছুরি–টুরি থাকতে পারে।"

ম্যানেজার ভদ্রলোক তখনও রাগে গর্‌গর্‌ করছে। "নেক্সট টাইম গুলি করে ওদের খুলি উঠিয়ে দেব।"

এই সব কমোশনের মধ্যে আমিও উঠে দাঁড়িয়েছি। একেনবাবু দেখলাম চুপ করে বাইরের দিকে তাকিয়ে কী জানি ভাবছেন।

"কি মশাই, উঠবেন?"

"হ্যাঁ স্যার, চলুন।"

"কী ভাবছিলেন এত?"

"পরে বলব স্যার।"

একেনবাবু যদি একবার বলেন পরে বলব — সেটা পরেই বলবেন। ওকে খুঁচিয়ে, বুঝিয়ে, বকে, অপমান করে — কোনোমতেই কিছু আদায় করা যাবে না।

একেনবাবুর মাথায় যখন কিছু চাপে তখন সেটা বের করা দুঃসাধ্য। গত শনিবার গাড়িতে ওঠার সময় ওঁর হাতে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ দেখেছিলাম। ভেবেছিলাম গোটা দুই বই নিয়েছেন পড়ার জন্য। কিন্তু আসলে সেগুলো ছিল রিচার্ডমেসোর জিনিওলজির অ্যালবাম আর নোটবুক! উনি যে এইভাবে অ্যালবাম আর নোটবুক চাইতে পারেন, তা আমি কল্পনা করিনি। হাজার হোক একটা পারিবারিক ইতিহাস, পরলোকগত স্বামীর স্মৃতিচিহ্ন। অবভিয়াসলি এ ব্যাপারে সুভদ্রামাসি সেন্টিমেন্টাল নন, সম্ভবত জিনিওলজির ব্যাপারে ওঁর কোনো ইন্টারেস্টই নেই। রিচার্ডমেসো উৎসাহ ভরে এইসব করতেন — তাতে সুভদ্রামাসির একটা সস্নেহ প্রশ্রয় ছিল — এইটুকুই।

যাইহোক, আজ সকালে থেকে দেখি একেনবাবু নিউ ইয়র্ক টাইমসের বদলে ঐ নোটবুক আর অ্যালবাম নিয়ে মেতে আছেন। আর মাঝে মাঝেই বলে উঠছেন,... "ব্রিলিয়ান্ট, ব্রিলিয়ান্ট!"

কিছুক্ষণ এইরকম চলার পর প্রমথ আর থাকতে না পেরে বলল, "একজনের গুষ্টির খবর জেনে কী রস পাচ্ছেন বলুন তো? তার থেকে ধর্মের বই পড়ুন আত্মিক উন্নতি হবে; আর জ্ঞান বাড়াতে চান তো এনসাইক্লোপেডিয়া ঘাঁটুন।"

— "আপনি না স্যার, সত্যি!" বলে একেনবাবু কিছুক্ষণ চুপ। তারপর বললেন, "এই দেখুন না, কী ইন্টারেস্টিং — রিচার্ড সাহেব বার করেছেন যে সুভদ্রামাসির মায়ের কাছে শুনেছিলেন তাঁর বাবার দিকে কয়েক পুরুষ আগে একজন কেউ ইউরোপিয়ান মেয়ে বিয়ে করেছিলেন। এই তথ্য থেকে রিচার্ড সাহেব বার করেছেন যে সুভদ্রামাসির দাদুর ঠাকুরদা, যিনি দেওয়ান ছিলেন, তিনি বিয়ে করেছিলেন এক ফ্রেঞ্চ মেয়েকে। না, ভুল বললাম স্যার, দাদুর বাবা ছিলেন দেওয়ান। তাঁর বাবা ফ্রেঞ্চ মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। যাইহোক, সেই ভদ্রলোকের নামধাম সব আবিষ্কার করেছেন।"

সুভদ্রামাসির দাদুর বাবা দেওয়ান ছিলেন, না দাদুর ঠাকুরদা দেওয়ান ছিলেন ফ্র্যাঙ্কলি আই কেয়ার লেস। তিনি ফ্রেঞ্চ না জার্মান মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন সেটাও অবান্তর। কিন্তু তাও মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "কী করে করলেন?"

"ডিটেইল অবশ্য পরিষ্কার নয়। তবে এটা বার করতে সাহায্য করেছেন সেই বাবু পিন্টো—যাঁর কথা সুভদ্রামাসি সেদিন বললেন। নাঃ, এঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে হচ্ছে!"

"দেখা করে কী করবেন?" আমি একটু অবাক হয়েই প্রশ্ন করলাম।

"এসব লোকের সঙ্গে একটু আলাপ পরিচয় থাকা ভালো স্যার। কখন কী কাজে লাগে!"

"দেখা করতে গেলে হয়তো ভিসিটের পয়সা লাগবে। খোঁজফোজ করে তারপর যাবেন। নইলে এসে আবার ঘ্যানঘ্যান শুরু করবেন," পত্রিকার পাতা উলটোতে উলটোতে মন্তব্যটুকু করে প্রমথ খেলার পাতায় মন দিল।

প্রমথর এটা বলার কারণ আছে। একেনবাবুর সঙ্গে এক উকিলের আলাপ হয়েছিল একটা পার্টিতে। একেনবাবুর মাথায় সেই সময়ে ইমিগ্রেশন আইন নিয়ে নানান প্রশ্ন ঘুরছে। তার দুয়েকটা করতেই ভদ্রলোক বললেন, 'এই ভিড়ে তো আলোচনা হয় না, আমার অফিসে আসুন।' একেনবাবু তার পরের দিনই গিয়ে প্রশ্নে প্রশ্নে বোঝাই করে অপরিমিত জ্ঞান নিয়ে ফিরেছিলেন। পরে উকিলের কাছে থেকে বিলটা যখন এল, তখন ওঁর মুখের অবস্থা দেখার মতো।

"কথাটা মন্দ বলেননি স্যার" একেনবাবু পা নাচাতে নাচাতে বললেন। "যা ফ্যাসাদে

পড়েছিলাম সেবার!”

“ফ্রেঞ্চ মহিলার নাম কি?” কোনো কারণ নেই, প্রশ্নটা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

“অ্যান্তনিয়েৎ এমিরোজিয়ল্ট,” একেনবাবু উৎসাহিত হয়ে বললেন।...“অ্যান্তনিয়েৎ খুবই চলতি নাম, তাই না স্যার? এমিরোজিয়ল্ট বোধ হয় খুব একটা চলতি পদবী নয়।”

ফ্রেঞ্চ পদবী সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই নেই। জিজেস করলাম, “আপনি সেটা জানলেন কি করে?”

“জানি না স্যার। তবে নোটবুকে মাত্র তিনজন এমিরোজিয়ল্টের কথা লেখা আছে, তাই বললাম। দেখুন না, বলে নোটবুকটা এগিয়ে দিলেন। দেখলাম সেখানে লেখা,

১) দানিয়েল এমিরোজিয়ল্ট; শেফ। x

২) এবউম এমিরোজিয়ল্ট; ওয়াচমেকার। x

৩) ক্যালিস্টো এমিরোজিয়ল্ট।

তবে প্রথম দুটো নামের পাশে লাল কালি দিয়ে দিয়ে ক্রস আঁকা। নামগুলোর ঠিক নীচে লেখা

> (মে ১৪, ১৮৬০ সালের প্যারিস অবসার্ভার থেকে)
> কুখ্যাত আর্ট–চোর ক্যালিস্টো জেলে বসে এখন কবিতা লিখছে। পাঠকদের অজানা নয় ছ’বছর ধরে নানান মিউজিয়াম থেকে বাউশার, ব্রিউঘেল, ক্রানাচের মত বিখ্যাত আর্টিস্টদের ছবি থেকে শুরু করে পুরোনো মূর্তি, হিরে, জহরৎ, যাবতীয় মূল্যবান প্রত্নসামগ্রী চুরি করে এনে ক্যালিস্টো প্রাইভেট মিউজিয়াম গড়ে তুলেছিল। তিনমাস আগে ফরাসী পুলিশের তৎপরতায় ক্যালিস্টো প্রাইভেট মিউজিয়াম গড়ে তুলেছিল। তিনমাস আগে ফরাসী পুলিশের তৎপরতায় ক্যালিস্টো ধরা পড়ে এবং নিজের দোষ স্বীকার করে। সব কিছুই উদ্ধার হয়েছে, শুধু বেলজিয়াম মিউজিয়াম থেকে চুরি করা ‘দ্য লাইট’ নামের বিখ্যাত ডায়মন্ড আর কয়েকটা দামি মনি–মুক্তোর খোঁজ এখনও পাওয়া যায়নি। ক্যালিস্টোর কবিতার বই ছাপানোর জন্য প্রকাশকের খোঁজ করছে তার উকিল ও তার বোন।

পরের লাইনটা ফ্রেঞ্চে, বোধ হয় ক্যালিস্টোর কবিতা থেকে।

“শেষ লাইনের পাঠোদ্ধার হল না স্যার,” একেনবাবু বললেন। “মিস ফ্রান্সিস্কাকে একবার দেখাতে হবে।”

“কী, দেখি?” পত্রিকা ফেলে নোটবুকটা আমার কাছ থেকে প্রায় কেড়ে নিয়ে ভুরুটুরু কুঁচকে প্রমথ পড়ল, “রেখে দিও মোর শূন্য চায়ের পাত্র, ব্রিজের বাঁকে বাঁকে।”

জিজ্ঞেস করলাম, “তুই আবার ফ্রেঞ্চে এত ওস্তাদ হলি কবে?”

“সে খবরে তোর কী দরকার?”

“যা বললি তার কোনো অর্থ হয়?”

“আমি তো শালা লিখিনি।”

প্রমথর সঙ্গে তর্ক করা বেশির ভাগ সময়েই বৃথা।

“আর হ্যাঁ, নীচে লেখা আছে প্যারিস পাব্লিকেশন্স — এটা বুঝতে পারছিস তো? না এরও কোনো অর্থ হয় না?” প্রমথ আরেক বার খোঁচা দিল।

সেটাকে পাত্তা না দিয়ে একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, “আপনার কী মনে হয়,

ক্যালিস্টোর এই বোনকেই কি সুভদ্রামাসির পূর্বপুরুষ বিয়ে করেছিলেন?"

"পসিবল স্যার," অন্য নামদুটোতে লাল কালি দিয়ে ঢ্যাঁড়া দেওয়া হয়েছে। "তবে স্যার আমি একটু কনফিউসড!"

"কিসের জন্য?"

"অ্যান্তনিয়েতের বাবা-মার নাম নেই কেন? মানে চার্চ বা ম্যারেজ রেজিস্ট্রির রেকর্ড থেকে যদি নাম পাওয়া যায়, তাহলে সে নামটা তো পাওয়া যাবে।"

"সেটা জানতেই আপনি ঐ জিনিওলজিস্টের কাছে যাবার প্ল্যান করছিলেন নাকি? এই তিনটে লোকের নাম বললেন, তাদের একজন তো বাবা হতে পারে।"

"হলে স্যার, ক্রস মারা থাকত না।" ভেবেছিলাম জিনিওলজির ব্যাপারটার এইখানেই পরিসমাপ্তি। তা নয়। আমাকে সোমবার লাঞ্চের সময় বললেন, "স্যার, যাবেন নাকি একবার?"

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কোথায়?"

"ঐ যে মিস্টার পিন্টোর কাছে।"

"মিস্টার পিন্টো!"

"আঃ, স্যার, আপনি ভীষণ ভুলে যান, জিনিওলজি স্পেশালিস্ট!"

"সত্যিই যাবেন তার কাছে?"

"স্যার, যদি একটু টিপস ফিপস পাওয়া যায়। আপনাকে কখনো বলিনি স্যার, আমারও এক পূর্বপুরুষ ইউরোপে গিয়েছিলেন — দেশে ফেরেননি। যদি তার খোঁজ জোগার করতে পারি, মন্দ হবে না।"

"কে সেই পূর্বপুরুষ?"

"স্যার, আমার ঠাকুরদার কাকা।"

জানি এগুলো ছুতো। একেনবাবু নতুন কোনো কিছু শুনতে পেলেই সে বিষয় আরও জানতে চান। বাস্তবিকই ওঁর জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবল!

দেখলাম এ ব্যাপারে আমার অপেক্ষায় না থেকে উনি অনেকটাই এগিয়েছেন। অর্থাৎ বাবু পিন্টোর ফোন নম্বর সুভদ্রামাসির কাছ থেকে জোগাড় করেছেন। শুধু তাই নয়, মিস্টার পিন্টোর সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টও করেছেন — দুপুর তিনটে নাগাদ। উনি জানেন যে সোমবার আমার ক্লাস শুধু সকালে। ঐ দিনটাতে বাদবাকি সময় আমি বাড়িতেই থাকি। প্রমথ সোমবার সকালে যায়, ফেরে দেরিতে। একথা প্রমথ জানলে ওঁকে নিয়ে এত হাসিঠাট্টা করত, সেইজন্যেই বেছে বেছে উনি সোমবারই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছেন।

বাবু পিন্টোকে দেখলে দেশি বলে ভুল হবে। নিজেই জানালেন, ওঁর পূর্বপুরুষেরা এককালে ছিলেন মুম্বইয়ে বাসিন্দা। বাবুর ঠাকুরদা স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে নিয়ে ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন ইজরায়েলের জন্মলগ্নে। বাবুর জন্ম, পড়াশুনো সবকিছু ইজরায়েলে। একটু তাড়াতাড়ি কথা বলেন। অ্যাকসেন্টটা এমন যে বুঝতে একটু অসুবিধা হয়। যাই হোক, রির্চাড মেসোকে খুব ভালোই মনে আছে বাবুর।

"খুবই ডিফিকাল্ট কেস," বললেন বাবু। "কারণ ভারতবর্ষে কোথাও ভালো রেকর্ড পাওয়া যায় না। ল্যান্ড রেকর্ড খোঁজা মানে প্রাণান্ত। এদেশের চার্চে বহু রেকর্ড থাকে। হিন্দু মন্দিরে কিছুই থাকে না! খ্রীশ্চান আর ইহুদীরা ফ্যামিলি বাইবেলে পূর্বপুরুষদের পরিচয় লিখে রাখে। হিন্দুদের সেই ট্র্যাডিশন নেই। আসলে এর মূলে আপনাদের 'লাইফ

ইজ এ রিবার্থ কনসেপ্ট।' যদি আবার জন্মাই, তবে এত খবর লিখে রেখে লাভ কী? পার্সোনাল রেকর্ড বাদ দিন, ভারতবর্ষের হিস্টোরিক্যাল রেকর্ডসও হিন্দুরা রাখেনি। এখন যেটুকু হচ্ছে, সবই ওয়েস্টের ইনফ্লুয়েন্সে।"

কথাটা পুরোপুরি যুক্তিযুক্ত নয়। কিন্তু সত্যের একটা ছাপ যে নেই তা অস্বীকার করা যায় না। ভাগ্যিস প্রমথ সঙ্গে ছিল না! নিজে দেশকে উঠতে বসতে গাল দেবে, বাইরের কেউ নিন্দা করলেই তার বাপান্ত করে ছাড়বে। আজ থাকলে বাবুর সঙ্গে মাথা ফাটাফাটি হয়ে যেতো।

একেনবাবু জানতে চাইলেন, সুভদ্রামাসির ইউরোপিয়ান পূর্বপুরুষের কথা।

"ও ইয়েস," বাবু বললেন। "ওটা বেশ ইন্টারেস্টিং। যদ্দুর মনে পড়ছে রিচার্ডের স্ত্রীর গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার মিস্টার গুপ্তা ফ্রান্সে আসেন। হোল্ড অন..." বলে বাবু কম্পিউটারে কি সব সার্চ করতে শুরু করলেন। খানিক বাদে বললেন, "হ্যাঁ, পেয়েছি...সেখানে তিনি একটি ইউরোপিয়ান মেয়েকে বিয়ে করেন এবং ওঁদের একটি বাচ্চাও হয়। মেয়েটি বাচ্চা হবার পর কয়েকদিনের মধ্যেই মারা যায়। ভদ্রলোক তার এক বছর বাদে বাচ্চাকে নিয়ে ইন্ডিয়া ফিরে যান।"

সেই বাচ্চাই হল সুভদ্রামাসির দাদুর বাবা, যিনি দেওয়ান ছিলেন। ভদ্রলোক আর দ্বিতীয়বার বিয়ে করেননি। এগুলো সব নোটবুকের তথ্য। বাবু পিন্টোর এখানে আসার পথে একেনবাবু নানান বকবকানির মধ্যে এটা শুনেছি। তবে এ বিষয়ে আরও কিছু তথ্য বাবুর কম্পিউটারে নিশ্চয় আছে। আমি দূর থেকে কম্পিউটার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছিলাম, গুটি গুটি অজস্র ইনফরমেশনে ভরা। বাবু সেখান থেকে সংক্ষেপে বলছেন।

"এগুলো বার করলেন কোত্থেকে স্যার?" একেনবাবু মুগ্ধ হয়ে প্রশ্ন করলেন।

"ওয়েল," বলে হাসলেন বাবু, "আমার ট্রেড-সিক্রেট আপনাকে বলব কেন?" তারপর বললেন, "জাহাজের প্যাসেঞ্জার লিস্টের রেকর্ড দেখে। হাসপাতালের রেকর্ড দেখে, ম্যারেজ রেজিস্ট্রির রেকর্ড দেখে। এগুলো সহজ উত্তর। কিন্তু সেগুলো জোগাড় করলাম কোত্থেকে — সেটা হবে জটিল উত্তর।"

লোকটা অবশ্যই নিজের ব্যাবসা জানে।

"মহিলা, মানে ওঁর স্ত্রীর ব্যাকগ্রাউন্ড কী স্যার?"

"নট দ্যাট গুড। বাবা কী করত তার সন্ধান আমি পাইনি। অল্প বয়সেই মারা যায়। বড়ো ভাই আর্ট চোর, মিউজিয়াম থেকে বহু দামি দামি জিনিস চুরি করত। শেষে ধরা পড়ে জেলেই মারা যায়।"

"আপনি শিওর?"

"হয় ভাই, নয় মেয়েটার প্রাক্তন স্বামী। তবে প্রাক্তন স্বামী হলে এক্স-ওয়াইফের দ্বিতীয় বিয়েতে সাক্ষী হওয়াটা একটু আনইউজুয়াল তাই না?"

"মানে ম্যারেজ রেজিস্ট্রিটা আপনি দেখেছেন স্যার?"

উত্তরে বাবু পিন্টো মুচকি হাসলেন।

"মহিলাটি কী করতেন?"

"শি ওয়াজ এ মেড। সম্ভবত মিস্টার গুপ্টার বাড়িতেই কাজ করত। মিস্টার গুপ্টা ওয়াজ এ রিচ ম্যান।"

আমি বলে ফেললাম, "আপনার তো মনে হয় আরও অনেক ইনফরমশন আছে এদের সম্পর্কে। স্ক্রিন ভর্তি লেখা।"

"তা আছে, ইনফরমেশন রাখা আমার ব্যবসায়। ইনফরমেশন ইজ মানি।"

প্রকারন্তরে বুঝিয়ে দিলেন — যা বলছি তাই যথেষ্ট ছোকরা!

একেনবাবু ওঁর ঠাকুরদার কাকার কথা তুলতে বাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী নাম ছিল তাঁর?"

"রাধানাথ, রাধানাথ চৌধুরী।"

বাবু পিন্টোর হাত দ্রুত চলে। সঙ্গে সঙ্গে নামটা উনি কম্পিউটারে ঢোকালেন। তারপর বললেন, ওঁর কোম্পানি সাহায্য করতে পারে, কিন্তু সেটাতে যথেষ্ট খরচা আছে। যথেষ্ট খরচা কথাটায় একেনবাবুর মুখের ভাব লক্ষ্য করে, বাবু বললেন, "এগুলোতে সত্যিই খরচা অনেক। আপনি তো ডিরেক্ট ফ্যামিলি ট্রি-র খোঁজ করছেন না, খুব বেশি খরচা করতে হয়তো চাইবেন না। যদি চান, আই উইল বি হ্যাপি টু ডু ইট ফর ইউ।"

ফেরার পথে একেনবাবু বললেন, "বেশ কঠিন কাজ — কাগজপত্র ঘেঁটে খবরগুলো উদ্ধার করা, তাই না স্যার?"

"আপনি বাবুর সব কথা বিশ্বাস করেন, না ভাঁওতা দিয়ে টু-পাইস কামাচ্ছেন?"

"টাইমিংটা স্যার মিলছে। সুভদ্রামাসি আর তাঁর মা নলিনীদেবীর জন্মের তারিখ রিচার্ডসাহেবের ডায়েরিতে আছে ১৯৪৭ আর ১৯২২। মাসিমার দাদুর তিরিশ বছর বয়সে নলিনীদেবী জন্মালে দাদুর জন্ম ১৮৯২ সালে। একই ভাবে হিসাব করলে দাদুর বাবার জন্ম ১৮৬২ সালে। রিচার্ডসাহেবের ডায়েরিতে প্যারিস অবসার্ভারের যে খবরটা আছে, সেটা ১৮৬০ সালের। তখন হয়তো ক্যালিস্টোর বোনের সঙ্গে মাসিমার দাদুর ঠাকুরদার বিয়ে হয়েছিল বা হচ্ছে।"

একেনবাবু যে পিছনে পিছনে এত অঙ্ক কষছেন সেটা বুঝিনি।

"না স্যার, জিনিওলজি বার করার কাজটা মোটেও সহজ নয়," একেনবাবু মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "নো ওয়ান্ডার স্যার আপনাদের রিচার্ডমেসো সুভদ্রামাসির বাবার দিকের কিছু বারই করতে পারেননি।"

"পারেননি?"

"নাঃ, ওঁর বাবার নামের পরে একটা বিরাট গোল্লা লাগিয়ে কোয়েশ্চেন মার্ক দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু মায়ের নামের পরে একেবারে A+ মার্ক। প্রচুর ইনফরমেশন আছে।"

"অধ্যাপক মানুষ, নিজেকেও গ্রেড করেছেন," আমি হেসে বললাম।

"আমার চেষ্টাতেও ঐ গোল্লাই জুটবে, স্যার," একেনবাবু একটু অন্যমনস্ক হয়ে বললেন।

## ।। ১৫ ।।

প্রমথ অনেক রাত্রে বাড়ি ফেরাতে বাবু পিন্টোর কাছে যাওয়ার গল্পটা ওকে আর জানানো হয়নি। পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেও প্রমথকে দেখলাম না। দুপুরে যখন লাঞ্চ খেতে এল, তখন বাবু পিন্টোর গল্প করলাম। ভেবেছিলাম প্রমথ প্রচন্ড খ্যাপাবে। কিন্তু কিছুই বলল না। আসলে একটা এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে ও বড্ড হাবুডুবু খাচ্ছে। লাঞ্চ

খেয়েই আবার ল্যাবে চলে গেল।

লাইব্রেরিতে কতগুলো বই ফেরৎ দিতে হবে, আমি সেগুলো নিয়ে বেরোলাম। রাস্তায় হঠাৎ দেখা রোহিত রয়ের সঙ্গে। প্রথমে চিনতে পারিনি। দূর থেকে দেখি একজন আমার দিকে তাকতে তাকাতে আসছে। আমারও চেনা চেনা লাগছে লোকটাকে। হঠাৎ মুখোমুখি এসে পড়তেই মনে পড়ে গেল — রোহিত, রোহিত রয়। 'হ্যালো' বলে হাত বাড়িয়ে দিতে আমি হ্যান্ডশেক করলাম।

রোহিত কপট গাম্ভীর্য দেখিয়ে বললেন, "আপনাকে নমস্কার করা উচিত ছিল। সরি, আই ফরগট।"

আমি হেসে ফেললাম। "ইউ আর এক্সকিউজড। তারপর কী খবর?"

একথা সেকথা হল। জিজ্ঞেস করলাম, ওঁর গার্ল-ফ্রেন্ড ফিরে গেছেন কিনা।

"অনেকদিন আগে। এর মধ্যে আমি ইংল্যান্ড ঘুরে এলাম। থাইল্যান্ড আর ইন্ডিয়াতেও গিয়েছিলাম কয়েকদিনের জন্য।"

"কী আশ্চর্য! আমরাও ইন্ডিয়াতে গিয়েছিলাম বেশ কিছুদিনের জন্য। তা ইন্ডিয়াতে গেলেন কেন, বেড়াতে না কাজে?"

"বিজনেস এন্ড প্লেসার — দুটোই। ইন্ডিয়া সবসময়েই আমার কাছে প্লেজার।"

"ইন্ডিয়ার কোথায়?"

"একটা শর্ট অ্যাসাইনমেন্ট ছিল দিল্লী, জয়পুর, আর আগ্রায়। পাঁচদিন মাত্র ছিলাম। আপনারা কোথায় ছিলেন?"

"বেশির ভাগ সময়েই কলকাতা। দু'দিনের জন্য শান্তিনিকেতন গিয়েছিলাম।"

"দুটোই চমৎকার জায়গা।"

"আপনি গিয়েছেন?"

"ও ইয়েস। ইন ফ্যাক্ট রিচার্ডের সঙ্গেই গিয়েছিলাম — বহু বছর হয়ে গেল।" তারপর আমার দিকে এক পলক তাকিয়ে রোহিত প্রশ্ন করলেন, "আপনি বল্লভ শাহ- কে চেনেন?"

আমি মনে করতে পারলাম না। "কী সূত্রে চিনতে পারি বলুন তো?"

"এ বিজনেসম্যান ফ্রম গুজরাত?"

"কিসের ব্যবসা?"

"কিসের ব্যবসা নয় — হোটেলের ব্যবসা, ডায়মন্ডের দোকান, অ্যান্টিকের দোকান। আমার ধারণা ছিল এভরিবডি নোজ হিম।"

"নট এভরিবডি," আমি হেসে বললাম।

"জাস্ট কিডিং। ভেরি ইন্টারেস্টিং ম্যান," রোহিত বললেন। "আমরা একই প্লেনে ইন্ডিয়া থেকে ফিরলাম।"

কিন্তু কেন বল্লভ শাহ এত ইন্টারেস্টিং সেটা জানতে পারার আগেই রোহিত আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন, "আপনাদের সঙ্গে বাবুর দেখা হয়েছে শুনলাম?"

"বাবু পিন্টোর কথা বলছেন?"

"হ্যাঁ, আপনি কী করে জানলেন! আপনি তো মনে হচ্ছে একেনবাবুর থেকে অনেক ভালো ডিটেকটিভ!"

রোহিত গম্ভীর ভাবে বললেন, "আই হ্যাভ সোর্সেস।" তারপর হেসে ফেললেন, "না, বাবুই আমাকে বলল। আমার খুব পরিচিত ও। ভালোকথা, এখন যাচ্ছেন কোথায়?"

"পাবলিক লাইব্রেরিতে।"

"আমাকেও ওদিকে যেতে হবে। একটু ওয়েট করতে পারবেন? এই সামনে আমার অ্যাপার্টমেন্ট, সেলফোনটা ফেলে এসেছি।"

"শিওর।"

"তাহলে আসুন," বলে আমাকে নিয়ে যেখানে ঢুকলেন সেখানে আমি আগে এসেছি। বাবু পিন্টোর অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স।

"আপনিও এখানে থাকেন?"

"নাউ ইউ গেট দ্য কানেকশন!" রোহিত চাবি দিয়ে মেইলবক্স থেকে চিঠিপত্র বার করতে করতে বললেন। চিঠিগুলো বগলে চেপে ধরে দেখি আরেকটা মেইলবক্স খুলছেন। আমার দিকে তাকিয়ে চোখটা একটু টিপে বলল, "আরেক জনের মেইল চুরি করছি।"

"চুরি তো লুকিয়ে লুকিয়ে করতে হয় বলে জানতাম।"

"ট্রু।" রবার ব্যান্ড আটকানো চিঠির গুচ্ছ দেখিয়ে বলল, "এগুলো বাবুর। কাল বাইরে গেছে কয়েকদিনের জন্য, তাই ওর চিঠি তোলার দায়িত্ব এখন আমার।"

"আর আপনি না থাকলে উনি আপনার মেইল তোলেন?"

"রাইট। সুতরাং ওকেই খাটতে হয় বেশি।"

"আই ক্যান ইম্যাজিন," আমি বললাম। "কিন্তু আগে থেকে জানিয়ে দিলে পোস্ট অফিসও তো ডেলিভারি না করে পিক-আপের জন্য জমা রাখে।"

"তা রাখে, কিন্তু এক মাসের বেশী নয়। আর আমি মাঝে মাঝেই পাঁচ- ছ সপ্তাহের জন্য হাওয়া হই। বাবুও অনেক সময় দু'মাস ইজরায়েলে গিয়ে বসে থাকে।"

"যখন দুজনেই বাইরে থাকেন তখন কি করেন?"

"এই কমপ্লেক্সেই এক বুড়ি মহিলা আছেন, তাঁকে ধরি। কিন্তু তিনি বড্ড উলটোপালটা করেন। চিঠি তোলেন ঠিকই, কিন্তু গুছিয়ে কোথায় রেখেছেন সবসময়ে মনে করতে পারেন না। একবার যা সমস্যায় পড়েছিলাম!... এক মিনিট, চিঠিগুলো অ্যাপার্টমেন্টে রেখে আসি," বলে রোহিত উপরে গেলেন।

একটু বাদেই নেমে এলেন। তারপর গল্প করতে করতে আমরা বাস-স্ট্যান্ডের দিকে রওনা হলাম। কথায় কথায় সুভদ্রামাসির মা'র ছবিটার কথা উঠল।

"কেমন হয়েছে ছবিটা?" রোহিত জানতে চাইলেন।

"চমৎকার। আমার মা-কেও এক কপি দিয়েছি, তিনি তো মুগ্ধ! প্রচুর সময় লেগেছে নিশ্চয় ওটাকে ঠিকঠাক করতে?"

"তা কিছুটা লেগেছে। তবে আমার একটা চমৎকার সফটওয়্যার আছে, আর সেই সঙ্গে একজন কম্পিটেন্ট হেল্পার।"

"আমিও দেশ থেকে একটা ছবি এনেছি। একজনকে দিলাম ডিজিটালি এনহ্যান্স করার জন্য। বলতে কি, আমার ধারণাই ছিল না, পুরোনো ছবি থেকে এত ভালো ছবি তৈরি করা যায়।"

"ওয়েল, ইট ইজ নেভার অ্যাকিউরেট। কিন্তু কে সেটা বুঝতে পারছে! যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, সেটা হল সুভদ্রা-র ছবি পছন্দ হয়েছে, আর ভালো লাগছে আপনার মা-ও খুশি হয়েছেন দেখে। তবে ইন্টারেস্টিংলি ওই ছবি নিয়ে একজনের কাছ থেকে দুটো ক্রেজি ই-মেইল পেয়েছি।"

"তাই নাকি?"

"ও ইয়েস। ছবিটা আমার ওয়েবসাইটে আছে, সেটা দেখেই পাঠিয়েছে।"

"ক্রেজি মানে?"

উত্তর শোনা হল না। হঠাৎ রোহিতের মোবাইল বেজে উঠল। রোহিত, 'এক্সকিউজ মি,' বলে ফোন ধরলেন। তারপর 'হ্যালো, ইয়েস,' বলে দুয়েকটা কথা বলার পর ফোন পকেটে পুরে বললেন, "আই অ্যাম সরি। একটা জরুরি কাজ এসে পড়েছে, আমাকে এখুনি ট্রাইবেকায় যেতে হবে।" বলেই হাত দেখিয়ে একটা চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে, "সি ইউ সুন, " বলে আমাকে খানিকটা হতবাক করেই তাতে উঠে পড়লেন।

পাবলিক লাইব্রেরীতে আমার জন্য আরেকটা সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছিল। বই ফেরত দিয়ে বেরোতেই দেখি একেনবাবুও বেরোচ্ছেন!

"আপনি এখানে কি করছিলেন?"

"এই কিছু পুরোনো পত্রিকা দেখছিলাম স্যার।"

"হঠাৎ?"

"এমনি স্যার।"

"না, এমনি তো আপনি কিছু করেন না। সব সময়েই কিছু না কিছু আপনার মাথায় ঘুরছে।"

"কি মুশকিল স্যার, আমিও তো রিসার্চ করি। আপনার মতো কঠিন অঙ্ক বা প্রমথবাবুর মতো বিদঘুটে কেমিক্যাল রিয়্যাকশন নিয়ে না হলেও।"

"আপনার সাহস তো কম নয় — প্রমথর রিসার্চকে বিদঘুটে বলছেন!"

"ওটা স্যার কমপ্লিমেন্ট — বিদঘুটে জিনিসকে সরল করে বোঝানোই তো পন্ডিতদের কাজ।"

"বেশ বেশ। যা খুঁজছিলেন, তার কিছু পেলেন?"

"কে জানে স্যার। তা আপনি এখানে কি করতে?"

"বই ফেরত দিতে এসেছিলাম।"

"আর কিছু না থাকলে চলুন স্যার, একটু কফি খাওয়া যাক।"

"আপনি খাওয়াবেন?"

কথাটা শুনে মনে হল একেনবাবু একটু দমে গেলেন।

"আপনাকে খ্যাপাচ্ছিলাম," আমি বললাম, "ডাচ ট্রিট।"

একেনবাবু মানলেন না। "কী যে বলেন স্যার, আপনাকে একটু কফি খাওয়াতে পারব না!"

আমরা হাঁটতে হাঁটতে একটা কফিশপ-এ ঢুকলাম। কফি অর্ডার করে একেনবাবুকে রোহিত রয়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার গল্প বললাম। একেনবাবু আবার গল্প খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শোনেন। প্রশ্ন করলেন, "ক্রেজি ইমেইল বলতে উনি কি মিন করলেন স্যার?"

"আমার কোনো ধারণাই নেই। জানার আগেই একটা ফোন আসায় ওঁকে চলে যেতে হল।"

"ভেরি ইন্টারেস্টিং স্যার।"

"আচ্ছা আপনার কি মনে হয় ঐ মূর্তি নিয়ে কেউ কিছু লিখেছে?"

"কোন মূর্তি স্যার?"

"যেটা ছবিতে ছিল, গোল্ড-সিলভারের নারী- মূর্তি।"

একেনবাবু মাথার পেছনটা চুলকোতে চুলকোতে প্রশ্ন করলেন, "কী লিখতে পারে?"

"তা কী করে বলব। কিন্তু মূর্তিটা পুরোনো। তার একটা হিস্ট্রি থাকতে পারে।" বলতে বলতেই একটা চিন্তা ঝিলিক দিল। "আপনি কি মনে করেন মূর্তিটা কোনো মিউজিয়াম থেকে ওই ক্যালিপ্সো না কার নাম বলছিলেন — সে চুরি করেছিল?"

"ক্যালিস্টো এমিরোজিয়ল্ট, আর্ট-চোর?"

"এক্স্যাক্টলি, তার বোনই তো সুভদ্রামাসির পূর্বপুরুষকে বিয়ে করেছিল।"

"আপনি আমার ভাত মারবেন স্যার, কিন্তু ভেরি ইন্টারেস্টিং পসিবিলিটি।"

"আজকে সুভদ্রামাসিকে ফোন করে একটু খোঁজ নেব। রোহিত রয়ের কাছেও জানতে হবে, ঠিক কী ছিল ওই ই-মেইলে।"

"গুড আইডিয়া স্যার। ভালোকথা, ক্যালিস্টোর কথা তুললেন — আজকে একটা ইন্টারেস্টিং ম্যাগাজিন পড়ছিলাম। যে সব দামি দামি জিনিসের খোঁজ আর পাওয়া যাচ্ছে না, তাদের হিস্ট্রি। একেবারে ফ্যাসিনেটিং স্যার। সেইখানে 'দ্য লাইট'-এর কথাও ছিল।"

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, "দ্য লাইট?"

"দ্য লাইট ডায়মন্ড স্যার। মনে নেই রিচার্ড সাহবের নোটবইটাতে ছিল?"

এবার আমার মনে পড়ল। "ও হ্যাঁ, নিশ্চয় মনে আছে। আপনিই তো সেদিন বলছিলেন।"

"দ্য লাইট- এর ছবিও ছিল। এইটুকু হিরে, কিন্তু এস্টিমেটেড প্রাইস এখন দু-মিলিয়ন ডলার, মানে প্রায় ন'কোটি টাকা! অকল্পনীয় স্যার।"

"দু'শো ডলার হলেও আমি কিনতাম না। লোকে কেন যে এত ফ্যাসিনেটেড হয়, আমার কোনো ধারণাই নেই।"

"আমিও একমত স্যার। তবে যে কথা বলতে যাচ্ছিলাম, মারা যাবার কয়েকদিন আগে নাকি ক্যালিস্টো এক জেলরক্ষীকে বলেছিল, ডায়মন্ডটা কোথায় আছে — বুদ্ধি থাকলে যে কেউ বুঝতে পারবে। জেলরক্ষী সেটা শুনে জেলারকে জানায়।

জেলার এসে ক্যালিস্টোকে প্রশ্ন করলে তার উত্তরে নাকি ক্যালিস্টো শুধু বলে, 'দ্য অ্যানসার ইস ইন দ্য টাইটল।'"

"তার মানেটা কী?"

"আই হ্যাভ নো ক্লু স্যার।"

"একটা মানে আমি বুঝতে পারছি।"

"কী স্যার?"

"যেহেতু এখনও ওটা পাওয়া যায়নি, সুতরাং আমরা সবাই বুদ্ধু!"

"এটা ভালো বলেছেন স্যার।"

ওয়েট্রেস ইতিমধ্যে এসে আমাদের কফি দিয়ে গেল। কফির ব্যাপারে আমি একটু খুঁতখুঁতে, কিন্তু দেখলাম, কফি ভালোই করেছে। আমাদের সামনে একটা টিভি।

সেখানে ভারত আর চীনের শিল্পায়ন নিয়ে বিরাট আলোচনা চলছে।

একেনবাবু বললেন, "যাই বলুন স্যার, আমরা এখনও অনেক পিছিয়ে। এই ধরুন সাধারণ ফোন, সেগুলো পর্যন্ত ঠিকমত কাজ করে না। বাড়ির ফোনের কথা ছেড়ে দিন, বোলপুরের পুলিশ অফিসের ফোনই কাজ করছে না!"

"আপনি ফোন করার চেষ্টা করেছিলেন নাকি?"

"হ্যাঁ স্যার। না পেয়ে, শেষে মোবাইলে ধরতে হল।"

"তাহলে? মোবাইল টেকনোলজি তো পৌঁছেছে এবং কাজও করছে!"

"তা করছে। কিন্তু স্যার টেকনোলজিতো আমাদের নয়, সায়েবদের।"

"এক এক যুগে এক এক জাতি ওপরে ওঠে।"

"ওসব মন ভোলানো কথা স্যার। আমরা চিরদিনই পিছিয়ে।"

"কী বলছেন! হিন্দুরা এক সময়ে বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প — সব কিছুতেই পৃথিবীকে

পথ দেখিয়েছে। এই শূন্য-র কনসেপ্ট — সেটাতো হিন্দুদেরই সৃষ্টি।"

"এটা দারুন বলেছেন স্যার," কথাটা একেনবাবুর মনে ধরল। বেশ কিছুক্ষণ তারিয়ে তারিয়ে কফি খেলেন। তারপর বললেন, "সত্যি স্যার, এমন চমৎকার সব কথা বলেন না আপনি। ঠিক সেইজন্যেই ইংরেজি অ্যালফাবেটের 'ও' আর শূন্য এক, কিন্তু আমাদের অক্ষরগুলো দেখুন — শূন্যের সঙ্গে অন্য কোনো অক্ষরের মিল পাবেন না।"

এই থিওরি আগে আমি শুনিনি। কিন্তু একেনবাবু আমার কথাটা মেনেছেন দেখে তৃপ্তি পেলাম।

## ।। ১৬ ।।

বাড়ি ফিরে দেখি প্রমথ আড্ডা মারছে ফ্রান্সিস্কার সঙ্গে। প্রমথর মুখটা হাসিখুশি দেখে বুঝলাম এক্সপেরিমেন্টের ঝামেলা মোটামুটি মিটেছে। আমাদের ঢুকতে দেখে ফ্রান্সিস্কা বলল, "কফি খাবে?"

আমি বললাম, "একেনবাবু একটু আগে খাওয়ালেন।"

প্রমথ বলল, " তার মানে?"

"মানে আবার কি, আমরা কফি খেয়ে এসেছি।"

"সেটা তো বুঝতে পারছি, কিন্তু একেনবাবু খাওয়ালেন মানে কি?" তারপর একেনবাবুর দিকে চোখ পাকিয়ে বলল, "লুকিয়ে লুকিয়ে একজনকে কফি খাইয়ে পয়সা বাঁচানোর মানেটা কি? আমাকে না হয় নাই খাওয়ালেন — বেচারা ফ্রান্সিস্কা কি দোষ করল!"

একেনবাবু বললেন, "আপনারা ছিলেন না, আমি কি করব স্যার? আপনি কঠিন কঠিন এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে পড়ে থাকেন!"

"আপনার সব সময়েই একটা অজুহাত আছে। তা দুজনের যাওয়া হয়েছিল কোথায়?"

"লাইব্রেরিতে," আমি উত্তর দিলাম। তারপর বললাম, "গেস — কার সঙ্গে পথে দেখা?"

"অ্যালবার্ট আইনস্টাইন।"

"চ্যাংড়ামো করিস না!" আমি বললাম, "রোহিত রয়।"

"রোহিত রয় কে?" ফ্রান্সিস্কা জিজ্ঞেস করল।

"তুমি চিনবে না, সুভদ্রামাসির খুব পরিচিত এক ফোটো-জার্নালিস্ট," প্রমথ বলল। "আমি কিন্তু ইমপ্রেসড, তুই একজনকে একবার মাত্র দেখে আবার চিনতে পেরেছিস! কেমন আছে সে?"

"ভালোই তো মনে হল। তবে একটা কথা বললেন সুভদ্রামাসির দেওয়া ছবিটা সম্পর্কে — শুনে বেশ খটকা লেগে গেছে।"

প্রমথর চোখে প্রশ্ন।

আমি বললাম, "কে জানি ওঁকে দুটো ক্রেজি ইমেইল পাঠিয়েছে ঐ ছবিটা নিয়ে।"

"দাঁড়া দাঁড়া, একটু বুঝতে দে। কোন ছবির কথা বলছিস — তোর দিদিমা আর

সুভদ্রামাসির মায়ের ছবি?”

“এক্স্যাক্টলি।”

“যে ই-মেইল পাঠিয়েছে — সে ছবি দেখল কোত্থেকে?”

“রোহিত রয়ের পার্সোনাল ওয়েবসাইটে ছিল — তাইতো উনি বললেন যদ্দুর মনে পড়ছে।”

“তারপর?”

“রোহিত অবশ্য পরিষ্কার করে বলেননি ঠিক কী লেখা ছিল ই-মেইলে। কিন্তু খুব সম্ভবত সুভদ্রামাসির সোনা-রূপো মেশানো মূর্তি সম্পর্কে কিছু সেখানে ছিল।”

“হঠাৎ এই কনক্লুশনের কারণ?”

“আমার কেমন জানি মনে হচ্ছে, কেউ সেটাকে আইডেন্টিফাই করতে পেরেছে মিউজিয়াম থেকে চুরি যাওয়া জিনিস বলে।”

“তুই গাঁজা-ফাজা খাচ্ছিস নাকি — কী যা-তা বকছিস! রোহিত কি বলেছেন ঐ মূর্তি সম্পর্কে কেউ লিখেছে?”

“না।”

“তাহলে?”

“কিন্তু তাছাড়া আর কি হতে পারে? মূর্তিটা ছবিতেও স্টানিং।”

“মানছি, কিন্তু তার সঙ্গে মিউজিয়াম থেকে চুরি যাওয়ার সম্পর্ক কি?”

“সুভদ্রামাসির এক পূর্বপুরুষ কুখ্যাত আর্ট-চোরের বোনকে বিয়ে করেনি!”

“তুই তোর মাথা ডাক্তারকে দেখা আর একেনবাবুর সঙ্গ কমা। কি মশাই, আপনারও এই মত নাকি?”

“কোনো সম্ভবনা কি স্যার বাদ দেওয়া যায়?”

“এটা যায়।” প্রমথ গম্ভীরভাবে বলল।

সুভদ্রামাসির জিনিওলজি নিয়ে আমাদের যে-সব কথা হয়েছে — তার কিছুই ফ্রান্সিস্কা জানত না। আমাদের কাছে সব কিছু শুনে বলল, “গ্রেট স্টোরি, কিন্তু মা বলেছে ওটা নেপালের এক রাণার কাছ থেকে মায়ের দাদুর বাবা কিনেছিলেন। ওটা চুরির হবে কেন?”

“ব্যাপার বুঝছ না,” প্রমথ বলল, “বাপি যেই শুনছে, তুমি মূর্তিটা পাচ্ছো, হাজার রকম ফ্যাঁকড়া তুলছে।”

“তুমি শিওর, সুভদ্রামাসি তাই বলেছেন?” আমি ফ্রান্সিস্কাকে প্রশ্ন করলাম।

“নিশ্চয়। আর মূর্তিটার মুখ তোমরা দেখনি? টিপিক্যাল ভারতীয় মুখ — কানে ইয়াররিং, শাড়ি পরা।”

ফ্রান্সিস্কা কথাগুলো যখন বলছে, আমি বুকশেলফ থেকে অ্যালবাম খুলে দিদিমা আর সুভদ্রামাসির মা'র ছবিটা দেখছি। কথাটা ঠিক, ওই মূর্তিটা কাঠের বাক্সের উপর শোয়ানো থাকলেও শাড়ির ভাঁজগুলো সুন্দরভাবে ফুটে আছে। একটু ভালোভাবে দেখলে কানের দুলও চোখে পড়ে। আশ্চর্য, মনে মনে ভাবলাম, অতবার মূর্তিটা সুভদ্রামাসির বাড়িতে দেখেছি, কিন্তু শাড়ি খেয়াল করিনি! শাড়ি গয়নার দিকে মেয়েদের দারুণ চোখ, দেশি বিদেশিনী সবার!

বাধ্য হয়ে স্বীকার করলাম, “দেয়ার গোজ মাই থিওরি! কিন্তু এছাড়া কী নিয়ে ক্রেজি ই-মেইল আসতে পারে বলো?”

“মিস্টার রয়কে ফোন করে জিজ্ঞেস করুন না স্যার, কী বলতে চেয়েছিলেন উনি।

তাহলেই তো সন্দেহ মিটে যায়।”

এবার আমার সত্যিই লজ্জা লাগল। কেন যে এই অদ্ভুত চিন্তাগুলো মাথায় এসেছিল! মূর্তি প্রসঙ্গে সেইখানেই ইতি।

পরদিন দুপুরবেলা আমার ক্লাস ছিল। পড়িয়ে নিজের অফিসে ঢুকে সবে চেয়ারে বসেছি, ফোন বেজে উঠল। একেনবাবু।

“স্যার একটা ট্রাজেডি হয়েছে।”

“কী ট্রাজেডি?”

“একটু আগে মাসিমার ফোন পেলাম।”

“কী হয়েছে সুভদ্রামাসির?”

“না, না, মাসিমার কিছু হয়নি। মিস্টার রোহিত রয় মারা গেছেন।”

“মারা গেছেন!”

“কথা শুনে মনে হল মার্ডারড।”

“মার্ডারড! সুভদ্রামাসি কোথায়?”

“উনি মিস সুজাতাকে নিয়ে মিস্টার রয়ের অ্যাপার্টমেন্টে আসার প্ল্যান করেছিলেন। আমি কোনোমতে নিরস্ত করেছি। বলেছি সব খোঁজখবর নিয়ে ওঁকে জানব। আমি এখনি যাচ্ছি ওখানে। আপনার ক্লাস শেষ?”

“হ্যাঁ শেষ, আমিও কি আসবে?”

“জানি না গিয়ে কি করবেন স্যার। ওখানে হয়তো বাইরের লোকদের ঢুকতেও দেবে না।”

কথাটা ভুল বলেননি একেনবাবু। উনি ঢুকবেন ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের কানেকশনে। আমাকে ওখানে যেতে দেবে কেন? রোহিতের আত্মীয় বা বিশেষ বন্ধু হলে খবর পেয়ে ওখানে যাওয়া এক কথা। জীবনে দুবার মাত্র দেখা হয়েছে রোহিতের সঙ্গে। সুভদ্রামাসি এলে, তাঁর সঙ্গ দেবার জন্য যাওয়ার একটা অর্থ হত।

“প্রমথ জানে?”

“ওঁকে পাইনি, একটা মেসেজ রেখেছি। আমি ঘন্টা কয়েকের মধ্যেই ফিরে আসব।”

আমি সুভদ্রামাসিকে ফোন করলাম। উনি একেবারে ডিভাস্টেটেড। স্বাভাবিক। ধরাধরা গলায় এলোমেলোভাবে যা বললেন:—

রোহিতের আসার কথা ছিল সকালে। আসছেন না দেখে সুভদ্রামাসি রোহিতকে ফোনে ধরার চেষ্টা করেন। কিন্তু বাড়ির ফোন বা মোবাইল কোনোটাতেই উত্তর নেই। রোহিত এরকম কখনো করে না। তাই সুভদ্রামাসি ওঁর পুরোনো এক বন্ধু এঞ্জেলিকাকে ফোন করেন। ভদ্রমহিলাও সুভদ্রামাসির মতো বাতের রুগি। হাঁটাচলা করতে হয় খুব কষ্ট করে। তবে উনি রোহিতের অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে একই তলায় থাকেন। এঞ্জেলিকা অবশ্য সুভদ্রামাসিকে আশ্বস্ত করেন এই বলে যে তিনি নিউজে শুনেছেন আজ সকাল আটটা থেকেই লিঙ্ক টানেল আর জর্জ ওয়াশিংটন ব্রিজে বিরাট জ্যাম। দু’টো বড়ো অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। তাই হয়তো দেরি হচ্ছে।

আধঘন্টা বাদে সুভদ্রামাসি যখন আবার ফোন করেন, তখন উনি ইন্টারকম-এ সিকিউরিটির লোকদের জিজ্ঞেস করেন রোহিতকে বাইরে যেতে দেখেছে কিনা। দেখেনি শুনে রোহিতের অ্যাপার্টমেন্টে যান। লক্ষ্য করেন বাইরের দরজাটা একটু ফাঁক হয়ে আছে। ভিতরে উঁকি দিতেই নজরে পড়ে রোহিত সোফায় এলিয়ে পড়ে আছেন, চারিদিকে

রক্ত। সঙ্গে সঙ্গে সিকিউরিটিকে ডাকেন। তারাই পুলিশে খবর দেয়। এইসবের মধ্যে এঞ্জেলিকা ভুলেই গিয়েছিলেন সুভদ্রামাসিকে ঘটনাটা জানাতে। পরে খেয়াল হয়। প্রায় একঘন্টা বাদে সুভদ্রামাসিকে ফোন করেন। সঙ্গে সঙ্গেই সুভদ্রামাসি আমাদের বাড়িতে ফোন করে একেনবাবুকে জানান।

যাইহোক, রোহিতের অ্যাপার্টমেন্টে একেনবাবু গেছেন, আমি জানালাম। "আমাকে তো ঢুকতে দেবে না, তাই যাইনি। একেনবাবু ফিরে এলেই তোমাকে ফোন করব।"

"তাই কোরো।" তারপর একটু থেমে সুভদ্রামাসি বললেন, "তোমরাও সাবধানে থেকো। বাইরের দরজা-টরজা সব সময়ে লক করে রেখো। নিউ ইয়র্ক দিন-কে-দিন যা খারাপ হচ্ছে।"

"তুমি চিন্তা কোরো না, আমরা সাবধানে থাকব।"

ঘন্টা তিনেক বাদে একেনবাবু এলেন।

"বাড়িতে ফোন করে কাউকে পেলাম না স্যার, তাই ধরে নিলাম আপনি অফিসেই আছেন।"

"ভালো করেছেন এসে, আমি চিন্তায় চিন্তায় মরছি।"

"প্রমথবাবুকে ধরতে পেরেছেন?"

"নাঃ, কোথায় ডুব মেরেছে কে জানে! ফ্রান্সিস্কাকেও পেলাম না। দুজনে হয়তো কোথাও গেছে।"

"আপনার কি আর কোনো কাজ আছে?"

"আছে, কিন্তু জরুরি নয়।"

"তাহলে স্যার বাড়িতেই চলুন। যেতে যেতে আপনাকে বলি যতটুকু বুঝতে পারছি।"

## ।। ১৭ ।।

রাস্তায় বেড়িয়ে একেনবাবু বললেন, তা হল —

সামনাসামনি অল্প দূরত্ব থেকে রোহিত রয়ের কপালে গুলি করা হয়েছে। তবে কখন তা এখনো জানা যায়নি। অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে অনেক কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে। সেই আওয়াজে গুলির শব্দ শুনতে পাওয়াও কঠিন। বন্দুক বা হ্যান্ডগান পুলিশ খুঁজে পায়নি। সুতরাং নিঃসন্দেহে এটা হোমিসাইড বা খুন। যেখানে দেহ পাওয়া গেছে,

সেখানেই হত্যাকান্ড ঘটেছে। রক্ত ছাড়া সোফার কুশনে, রোহিতের সার্ট-প্যান্টে এবং কার্পেটে কফির দাগ। একটা কফির কাপ নীচে কার্পেটে কাত হয়ে আছে। উলটোদিকের সোফায় পাশে সাইড টেবিলে কফি ভরতি একটা কাপ পাওয়া গেছে। একটা সম্ভাব্য থিওরি হল, রোহিত যখন কারুর সঙ্গে সোফায় বসে কফি খাচ্ছিলেন তখন হঠাৎ ওঁকে গুলি করা হয়। খুনি সম্ভবত রোহিত রয়ের পরিচিত। নইলে সকালে এসে রোহিতের সঙ্গে কফি খাওয়ার প্রশ্ন উঠত না। প্রিলিমিনারি টেস্ট-এ দুটো কাপেই রোহিতের ফিঙ্গার প্রিন্ট ছাড়া আর কোনো ফিঙ্গার প্রিন্ট নেই। রোহিতই কফি বানিয়ে অভ্যাগতকে দিয়েছিলেন। খুনি মারবে বলে প্রস্তুত হয়েই এসেছিল, কাপ সে ছোঁয়েওনি। মনে হয় রোহিত যখন

চুমুক দিতে কাপ মুখে তুলেছেন, তখনই খুনি হ্যান্ডগান বের করে গুলি চালিয়েছে। এগুলো সবই স্পেকুলেশন।

বাড়িতে জিনিসপত্র কেউ ঘাঁটাঘাঁটি করেছে বলে মনে হয় না। রোহিত কাজের সূত্রে নানান জায়গায় ঘুরতেন। সে-সব জায়গা থেকে নতুন পুরোনো বহু জিনিসই সংগ্রহ করে এনেছেন। সেই সংগ্রহের মূল্য খুব একটা কম নয়। তার থেকে কিছু খোয়া গেছে কিনা বলা শক্ত। আরেকটা কথা, রোহিত বোধ হয় কোথাও যাবার প্ল্যান করছিলেন। কারণ ওঁর স্যুটকেসে বেশ কিছু জিনিস ঢোকানো এবং কিছু ধোয়া জামাকাপড় স্যুটকেসের পাশে রাখা, যেগুলো ঢোকানোর সময় পাননি। পুলিশ খোঁজ নিচ্ছে কোথায় ওঁর যাওয়ার কথা ছিল।

সকালে হাওয়ার্ড লংফেলো বলে একজন লোক রোহিতের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁর সন্ধান পুলিশ পেয়েছে। এখানেই জিনিসটা একটু গোলমেলে। হাওয়ার্ড পুলিশকে ফোন করেছিলেন রোহিতের মৃত্যুর কথা জানিয়ে। কিন্তু সেটা সিকিউরিটি ফোন করার প্রায় আধঘন্টা পরে, অর্থাৎ প্রায় সাড়ে এগারোটা নাগাদ। সিকিউরিটির লগ অনুসারে হাওয়ার্ড রোহিতের অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকেছিলেন সকাল ন'টা বেজে পাঁচ মিনিট নাগাদ। তার কিছুক্ষণ পরেই তিনি বেরিয়ে যান। ঠিক কখন, সিকিউরিটি লগবুকে লেখেনি। সিকিউরিটি ডেস্কে যে দুজন ছিল, তাদের একজন এক নতুন ভিসিটারকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল। আর দ্বিতীয়জন ঐ অ্যাপার্টমেন্টেরই এক ভাড়াটের সঙ্গে তর্কাতর্কি করছিল। ফলে হাওয়ার্ড কখন গেলেন আর লেখা হয়নি। তবে পুলিশ যেটুকু জানতে পেরেছে — তা হল ন'টা-দশ থেকে ন'টা-পনেরোর মধ্যেই হাওয়ার্ড বেরিয়েছে। তর্কাতর্কি শুরু হবার একেবারে প্রথম দিকে। আরেকটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট, হাওয়ার্ড খুব ব্যস্তসমস্ত হয়ে বেরিয়ে যান। তর্কাতর্কির মাঝেও সিকিউরিটির দু'জনেই সেটা খেয়াল করেছে। তাহলে এতক্ষণ বাদে তিনি ফোন করলেন কেন?

আরেকটা কথা, রোহিতের অ্যাপার্টমেন্টে সিকিউরিটির ব্যবস্থা একটু ঢিলে ঢালা। চেনা মুখ হলে সিকিউরিটির লোকেরা অনেক সময়ে ভাড়াটদের ইন্টারকমে যোগাযোগ করে পারমিশন নেয় না, নামও লিখে রাখে না। সুতরাং আর কেউ সকালে রোহিতের কাছে এসেছিল কিনা, সঠিক জানার কোনো উপায় নেই।

নিউ ইয়র্ক পুলিশ দ্রুতগতিতে কাজ করে। এরমধ্যেই হাওয়ার্ডকে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। হাওয়ার্ড যা বলেছেন তার সঙ্গে সিকিউরিটির লোকদের কথায় খুব একটা অমিল নেই। হ্যাঁ, তিনি ন'টা পাঁচ নাগাদই রোহিত রয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। কিন্তু অ্যাপার্টমেন্টে এসে দেখেন রোহিত মরে পড়ে আছেন। অবভিয়াসলি হি প্যানিকড। সঙ্গে সঙ্গে নীচে যান সিকিউরিটির লোকদের বলতে। এলিভেটর থেকে নেমে যখন প্যাসেজ দিয়ে হাঁটছেন, তখন জানলা দিয়ে দেখেন ওঁর গাড়ি পুলিশ টো-ট্রাকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। একবার গাড়ি চলে গেলে ছাড়াতে দু-তিনশোর ডলারের ধাক্কা! পড়ি-কি-মরি করে পুলিশের কাছে ছুটে যেতে গিয়ে রাস্তায় পা মচকে পড়ে যান। সেখানে একটা ভাঙ্গা কাচের বোতল ছিল — তাতে ভীষণভাবে পা কেটে যায়। একটু আগে একটা মার্ডারড লোককে দেখে তারপরে নিজের এই রক্তাক্ত অবস্থা — হি ওয়াজ ইন টোটাল শক, বাস্তববুদ্ধি লোপ পেয়েছিল। প্রায় সেন্সলেস হয়ে ওঁকে পড়ে থাকতে দেখে, পথচারীদের একজন অ্যাম্বুলেন্সে খবর দেয়। এমার্জেন্সি রুমে বেশ কয়েকঘন্টা কাটিয়ে ফার্স্ট এইড, স্টিচ, এক্স-রে, ইত্যাদি হয়ে যাবার পর ওঁর খেয়াল হয় — পুলিশকে ফোন করা হয়নি! তখনই পকেট থেকে মোবাইল বার করে পুলিশকে ফোন করেন।

এতটা শোনার পর আমি একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, "এটা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা বলে আপনার মনে হয়?"

"হু নোজ স্যার। তবে একটা কথা ঠিক, ওঁর গাড়িটা ন'টা দশ মিনিট নাগাদ পুলিশ টো করে নিয়ে গিয়েছে পার্কিং ভায়লেশনের জন্য। আর এ-ও ঠিক যে এমার্জেন্সি রুমে কাচে কাটা পা নিয়ে উনি এসেছিলেন।"

হয়তো হাওয়ার্ড লোকটা সত্যি কথাই বলছে। কিন্তু তবু আমার মনে হল, ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। আমি বললাম, "গাড়ি টো করার ব্যাপারটা আর পায়ে কাচ ঢোকা সত্যি। কিন্তু তার থেকে কি প্রমাণ হয় হাওয়ার্ড নির্দোষ?"

"তা হয় না স্যার। তবে খুনের জন্য একটা মোটিভ দরকার। সেদিকটাও ভাবতে হবে।"

"তা ঠিক। লোকটা কী করে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"স্ট্যামফোর্ডে ওঁর হ্যান্ডিক্র্যাফট- এর একটা দোকান আছে।"

"রোহিতের কাছে কেন এসেছিল?"

"ওঁর বয়ান অনুসারে, হাতে বোনা থাইসিল্কের তৈরি স্পেশাল হ্যান্ডিক্র্যাফট কাভারিং-এর ডেলিভারি নিতে। মিস্টার রয় আগেও ব্যাঙ্কক থেকে ওঁর জন্য এসব এনেছেন।"

"আপনি বিশ্বাস করেন?"

"অবিশ্বাস করার খুব একটা কারণ দেখি না স্যার। কারণ মিস্টার রয়ের অ্যাপার্টমেন্টে কাগজে প্যাক করা বেশ কিছু দামি থাই সিল্কের কাপড় পুলিশ পেয়েছে।"

"রোহিত তো বেশ কিছুদিন ফিরেছে — এদ্দিন বাদে মাল নিতে এল এই লংফেলো।"

"আপনার স্যার সন্দেহটা যায়নি মনে হচ্ছে?"

"না যায়নি," আমি স্বীকার করলাম। "সামথিং ইস স্টিল ফিশি।"

"পুলিশও সেই প্রশ্ন করেছিল। মিস্টার লংফেলোর হ্যান্ডিক্র্যাফট-এর ব্যাবসা করলেও, ওঁর প্যাশন হচ্ছে স্যার অ্যান্টিক। এ নিয়ে উনি অনেক পড়াশুনো করেছেন। অ্যান্টিক অ্যাপ্রেইজার হিসেবে বেশ পরিচিতিও আছে। সেই সূত্রে কয়েকদিনের জন্য ওহায়ওতে গিয়েছিলেন, গতকাল ফিরেছেন। ফিরে এসে মিস্টার রয়ের মেসেজ পান।"

"আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে হ্যান্ডিক্র্যাফট-এর ব্যাবসাই হচ্ছে ওঁর হবি। দোকান ছেড়ে এইভাবে হাওয়া হয়ে গেলে তো ব্যাবসা লাটে উঠবে।"

"এটা স্যার আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে কিনা ভদ্রলোকের টাকার অভাব নেই। গ্রিনিচে বিশাল বাড়ি আছে। ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের মতে বাপ-ঠাকুরদা যা রেখে গেছেন, তাতে মিস্টার লংফেলোর কয়েক পুরুষ চলে যাবে।"

আমি বললাম, "এটা জানার পরও আপনি বিশ্বাস করেন যে দু-তিনশো ডলার ফাইন বাঁচাতে লোকটা ওভাবে ছুটেছিল?"

"ইউ হ্যাভ এ পয়েন্ট স্যার।"

একেনবাবুর কাছে সার্টিফিকেট পেয়ে আমি উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আর কী জানলেন বলুন?"

"ও হ্যাঁ, মিস্টার রয় মাঝেমাঝে অ্যান্টিকের ব্যাপারে মিস্টার লংফেলোর মতামত নিতেন। গতকাল ফোনে যখন কথা হয়েছিল তখন ওঁকে বলেছিলেন, একটা অ্যান্টিকের ন্যায্য দাম কী হতে পারে সেটা মিস্টার রয় জানতে চান।"

"অ্যান্টিকটা কী?"

"তা মিস্টার লংফেলো জানেন না।"

"আপনার কি মনে হয়, এই অ্যান্টিকের সঙ্গে খুনের কোনো সম্পর্ক আছে?"

একেনবাবু বললেন, "এর আগেও মাঝেমধ্যে ঠিক এই ব্যাপারেই মিস্টার লংফেলোর সাহায্য মিস্টার রয় নিয়েছেন। তবে এটা স্যার আপনার প্রশ্নের সঠিক উত্তর হল না।"

"বুঝেছি, লংফেলো নিয়ে আপনি মাথাই ঘামাতে চাইছেন না।"

"তা ঠিক নয় স্যার, তবে মোটিভটা আগে বার করুন। মোটিভ ছাড়া র্যান্ডাম কিলিং হতে পারে, কিন্তু কোল্ড ব্লাডেড মার্ডার হয় না।"

## ।। ১৮।।

বাড়িতে ফিরে প্রথম কাজ হল সুভদ্রামাসিকে ফোন করে এদিকের খবর জানানো। যদিও জানাবার বিশেষ কিছুই ছিল না। একেনবাবু একবার সুভদ্রামাসির সঙ্গে একটু কথা বলতে চান। আগামিকাল বিকেলে যেতে পারি নাকি জানতে চাইলাম। সুভদ্রামাসি বললেন বাড়িতে থাকবেন। আমি আর একেনবাবু পরের দিন বিকেল ছ-টা নাগাদ রওনা দিলাম। প্রমথর কাজ ছিল বলে আসতে পারল না। ফ্রান্সিস্কাও বাইরে কোথায় গেছে।

রাস্তায় বহু গাড়ি, অফিস টাইমের ভিড় তখনও কাটেনি। কিন্তু ভাগ্যক্রমে জর্জ ওয়াশিংটন ব্রিজে জ্যাম ছিল না। তাই সুভদ্রামাসির বাড়িতে সাতটার একটু আগেই পৌঁছে গেলাম।

বেল বাজাতেই সুভদ্রামাসির গলা শুনলাম, "দরজা খোলা, তোমার এসো।" সুভদ্রামাসি বাড়িতে একাই ছিলেন। সুভদ্রামাসির কুক-কাম-হাউসকিপার সুজাতা বাজারে গিয়েছেন তরি-তরকারি কিনতে। পাছে সুভদ্রামাসিকে আমরা এলে উঠতে হয়, তাই দরজা লক করে যাননি।

আমরা ঘরে ঢুকতেই বললেন, "সুজাতা আসুক, তারপর তোমাদের চা করে দেবে।"

"ওসব নিয়ে ভেব না," আমি বললাম। "তুমি কেমন আছো?"

সুভদ্রামাসি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না। বুঝলাম নিজেকে একটু সামলাবার চেষ্টা করছেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, "ভেবেছিলাম শরীর-মন দুটোই পাথর হয়ে গেছে, অনেক ধকলই তো সইতে হয়েছে জীবনে। কিন্তু দেখলাম এখনও হয়নি।"

সুভদ্রামাসির পাশের চেয়ারে একেনবাবু বসলেন। ঘরের কোনায় একটা শান্তিনিকেতনী মোড়া ছিল। সেটা তুলে এনে আমি সুভদ্রামাসির আরেক পাশে বসলাম। সুভদ্রামাসি ওঁর হাতটা আমার হাতের উপর রেখে জিজ্ঞেস করলেন, "প্রমথ আর ফ্রান্সিস্কা এল না?"

"ওরা কোথায় জানি গেছে।"

সুভদ্রামাসি চুপ করে রইলেন।

নিরবতা ভেঙ্গে একেনবাবু বললেন, "মাসিমা, দুয়েকটা কথা ছিল আপনার সঙ্গে?"

সুভদ্রামাসি বুদ্ধিমতী। জিজ্ঞেস করলেন, "রোহিত সম্পর্কে?"

একেনবাবু অনুচ্চস্বরে বললেন, হ্যাঁ, মানে আপনার যদি এখন বলতে অসুবিধা না হয়।"

"অসুবিধা কিছুই নেই, তবে মনটা বিক্ষিপ্ত — গুছিয়ে কি সব কিছু বলতে পারব!"

"একেনবাবু নিউ ইয়র্ক পুলিশকে এ ব্যাপারে সাহায্য করছেন," আমি একেনবাবুর প্রশ্নের কারণটা বিশদ করলাম।

"সে আমি বুঝতে পারছি," সুভদ্রামাসি বললেন। "কী জানতে চাও তুমি?"

"রোহিত সম্পর্কে যা জানেন, তাই বলুন। মানে আপনার সঙ্গে তো বহুদিনের পরিচয় — অনেক কিছুই আপনি জানেন ওঁর সম্বন্ধে।"

সুভদ্রামাসি আবার খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। "এতদিনের পরিচয় বলেই সব কিছু এলোমেলোভাবে মনে পড়ছে।"

"যেভাবে খুশি আপনি বলুন মাসিমা। বুঝতে না পারলে, আমি প্রশ্ন করব।".

সুভদ্রামাসি শুরু করলেন, "রোহিত রিচার্ডের ছাত্র ছিল। তবে রোহিতকে আমি চিনি তার অনেক আগে থেকে। ও যখন হাইস্কুলে পড়ে তখনই ওর বাবা-মার সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়। রোহিতের বাবা মোহিত রিচার্ডেরই সমবয়সি, পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। মা হিলডা কাজ করত কোনো একটা ব্যাঙ্কে। আমাদের সঙ্গে মোহিত আর হিলডার বেশ বন্ধুত্বই গড়ে উঠেছিল। রোহিত স্কুলের পরে অনেক সময়ে আমার কাছে চলে আসত। রোহিত যে বছর হাইস্কুল পাশ করল, সেই বছরই রোহিতের বাবা হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন। তারপর কী যে হল, রোহিতকে নিয়ে হিলডা হঠাৎ জার্মানি চলে গেল। আমাদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগই রাখল না।

রোহিত বছর দুই বাদে ফিরে এসে যেদিন কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে ঢোকে, সেদিনই রিচার্ডের সঙ্গে দেখা হয়। রিচার্ডের বকাবকি খেয়েই বোধ হয় আবার যোগাযোগ করে। রোহিত আন্ডারগ্র্যাজুয়েট পাশ করার পর রিচার্ডই ওকে অ্যাসিস্টেন্টশিপ দেয়, অ্যান্থ্রপলজি-তে মাস্টার্স করার জন্যে। ১৯৯২, অর্থাৎ প্রায় বছর দশেক আগের কথা বলছি। রোহিতের বয়স তখন কত হবে, বছর চব্বিশেক। পড়াশোনায় মেধাবী ছিল রোহিত, রিসার্চের কাজও মন দিয়ে করত, কিন্তু হঠাৎ কী যে ভূত মাথায় চাপল। সব কিছু ছেড়েছুড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।"

"অদৃশ্য!"

"হ্যাঁ, নেপালে না কোথায় তিনমাসের জন্য চলে গেল। ওর মাস্টার্স থিসিসটা তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল! সেই যে গেল, কোনো সাড়াশব্দ নেই! পরে জেনেছিলাম একটা ট্র্যাভেল ম্যাগাজিনের কাছ থেকে নামমাত্র টাকা নিয়ে নেপালের নানান জায়গায় ছবি তুলতে গিয়েছিল। নেপাল থেকে ফিরে রোহিত আমাদের সঙ্গে দেখাও করেনি। এর ওর মুখে শুনেছিলাম ওখান থেকে ড্রাগের নেশা নিয়ে এসেছে। রোহিতের এক বান্ধবী ছিল সেইসময়ে। ইজিপ্টের মেয়ে ফতেমা। সেও পড়াশুনো ছেড়ে ড্রাগ-অ্যাডিক্ট হয়ে গেল। তারপর ঘটল একটা দুর্ঘটনা। রোহিত আর ফতেমা বেয়ার মাউন্টেনে বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে একটা টিলার উপর থেকে পড়ে ফতেমা মারা গেল। পুলিশ কারোর বিরুদ্ধে চার্জ আনেনি। ফতেমার দাদা আব্দুল বস্টনে থাকত। সে একদিন নিউ ইয়র্কে এসে রোহিতকে কোনো একটা বার-এ হঠাৎ ছুরি নিয়ে আক্রমণ করে। রোহিতকে বেশ কয়েকদিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। খুনের চেষ্টা করেছিল বলে পুলিশ আব্দুলের বিরুদ্ধে কেস আনে। বিচারে আব্দুল বছর পনেরোর জেল হয়। এই ঘটনাটাই রোহিতের জীবনের মোড় আবার ঘুরিয়ে দেয়। ড্রাগ রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে গিয়ে নিজেকে নেশামুক্ত করে। ছবি তোলাটাকে আরও সিরিয়াসলি নিয়ে একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এজেন্সিতে কাজ নেয়। রিচার্ডের সঙ্গেও আবার ওর যোগাযোগ হয়। এবার আর ছাত্র হিসেবে নয় — বন্ধু

হিসাবে। ধীরে ধীরে রিচার্ডের, পরে নতুন করে আমারও একজন আস্থাভাজন স্নেহের পাত্র হয়ে ওঠে।"

"নেপালে যাবার কতবছর পরে আবার আপনাদের যোগাযোগ হয়?" একেনবাবু প্রশ্ন করলেন।

"তা প্রায় আড়াই বছর হবে।"

"ঠিক আছে মাসিমা, বলুন।"

"আরেকটা ঘটনাও মনে পড়ছে। রোহিতের রিসার্চের কাজ চুরি করে টম ক্যাসিডি নামে একটি ছেলে তোমাদের নিউ ইউর্ক ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স প্রোগ্রামে থিসিস জমা দেয়। ঘটনাচক্রে সেই থিসিস রিচার্ডের নজরে আসে। পরে রোহিত দেখে শুধু চুরি নয়, হুবহু চুরি। ওর ডেটা, ওর অ্যানালিসিস — এমনকি ওর লেখা সেন্টেন্সগুলো পর্যন্ত টম ক্যাসিডি ব্যবহার করেছে। রোহিত তখন ওর পুরোনো কম্পিউটার থেকে ডেটা-ফাইল আর লেখাগুলো নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে জমা দেয়। যদ্দুর আমার মনে পড়ছে, টম ক্যাসিডিকে এর পর স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।"

"এই টম ক্যাসিডি এখন কোথায় আছে জানেন?"

"আমার কোনো ধারণাই নেই।"

"রোহিতের এখনকার বান্ধবীর নাম বা যোগাযোগের ঠিকানা আপনি জানেন কি?"

"না, লন্ডনে ওর একটা বুটিক শপ আছে — এইটুকুই জানি। নাম আইলিন স্মিথ। ওকে নিয়ে কয়েকবার এসেছে আমার কাছে। ভারি মিষ্টি মেয়ে।"

এরপর আরও এলোমেলো অনেক কথা হল। একেনবাবু বেশ কিছু প্রশ্ন করলেন, কিন্তু আমার খুব একটা রেলেভেন্ট মনে হল না। একেনবাবু সুভদ্রামাসির জিনিওলজির অ্যালবাম আর রিচার্ডমেসোর নোটবুকটা ফেরত এনেছিলেন। সেটা গাড়িতে ফেলে এসেছিলেন। গাড়ি থেকে এনে সুভদ্রামাসির হাতে দিতে, হঠাৎ সুভদ্রামাসি চোখ দিয়ে জল পড়তে শুরু করল। আমি আর একেনবাবু দুজনেই ঠিক কী করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

সুভদ্রামাসি নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "হঠাৎ মা'র কথা ভীষণ মনে পড়ল। আমাদের বিয়ের পর বাবার আপত্তিতেই মা আমার সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখতে পারেননি। কিন্তু বাবুর মৃত্যুর খবর পেয়েই মা একটা চিঠি লিখেছিলেন। রোহিত আমার ছেলে নয়, কিন্তু ওকেও আমি ছেলের মতোই দেখতাম। আজ তাই সকাল বেলায় রোহিতের খবর পেয়ে মা'র পুরোনো চিঠি পড়ছিলাম।" মাসিমা টেবিলে বইয়ের মধ্যে গোঁজা একটা পুরোনো চিঠি বার করে দেখালেন।

নলিনী দিদিমার সেই সুদীর্ঘ চিঠি আমাদের পড়ার জন্য সুভদ্রামাসি দেননি। কিন্তু তাও আমি আর একেনবাবু কয়েকলাইন পড়ার ভান করলাম। এ অবস্থায় কি যে বলা ঠিক, আমার মাথায় খেলছিল না।

একেনবাবু বললেন, "মাসিমা আপনার মা ছিলেন গ্রেট লেডি। আপনিও তাঁরই সুযোগ্য সন্তান। আমি আর কি বলব, আপনার কাছ থেকে আমাদের শেখা উচিত শোক কী ভাবে নিতে হয়।"

আমার এই প্রথম মনে হল বাচাল হবার সুবিধা আছে! সুভদ্রামাসি চুপ করে রইলেন।

আমি বললাম, "এবার উঠি সুভদ্রামাসি।"

"উঠবে? ও হ্যাঁ, ঠিক আছে এসো।"

আমরা উঠে যাচ্ছি, সুভদ্রামাসিও দেখলাম উঠে আমাদের পেছন পেছন আসছেন।

একেনবাবু ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, "মাসিমা, আপনি আসছেন কেন?"

একথা শুনে সুভদ্রামাসি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে কেমন যেন হয়ে গেলেন। আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে ওঁর হাত ধরলাম, তারপর ওঁকে ধরে ধরে নিয়ে আবার চেয়ারে বসিয়ে দিলাম। ঠিক এই সময়েই সুজাতা বাড়িতে ফেরায় আমরা খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বেরোলাম।

সুভদ্রামাসির বাড়ি থেকে ফেরার পথে আমরা অনেক্ষণ চুপ করে রইলাম। ওঁর কান্না–ভরা মুখটা বারে বারে মনের মধ্যে ফিরে আসছিল। খানিকটা আত্মগতভাবেই আমি বললাম, "আজ ফ্রান্সিস্কা এলে সুভদ্রামাসির ভালো লাগত। মেয়ের মতো স্নেহ করেন ওকে।"

একেনবাবু কোনো মন্তব্য করলেন না। খানিক বাদে আমায় প্রশ্ন করলেন, "মাসিমার কথা থেকে কি বুঝলেন আপনি?"

আমি বললাম, "অন্ততঃ দু'জন লোক আছে, যাদের রোহিতকে খুন করার মোটিভ থাকতে পারে।"

"দু'জন কেন বলছেন স্যার?"

"কেন টম ক্যাসিডির কেরিয়ার তো রোহিতের জন্য নষ্ট হল।"

"মিস্টার রয়তো নষ্ট করেননি। ক্যাসিডিই চুরি করেছিলেন।"

"তা হোক, কিন্তু রোহিতের জন্যেই তো কলেজ ক্যাসিডিকে তাড়াল — যদিও এতদিন রাগ পুষে রাখাটা অস্বাভাবিক।"

"আপনি ঠিকই বলেছেন স্যার।"

"আব্দুলের ব্যাপারটা স্বতন্ত্র। কেউ যদি বিশ্বাস করে একজন তার বোনের মৃত্যুর জন্য দায়ী, সেই রাগ সে আজীবন পুষে রাখতে পারে। কী বলেন, পারে না?"

"পারে বইকি স্যার। প্রশ্ন হল, অপরচুনিটি বা সুযোগ স্যার। মোটিভ আছে, কিন্তু খুন করার সুযোগ কি আছে?" একটু অন্যমনস্ক ভাবেই মনে হল কথাটা একেনবাবু বললেন। তারপর হঠাৎ বললেন, "স্যার আপনার মোবাইলটা একটু ব্যবহার করতে পারি?" মোবাইলটা নিয়ে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টকে ফোন করলেন একেনবাবু। আব্দুল আর টম ক্যাসিডির খোঁজ নিতে বললেন।

পরদিন কলেজ থেকে এসে আরও কয়েকটা নতুন খবর একেনবাবুর কাছ থেকে জানলাম। পুলিশ নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে নেই। বেশ কিছু তথ্য উদঘাটিত হয়েছে রোহিত রয়ের সম্পর্কে। সুভদ্রামাসির কাছ থেকে রোহিতের যে ছবিটা আমরা পেয়েছিলাম, সেটা পজিটিভ লাইটে। পুলিশ সবকিছু দেখেছে একটা সন্দেহের চোখ নিয়ে। রোহিতের 'বান্ধবী' আইলিন মিষ্টি হতে পারে, কিন্তু ড্রাগ অ্যাডিক্ট। ইললিগ্যাল ড্রাগ থাইল্যান্ড থেকে পাচার করার জন্য বার দুই জেল খেটেছে। রোহিতের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব এখনও টিকে আছে কিনা, সে সম্পর্কে পুলিশ নিশ্চিত নয়। আইলিন দুদিন আগে নিউ ইয়র্কে এসেছে। কিন্তু রোহিতের অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সের গার্ডরা এর মধ্যে আইলিনকে দেখেনি। সবাই আইলিনকে ভালো করে চেনে, রোহিতের অ্যাপার্টমেন্টে বহুবার এসে থেকেছে। যদি কোনো কারণে রোহিতের সঙ্গে আইলিনের ছাড়াছাড়ি হয়ে থাকে, তাহলে জানা দরকার কারণটা কী? রোহিত কি অন্য কোনো নারীর সঙ্গে ঘনিষ্ট হয়েছে? সেটা জেনেই আইলিন ছুটে এসেছে আমেরিকাতে! ব্যর্থ প্রেমের পরিণতি অনেক সময়েই সাংঘাতিক হয়।

আরেকটা দিকও পুলিশ দেখছে। সে দিক একটু পঙ্কিল। পুলিশের সন্দেহ রোহিত একটা ব্ল্যাকমেইলিং গ্রুপের সঙ্গে ছিল। এরা টার্গেট করত বড়োলোক ও সেলিব্রেটিদের।

তাদের দুষ্কর্মের ছবি বা ভিডিও পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করে দেওয়া হবে বলে ভয় দেখাত। অনেক সময়ে প্রতারণার আশ্রয়ও নিত। যেমন, যখন ওরা আঁচ করতে পারত কোথাও ফষ্টিনষ্টি চলছে, কিন্তু অশালীন অবস্থায় ছবি তোলার সুযোগ মিলছে না। তখন সেই জায়গার ছবি আলাদা করে তুলে, পাত্রপাত্রীদের সাধারণ ছবি থেকে কম্প্রোমাইজিং পজিশনের ছবি ডিজিটালি রি-কনস্ট্রাক্ট করে সেই জায়গায় তারা বসিয়ে দিত। দুষ্কর্ম করে থাকলে অনেক সময়েই এই ধরণের ছবি দেখে লোকেরা ভয় পেয়ে যেত! রোহিত জড়িত ছিল এই ডিজিটাল রিকনস্ট্রাকশনের ব্যাপারে।

পুলিশ এই অ্যাঙ্গেলটার কথা আগে ভাবেনি। কিন্তু একটা উড়ো ফোন পেয়ে রোহিতের কম্পিউটার থেকে এই ধরণের দুয়েকটা ছবি আবিষ্কার করেছে। অসম্ভব নয় যে এই দলের সঙ্গেই কোনো কারণে বনিবনা না হওয়ায়, রোহিতকে প্রাণ দিতে হয়েছে। যাকে ব্ল্যাকমেইল করা হয়েছে বা করার চেষ্টা হচ্ছে — সেও সুযোগ পেয়ে এই কাজ করতে পারে। এরকম বহু ধরণের সম্ভাবনাই চিন্তা করা যেতে পারে।

আব্দুল সম্পর্কেও কিছু তথ্য পুলিশ পেয়েছে! গুড কন্ডাক্টের জন্য আব্দুল জেল থেকে মুক্তি পেয়েছে কয়েক মাস আগে। ইমিগ্রেশন অথরিটি সম্ভবত ইতিমধ্যেই ওকে ডিপোর্ট করে দিয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত টম ক্যাসিডির কোনও খোঁজই পাওয়া যায়নি।

## ।। ১৯ ।।

একেনবাবু যখন গভীর ভাবে কিছু চিন্তা করেন, তখন ভীষণ পা নাড়ান। আমার ধারণা ওঁর চিন্তার গতির প্রোপোরশানালি পা নাড়াটা বাড়ে। সেদিন যখন ঘন ঘন পা নাড়ছেন ওঁর ফাইল থেকে একটা কাগজ হঠাৎ নীচে পড়ে গেল। আমি পাশে বসে পরীক্ষার খাতা গ্রেড করছিলাম। পায়ের কাছে কাগজটা পড়ায়, নীচু হয়ে তুলতেই বেশ কয়েকটা নাম চোখে পড়ল। আব্দুল, টম ক্যাসেডি, হাওয়ার্ড লংফেলো... এই তিন জনের সঙ্গে আরও কয়েকটা নাম দেখে বুঝলাম, এদের সবাইকে সম্ভবত রোহিত রায়ের খুনি বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

"এটা কি সাসপেক্ট লিস্ট?" বলে আমি কাগজটা এগিয়ে দিতেই একেনবাবু ব্যস্তসমস্ত হয়ে ওটা ফাইলে ঢুকিয়ে ফেললেন। কিন্তু তার আগেই একটা নাম আমার চোখে পড়েছে, সেটা সুভদ্রামাসির নাম!

একেনবাবুকে সরাসরি প্রশ্ন করলাম, "সুভদ্রামাসির নাম এখানে কেন?"

একেনবাবু একটু চুপ করে বললেন, "আপনাকে বলিনি স্যার, কারণ সন্দেহ আর সত্যর মধ্যে তো অনেক তফাৎ।"

"ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বলুন, কেন আপনি বা পুলিশ ওঁকে সন্দেহ করছেন?"

"আমাদের কাজটা নচ্ছার স্যার। সবাইকে সন্দেহ করতে হয়।"

"আপনি এড়িয়ে যাচ্ছেন কথাটা। আমার নামও কি লিস্টে আছে?"

"কী যে বলেন স্যার!"

"তাহলে সুভদ্রামাসির নাম কেন আছে?"

“আপনাকে বলছি স্যার, কিন্তু আপসেট হবেন না। আপনার কাছে শুনেছি স্যার, মাসিমার ছেলে স্কুল যাবার সময়ে গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে মারা যায়। কিন্তু আপনি জানেন কিনা জানি না, সেই গাড়ি যিনি চালাচ্ছিলেন তিনি রোহিত রয়।”

“কিন্তু সে তো ষোলো বছর আগের ঘটনা... একটা অ্যাকসিডেন্ট! আর সুভদ্রামাসি রোহিত রায়কে ছেলের মতোই ভালোবাসতেন। তাহলে এই সন্দেহটা আসছে কোত্থেকে?”

“মিস্টার রোহিত রয়ের মা ম্যাডাম হিলডার কাছ থেকে।”

“তার মানে?”

“ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের লোক ম্যাডাম হিলডার সঙ্গে জার্মানিতে যোগাযোগ করেছেন। তাঁর বয়ান অনুসারে মাসিমা ওঁর ছেলেকে সবসময় আগলে আগলে রাখতেন। ছেলে যখন নার্সারি স্কুলে যেতে শুরু করল, তখন স্কুলে যাওয়া নিয়ে একটা সমস্যা হল। মাসিমা স্কুলবাসে ছেলেকে পাঠাতে চান না। তিনি নিজেও নিউ ইয়র্ক শহরের ভেতর গাড়ি চালাতে ভয় পান। সুতরাং রিচার্ডমেসো ছেলেকে পৌঁছে দিতেন। যেদিন পারতেন না, সেদিন ম্যাডাম হিলডা কাজে যাওয়ার পথে বাচ্চাটিকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে যেতেন। মিস্টার রোহিত রয় সেই সময়ে সবে গাড়ি চালানো শিখেছেন। মাসিমা বারবার করে ম্যাডাম হিলডাকে বলে দিয়েছিলেন, ওঁর ছেলে গাড়িতে থাকলে রোহিত যেন গাড়ি না চালায়। যেদিন অ্যাকসিডেন্ট হয় সেদিন মিস্টার রোহিত রয় গাড়িতে উঠে মাকে জোর করতে থাকেন তিনি গাড়ি চালাবেন। ম্যাডাম হিলডা ছেলের আবদার ফেলতে না পেরে রাজি হন। তারপরেই ঘটে সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। পুলিশ যখন আসে, তখন ম্যাডাম হিলডা ছেলেকে বাঁচাতে নিজে গাড়ি চালাচ্ছিলেন বলেন। মাসিমা ছেলের মৃত্যুর পর পাগলের মতো হয়ে যান। কিছুদিন ওঁকে হাসপাতালেও থাকতে হয়। মিস্টার রোহিত রয়ের বাবার হার্ট অ্যাটাকও তার অল্প ক'দিনের মধ্যেই হয় এবং উনি তাতে মারা যান। তার পরপরই ছেলেকে নিয়ে ম্যাডাম হিলডা জার্মানিতে চলে যান।”

“তাহলে সে নিয়ে এখন প্রশ্ন উঠছে কেন?”

“কারণ ম্যাডাম হিলডাকে মিস্টার রয় কয়েকদিন আগে বলেছিলেন যে উনি সুভদ্রামাসিকে সত্যটা জানাবেন।”

“কেন?”

“কারণ খুব স্পষ্ট নয়।”

“রোহিত কবে কথাটা বললেন সুভদ্রামাসিকে?”

“সেটা জানি না স্যার। আদৌ বলেছিলেন কিনা তাও জানি না।”

“তাহলে?”

“কিন্তু যদি বলে থাকেন। তাহলে পুরোনো ক্ষতটা আবার নতুন করে দেখা দেবে। রোহিত ওঁর কোলের ছেলেটির মৃত্যুর জন্য দায়ী — একথা যতই তিনি ভাববেন, ততই শোকে দিশাহারা হবেন। মাসিমার মনে হতে পারে, এই অন্যায় এবং এতদিনের এই ছলনা ক্ষমার অযোগ্য। এখন শুধু কল্পনার খাতিরেই ধরুন, মাসিমা খুব ভোরে মিস্টার রয়ের অ্যাপার্টমেন্টে আসেন।”

“সিকিউরিটি গার্ডের নজর এড়িয়ে?”

“এক সময়ে ঐ অ্যাপার্টমেন্টটা মাসিমাদেরই ছিল। তার একটা চাবি মাসিমার কাছে থেকে যেতে পারে। সেটা ব্যবহার করে গার্ডদের চোখ এড়িয়ে স্বচ্ছন্দেই রেসিডেন্টদের স্পেশাল দরজা দিয়ে ঢুকে সোজা এলিভেটরে উঠতে পারেন। সেক্ষেত্রে রোহিত সকালে মাসিমাকে দেখে অবাক হবে। তারপর কফি বানিয়ে গল্প করার জন্য বসবে। মাসিমা এই

সময়ে অতর্কিতভাবে হ্যান্ডগান বার করে গুলি করে দরজা ভেজিয়ে বেরিয়ে যাবেন। বাড়ি পৌঁছে মিথ্যে অজুহাতে ম্যাডাম এঞ্জেলিকাকে ফোন করবেন, মিস্টার রয়ের সকালে আসার কথা ছিল, কিন্তু আসেননি — এই বলে। এটা কি একেবারেই অসম্ভব?"

আমি বলতে যাচ্ছিলাম, অসম্ভব! কিন্তু হঠাৎ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল — সেদিন যখন সুভদ্রামাসির বাড়ি থেকে চলে আসছি, তখন কেমন সহজে উনি পেছন পেছন হেঁটে আসছিলেন। একেনবাবু 'আপনি আসছেন কেন' বলাতে থতমত খেয়ে কেমন নড়বড়ে হয়ে গেলেন! আরেকটা ব্যাপারও মনে ঝিলিক দিল, কেন সেদিন ছেলে বাবুর মৃত্যু নিয়ে সুভদ্রামাসি এত কান্নাকাটি করছিলেন? রোহিত রয়ের মৃত্যুর সঙ্গে তার আসল যোগটা কোথায়? দুজনেই সন্তানসম বলে, না ছেলের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়ে ইমোশনকে কন্ট্রোল রাখতে পারেননি? আরেকটা প্রশ্নও আমার মাথায় নতুন করে জাগল, কী করে সেদিন ফোন করে একেনবাবুকে বললেন রোহিত মার্ডারড হয়েছে। এটা তো সুভদ্রামাসির জানার কথা নয়! এঞ্জেলিকা যদি ওঁকে হত্যাকান্ড বলে থাকেন তাহলে অন্যকথা। কিন্তু বলেছিলেন কি?

আমাকে বিচলিত দেখে একেনবাবু বললেন, "জানি স্যার আপনি আপসেট হবেন, সেইজন্যই কিছু বলতে চাইনি।"

"যা বললেন তা আমার পক্ষে চিন্তা করাও কঠিন। আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন সুভদ্রামাসি এই মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত?"

"না স্যার। কিন্তু তদন্তের কাজে কোনো কিছুই উপেক্ষা করা উচিত নয়।"

"এবার জিজ্ঞেস করি, কেন করেন না? আপনি যা বললেন, তাতে তো আমারই বিশ্বাস টলে যাচ্ছে।"

"প্রথমত, মিস্টার রয়ের ব্যালাস্টিক টেস্টের রিপোর্ট অনুযায়ী গুলিটা টোয়েন্টি-টু ক্যালিবারের, কিন্তু কপালের ক্ষতটা তার তুলনায় অনেক বড়ো। অর্থাৎ একসেন্ট্রিকভাবে চক্কর চক্কর খেতে খেতে গুলিটা ঢুকেছে এবং বুলেটে কোনো মার্কিং পাওয়া যায়নি।"

"বুলেটে দাগ থাকে নাকি?"

"সাধারণত থাকে স্যার। তার থেকে ধরতে পারা যায়, কোন হ্যান্ডগান থেকে ফায়ার করা হয়েছে। এটা স্পেশাল হ্যান্ডগান। মাসিমা পেশাদার খুনি নন যে খুন করার জন্য এরকম হ্যান্ডগান জোগাড় করবেন। দ্বিতীয়ত, হত্যাকান্ডটা সম্ভবত ঘটেছে আটটা থেকে ন'টার মধ্যে।"

"সেটা জানা গেল কি করে?"

"কারণ পাশের অ্যাপার্টমেন্টে বাথরুম রিমডেল করা হচ্ছিল। সাড়ে সাতটায় হ্যান্ডিম্যানরা এসে টাইল ভাঙছিল। আটটা নাগাদ মিস্টার রয় ভীষণ আওয়াজ হচ্ছে বলে সিকিউরিটিকে কমপ্লেইন করেছিলেন। নটার সময়ে হ্যান্ডিম্যানরা পনেরো মিনিটের কফিব্রেক নেয়। মিস্টার লংফেলো ন'টা-পাঁচের একটু পরে এসে ওঁকে মৃত দেখেন।"

একেনবাবু বলে চললেন, "যদি ধরি মৃত্যু আটটাতেই ঘটেছে। সেক্ষেত্রেও ঐ সময়ে ম্যানহাটান থেকে বেরিয়ে সুভদ্রামাসির পক্ষে সাড়ে দশটার আগে বাড়ি পৌঁছে ম্যাডাম এঞ্জেলিকাকে ফোন করা সম্ভব নয়।"

"নয় কেন?"

"কারণ ওই দিন লিঙ্কন টানেল আর জর্জ ওয়াশিংটন ব্রিজ দুটোই জ্যাম ছিল — দু'ঘন্টার বেশি লাগছিল শুধু ব্রিজ পার হতে।"

তখন আমার মনে পড়ল ব্রিজ জ্যামের কথাটা সুভদ্রামাসিও বলেছিলেন সেদিন

ফোনে।

"কিন্তু ফোন তো মোবাইল থেকেও করতে পারতেন?"

"তা পারতেন স্যার। কিন্তু ম্যাডাম এঞ্জেলিকার কাছে যে ফোনটা এসেছিল, সেটা ওঁর বাড়ি থেকে। তৃতীয়ত,..."

আমি একেনবাবুকে থামিয়ে দিলাম, "আর বলতে হবে না। কিন্তু আমায় বলুন, সুভদ্রামাসি যদি সন্দেহের তালিকায় থাকেন, তাহলে সুভদ্রামাসির বন্ধু এঞ্জেলিকা বা রোহিতের বন্ধু আপনার সেই জিনিওলজিস্ট বাবু পিন্টো নেই কেন?"

"নেই, সেটা তো বলিনি স্যার। সন্দেহের প্রশ্ন নয়, সম্ভাবনার প্রশ্ন। পুলিশ এখন পর্যন্ত জনা পঞ্চাশ লোককে জিজ্ঞেসাবাদ করেছে। আমার লিস্টে তো অল্প নামই আছে।"

"আপনার লিস্ট আর পুলিশের লিস্ট আলাদা মানে? আমার তো ধারণা আপনি পুলিশের সঙ্গে আছেন এই ইনভেস্টিগেশনে?"

"কী যে বলেন স্যার, এটা পুলিশের ব্যাপার। ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে পরামর্শ করেন — এই যা। তাও করেন, কারণ ভারতীয় কম্যুনিটি-এর মধ্যে জড়িত থাকতে পারে বলে। রোহিত রয় অবশ্য পুরো ভারতীয় নন, তবে আধা- ভারতীয় তো নিশ্চয়।"

সুভদ্রামাসির প্রসঙ্গে আর কোনো কথা হলো না। হঠাৎ আমার নজরে পড়ল একটা কার্ড। সেটাও নিশ্চয় ঐ কাগজটার সঙ্গেই মাটিতে পড়েছিল। আমি কার্ডটা তুলে দেখলাম ওটা রিচার্ডমেসোর ভিজিটিং কার্ড। কার্ডটা পুরোনো, যখন উনি ম্যানহাটানে থাকতেন। ওঁর ইউনিভার্সিটি আর ম্যানহাটানের অ্যাপার্টমেন্টের ঠিকানা দুটোই সেখানে আছে। আমি কার্ডটা একেনবাবুকে দিয়ে বললাম, "এটাও কাগজের সঙ্গে নীচে পড়েছিল। ধরে নিচ্ছি রিচার্ডমেসো আপনার সন্দেহের তালিকায় নেই।"

একেনবাবু রসিকতা তেমন বোঝেন না। বললেন, "ছি ছি স্যার, কি যে বলেন! ওটা যেদিন মেসোমশাইয়ের নোটবই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছিলাম, তখনই পড়ে গিয়েছিল। তুলে এই ফোল্ডারে রেখেছিলাম মাসিমাকে ফেরৎ দেব বলে, দেখুন আবার পড়ে গেল!"

"এটা না পেলেও মাসিমার খুব একটা এসে যাবে না।"

"তা হোক স্যার, একটা স্মৃতিচিহ্ন তো বটে," কথাটা বলেই উনি বাথরুমে চলে গেলেন।

## ।। ২০।।

রোহিত রয়ের যেদিন ফিউনারেল সেদিন সকালে একেনবাবুর ফোন এল ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের কাছ থেকে। আমরা তখন সবে কফি নিয়ে বসেছি। ফোন পেয়ে কফিটফি ফেলে কিছু না বলেই একেনবাবু বেরিয়ে গেলেন।

সাড়ে এগারোটার সময় আমি, প্রমথ, আর ফ্রান্সিস্কা যখন ফিউনারেলে যাচ্ছি তখনও উনি ফেরেননি। আমাদের ফিউনারেলে যাবার প্ল্যান ছিল না। কিন্তু সুভদ্রামাসি গতরাত্রে ফোন করে বললেন উনি ফিউনারেলে যাবেন। জানতে চাইলেন আমরা যাব কি না। তখন

আর 'না' বলতে পারিনি, আমরা গেলে নিশ্চয় ওঁর ভালো লাগবে। সুভদ্রামাসিই ফিউনারেল হোমের ঠিকানাটা দিলেন। ম্যানহাটানে নয়, টাপান জি ব্রিজের কাছে "স্লিপি হলো" বলে একটা ছোট্ট শহরে।

ফিউনারেলে অনেক লোক এসেছে। ভিউইং হলে বসার জায়গা নেই। আমরা লবির এক পাশে এসে দাঁড়ালাম। ফ্রান্সিস্কা এরই মধ্যে ফিউনারেল হোমের এক অ্যাটেন্ডেন্টকে ভুজুং ভাজুং দিয়ে চেয়ার ম্যানেজ করে সুভদ্রামাসির পাশে গিয়ে বসতে পারল। ভেতরে ইউলজি শুরু হয়েছে। সেটা শেষ হলে শেষ দর্শনের জন্য একে একে সবাই যাব। অন্যমনস্ক হয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিলাম, কী হাবিজাবি ভাবছিলাম, নিজেরই খেয়াল নেই। হঠাৎ প্রমথ বলল, "একেনবাবুও এসেছেন।" তাকিয়ে দেখি একেনবাবু আর ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট বাইরের দরজা দিয়ে লবিতে ঢুকছেন।

আজ এখানে সবারই বেশভূষা ফর্মাল। ছেলেরা গলায় টাই ঝুলিয়ে স্যুট পরে এসেছে। একেনবাবুই ব্যতিক্রম। যেভাবে বাড়ি থেকে সকালে বেরিয়েছিলেন এসেছেন সেভাবেই। নস্যি রঙের সোয়েটার আর তার ওপরে হালকা খয়েরি রঙের অলওয়েদার কোট — টমেটো, মাস্টার্ড ইত্যাদির সসে রঞ্জিত হয়ে যেটা মাল্টি-কালার্ড।

আমাদের দেখতে পেয়ে একেনবাবু কাছে এসে দাঁড়ালেন। ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট ঢুকলেন ভিউইং হলে।

প্রমথ জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার? সাতসকালে হুড়মুড় করে বেড়িয়ে গেলেন?"

একেনবাবু বললেন, "আর বলবেন না স্যার, আরেকটা সমস্যা।"

"কী সমস্যা?"

"এখানে বলা যাবে না স্যার।" তারপর একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেন, "সবাই স্যার স্যুট-টুট পরে এসেছেন।"

"আমি স্যুট পরেছি ঠিকই, কিন্তু প্রমথ এসেছে স্পোর্টস জ্যাকেট চাপিয়ে, টাই-ফাইও লাগায়নি। আমি অবশ্য বলেছিলাম, "ফিউনারেলে যাচ্ছিস, সবাই টাই পরে থাকবে।"

ও পাত্তা দেয়নি। উলটে বলেছে, "তুই হচ্ছিস কনফর্মিস্ট, সকলের সঙ্গে তাল রেখে চলার চেষ্টা করিস।"

আমি এই সুযোগে প্রমথকে টিপ্পনি কাটার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। একেনবাবুকে বললাম, "আপনি হচ্ছেন সত্যিকারের নন-কনফর্মিস্ট, প্রমথ শুধু মুখে তড়পায়!"

শুনে প্রমথর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য, "রাস্কেল।"

ভিউইং-এর লাইন শুরু হয়েছে। লম্বা লাইন, আস্তে অস্তে এগোচ্ছে। আমরা গিয়ে যখন ক্যাসকেডের সামনে পৌঁছলাম তখন ঘর প্রায় ফাঁকা। রোহিত রয় শুয়ে আছেন। বলা উচিত ওঁর দেহটা শুয়ে আছে। পরণে নেভি-ব্লু স্যুট, গলায় একটা লাল রঙের নক্সা কাটা টাই। মুখটা প্রশান্ত। কপালে গুলি লেগেছিল শুনেছিলাম। কিন্তু তার কোনো চিহ্ন নেই। মর্টিশিয়ান তার যাদুতে সবকিছু অদৃশ্য করে দিয়ে রোহিত রয়কে তাঁর পুরোনো নিখুঁত অবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছে। প্রাণটাই শুধু ফিরিয়ে আনতে পারেনি।

কয়েক সেকেন্ডের জন্য দাঁড়িয়েছিলাম ক্যাসকেডের সামনে, প্রমথর ঠেলা খেয়ে এগিয়ে গেলাম। মৃতদেহ দেখা আমার থেকেও ও বেশি অপছন্দ করে।

একটু দূরে সুভদ্রামাসি আর একজন সাদা মহিলা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে অঝোরে কাঁদছেন। অনুমান করলাম, রোহিত রয়ের মা হিলডা। সন্তানহারা দুই নারী! ফ্রান্সিস্কা সুভদ্রামাসির একটা হাত ধরে আছে। সুজাতাও সেখানে দাঁড়িয়ে।

সুভদ্রামাসির কাছে যেতে আস্তে আস্তে বললেন, "আমি এখন বাড়ি যাব।" আমি হাত বাড়িয়ে সুভদ্রামাসির আরেকটা হাত ধরলাম। আমার আর ফ্রান্সিস্কার হাতে ভর দিয়ে উনি এগোতে থাকলেন। তারপর একমুহূর্তের জন্য থেমে হিলডাকে ডাকলেন। হিলডা কাছে আসতে আমাদের হাত ছেড়ে দিয়ে হিলডাকে জড়িয়ে ধরলেন। হিলডাও। ওঁদের আলিঙ্গন শেষ হবার পর, হিলডা বললেন, "আমি কয়েকদিন আছি, তোমার কাছে আসব।"

"এসো।" মাথা নাড়লেন সুভদ্রামাসি।

মনে হল, এক পুত্রের মৃত্যুতে ঘটেছিল যে বিচ্ছেদ, তার সমাপ্তি হল অন্য পুত্রের মৃত্যুতে!

সুভদ্রামাসিকে গাড়িতে তুলে নিজেদের গাড়ির দিকে এগোচ্ছি, দেখলাম বাবু পিন্টো গাড়িতে উঠলেন। একেনবাবু হাত নেড়ে চেঁচিয়ে বললেন, "ভালো আছেন স্যার? চিনতে পারছেন?"

একেনবাবুকে একবার যে দেখেছে, তার চিনতে না পারার কথা নয়। বাবু পিন্টো মাথা নেড়ে বললেন, "নিশ্চয়, আপনি ভালো তো?"

আমাদের গাড়িটা বাবু পিন্টোর গাড়ির কয়েকটা গাড়ি পরে। আমরা ওঁর কাছাকাছি যেতে, বাবু গাড়ির কাচ নামিয়ে একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার গ্রেট আঙ্কেলের ব্যাপারে আর কিছু এগোল?"

"না স্যার, এখনও কিছু করতে পারিনি।"

"আমি দুয়েকটা লিড পেয়েছি। একদিন যোগাযোগ করবেন, বলে দেব।"

"সো কাইন্ড অফ ইউ স্যার, সো কাইন্ড অফ ইউ। আমি কয়েকদিনের মধ্যেই যোগাযোগ করব।"

"এনি টাইম," বলে বাবু পিন্টো চলে গেলেন। বাবু-র চোখ লাল, বেশ একটু বিধ্বস্ত মনে হল। প্রিয় বন্ধুর মৃত্যু, সেটাই স্বাভাবিক।

প্রমথ বাবু পিন্টোকে চিনত না। লোকটা কে বলাতে মন্তব্য করল, "টোপ।"

"তার মানে স্যার?"

"বুঝলেন না, এক টুকরো খবর দেবে। সেটা গিলে আপনি হ্যাংলার মতো আরও খবর চাইবেন। তখন বলবে পয়সা লাগবে।"

"কী যে বলেন স্যার!"

প্রমথ বলল, "ঠিকই বলি। এবার আসল কথাটা বলুন তো আজ সকালে বেড়িয়েছিলেন কেন?"

একেনবাবু বললেন, "আরেকটা মার্ডার। একই স্টাইলে।"

"তার মানে?"

"যেরকম বুলেট মিস্টার রয়ের শরীরে পাওয়া গেছে, ঠিক সেরকম টোয়েন্টি-টু ক্যালিবারের মার্কিংলেস বুলেট। ক্ষতর সাইজও সাধারণ বুলেটে যা হওয়া উচিত, তার চাইতে বেশি। একেবারে আইডেন্টিকাল কেস!"

"লোকটি কে?"

"দিলীপ পারেখ।"

"তারমানে ভারতীয়?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"কী করত সে?"

"একটা স্পেশালিটি শপে কাজ করতেন। সেখানেই কেউ এসে খুন করেছে।"

“আজ সকালে?”

“না, মনে হচ্ছে কাল রাত্রে। দিলীপ অনেক রাত পর্যন্ত দোকানে বসে কাজ করতেন।”

এইভাবে প্রশ্ন আর উত্তর না লিখে একেনবাবুর কাছে মোটামুটি যা উদ্ধার করলাম সেটা বরং লিখি।

দিলীপ পারেখ গুজরাতের আহমেদাবাদ থেকে বছর চারেক আগে এদেশে এসেছিল। কম্পিউটার গ্র্যাফিক্সে ট্রেনিং ছিল, নিজের ফিল্ডে চাকরি না পেয়ে একটা স্পেশালিটি শপে সেলসম্যানের চাকরি করত। সেইখানেই রোহিত রয়ের সঙ্গে ওর আলাপ। রোহিত রয় অ্যাড-এজেন্সির জন্য ছবি তৈরি করতেন। কিন্তু সব সময়ে সেগুলো রিয়েল হত না, বিভিন্ন ছবির অংশ ব্যবহার করে কম্পোজ করা হত। এডিটিং করা হতো এমন সযত্নে যাতে খুবই ন্যাচেরাল লাগে।

দিলীপের কম্পিউটার গ্র্যাফিক্সের ট্যালেন্ট দেখে রোহিত ওকে কাজে লাগান। দিনের ডিউটি শেষ হলে রোহিত রায়ের ডিজিটাল লাইব্রেরি থেকে ছবি বেছে বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন মাফিক ছবি দিলীপ তৈরি করত। দিলীপের কম্পিউটারে এই ধরণের বেশ কিছু হাফ-কমপ্লিট কম্পোজিশান পুলিশ পেয়েছে। ঠিক কি ধরণের ছবি পুলিশ পেয়েছে, একেনবাবু বিস্তারিত জানেন না। তবে ওঁর ধারণা, পুলিশের থিওরি হল, দিলীপও সম্ভবতঃ রোহিতের সঙ্গে ব্ল্যাকমেইলের ব্যাপারে যুক্ত ছিল। রোহিত রয়ের বাড়ির কম্পিউটারে পুলিশ যে কয়েকটা আপত্তিকর ছবি পেয়েছে, তার এডিটিং-এর কাজ মোটেই পেশাদারি নয়। দিলীপের কম্পিউটারের ছবিগুলো অনেক উচ্চস্তরের। এটা সম্ভব যে রোহিত নিজে ভালো ছবি তুললেও, ওঁর এডিটিং-এর কাজ দিলীপই করত। উনি দিলীপকে শুধু কম্পোজিশনটা বলে দিতেন। ফিনিশিং-এর ব্যাপারটা দিলীপের হাতে থাকত। এই থিওরিটা সত্যি হলে দুজনের মৃত্যুই সহজে ব্যাখ্যা করা যায়। একেনবাবু যখন কথাগুলো বলছিলেন, তখন আমার মনে পড়ল যে রোহিত আমাকে বলেছিলেন যে ওঁর একজন অ্যাসিস্টেন্ট আছে। সেই অ্যাসিস্টেন্টই নিশ্চয় দিলীপ।

## ।। ২১।।

আমি আগে ভাবতাম শুধু আমাদের দেশেই ডানহাত জানে না বাঁ-হাত কী করছে। দেখলাম আমেরিকাতেও তাই। পুলিশ যার খোঁজ করছে ক্রিমিন্যাল বলে, সে দিব্যি ইমিগ্রেশনের বেড়াজাল ডিঙিয়ে এদেশে ওদেশ করছে। ইমিগ্রেশনের লোকরা যাদের পাকড়াও করছে, পুলিশ আবার তাদের খবর রাখে না। আমি হয়তো একটু সরলীকরণই করছি। কিন্তু মাত্র ক'দিন আগে যে লোকটা জেলের কয়েদি ছিল, সেই আব্দুল এদেশ ছেড়েছে চলে গেছে না আছে সেই সহজ প্রশ্নটার উত্তর না মেলার আর কোনো কারণ থাকতে পারে না।

পুলিশ টম ক্যাসিডিরও কোনো খোঁজ পায়নি। ব্রুকলিনে যেখানে থাকত, সেখানে নেই। কোথায় গেছে বাড়িওয়ালা জানে না। একেনবাবুর কথায় মনে হল পুলিশ

অ্যাকটিভলি ওকে খুঁজছে না। সম্ভবতঃ ব্ল্যাকমেইল অ্যাঙ্গেল থেকেই পুলিশ এই হত্যাকান্ড দুটোকে দেখছে।

প্রমথ রাত্রে ডিনার খেতে খেতে একেনবাবুকে চেপে ধরল, "আপনার কী মনে হয় মশাই, মার্ডারটা ব্ল্যাকমেইল সংক্রান্ত?"

"হু নোজ স্যার।"

"হু নোজ মানে! আপনি ডাকসাইটে ডিটেকটিভ, আমাদের গর্ব। আপনি দুম করে 'হু নোজ' বললে তো চলবে না।"

"শুনছেন স্যার প্রমথবাবুর কথা," আমার দিকে তাকিয়ে একেনবাবু বললেন।

"শুনবে না কেন," প্রমথ বলল। "ও-তো কালা নয়। কিন্তু আপনি মশাই আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন না কেন?"

"পুলিশ তো মনে হয় ব্ল্যাকমেইল থিওরির দিকেই এগোচ্ছে।"

"আর আপনি?"

"আমি আর অন্য কী ভাবব বলুন স্যার। ঢাল নেই তলোয়ার নেই, আমি তো নিধিরাম সর্দার।"

একেনবাবুর ক্ষোভের কারণটা আমি জানি। দু'দিন ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট ছুটিতে আছেন। ওঁর ডেপুটি রবার্ট, যাঁর পদবীটা ঠিক মনে করতে পারছি না — একেনবাবুকে একেবারেই পছন্দ করেন না। সেখান থেকেই নিশ্চয় কোনো থাবা-টাবা খেয়েছেন।

তবে প্রমথ ছাড়ল না। বলল, "ঢাল-তলোয়ার নেই কেন? বাপির মতো অ্যাসিস্টেন্ট আপনার। আমি আছি। চাইলে ফ্রান্সিস্কাকেও দলে নিতে পারেন।"

"এটা ভালো বলেছেন স্যার। আপনারা সত্যি সত্যি দলে থাকলে, অন্যকে থোড়াই কেয়ার করি।"

"গুড। এবার বলুন, পুলিশ কেন ব্ল্যাকমেইল থিওরির দিকে এগোচ্ছে।"

"সঠিক বলতে পারব না স্যার। ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট তো নেই। তবে যেটুকু শুনলাম, তা হল দিলীপ পারেখের 'বস' বল্লভ শাহ বলে একটি লোকের উপর পুলিশের সন্দেহ পড়েছে। তাঁকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।"

এই বল্লভ শাহর কথাই বোধহয় রোহিত রয় সেদিন বলেছিলেন। "উনি কি নানান ধরণের বিজনেস করেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"হ্যাঁ স্যার।"

"তাঁকে সন্দেহ করার কারণ?"

"একটা কারণ, বাজারে ওঁর খুব একটা সুনাম নেই।"

"মানে ঠগ-জোচ্চুরি করেন, তা ঝেড়ে কাশুন না," প্রমথ বলল। "কীসের ব্যাবসা ওঁর?"

"অনেক কিছুর স্যার, ভিডিও স্টোর থেকে শুরু করে, হোটেল, ডায়মন্ড, অ্যান্টিক, ট্রাভেল এজেন্সি।"

"এর মধ্যে ঠগ-জোচ্চুরি কোথায়?"

"ঠগ-জোচ্চুরি উনি কতটা করেন সেটা পরিষ্কার নয়। তবে যাদের সঙ্গে উনি কারবার করেন, তাদের অনেকেই শেডি ক্যারেক্টার। কয়েকজনের ক্রিমিন্যাল রেকর্ডও আছে। আর ওঁর হোটেলটারও দুর্নাম আছে।"

নিশ্চয় নারীঘটিত ব্যাপার মিন করছেন। এই ধরণের প্রসঙ্গ এলে একেনবাবুকে ইশারায় বুঝে নিতে হয়।

"তাই যদি হয়, তাহলে পুলিশ এতদিন ওকে ধরেনি কেন?" প্রমথ প্রশ্ন করল।

"ধরত স্যার। ধীরে ধীরে তদন্তের জাল গুটিয়ে আনছিল।"

"কিন্তু এর সঙ্গে খুনের সম্পর্ক কি?" এবার আমার প্রশ্ন।

"সেটাই বলছি স্যার। রোহিত রয় যেদিন খুন হন, তার আগের রাতে বল্লভ শাহ রোহিতের ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন। বল্লভ শাহর বক্তব্য শ্রেফ গল্প করতে। কিন্তু যেটা সবচেয়ে সন্দেহজনক, সেটা হল রোহিত রয় খুন হবার দিন সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ বল্লভ শাহ রোহিত রয়ের বিল্ডিং-এ এসেছিলেন। পুলিশের হিসাব অনুযায়ী মৃত্যু ঘটেছিল আটটা থেকে ন'টার মধ্যে। তার মানে মৃত্যুর সময়ে বল্লভ শাহ ঐ বিল্ডিং-এ ছিলেন।"

"মাই গড!" আমি বললাম। "কিন্তু পুলিশ এতদিন সেটা জানতে পারেনি কেন?"

"কারণ বিল্ডিং সিকিউরিটির কাছে কোনো রেকর্ড ছিল না। পুলিশ জানতেও পারত না, বল্লভ শাহকে প্রশ্ন না করলে।"

"কেন গিয়েছিলেন তার কোনো জবাবদিহি আছে?" প্রমথ জানতে চাইল।

"বল্লভ শাহ বলছেন, সকালে বাড়ি থেকে বেরোবার সময়ে উনি খেয়াল করেন যে ওঁর গাড়ির চাবি মিসিং। গাড়ির চাবিটা একটা ছোট রিং-এ লাগানো থাকে। সেই রিংটা আবার আটকানো থাকে ওঁর বড় চাবির রিং-এ। এর আগেও এরকম হয়েছে যে গাড়ির চাবির রিংটা বড় রিং থেকে খুলে পড়ে গেছে। তাই এবার গাড়ির চাবির রিং না পেয়ে বল্লভ শাহর মনে হয়েছিল, ওটা নিশ্চয় রাতে রোহিতের ফ্ল্যাট থেকে আসার সময়ে লিফটে ঢোকার মুখে পড়ে গেছে।"

"লিফটে ঢোকার মুখে কেন?" প্রমথ প্রশ্ন করল।

"কারণ স্যার, উনি সেই সময়ে ঝন্‌ন করে একটা আওয়াজ পান। কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক ওঁর মাথায় আসেনি ওটা চাবির আওয়াজ।"

"পকেট থেকে চাবি কী করে পড়ে যায়! পকেট ফুটো থাকলে অবশ্য অন্য কথা। এটা খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য এক্সপ্লানেশন নয়।" আমি মন্তব্য করলাম।

"পুলিশেরও একই প্রশ্ন ছিল। ওঁর উত্তর, উনি সবসময়ে চাবির ডগা দিয়ে লিফটের বোতাম টেপেন। বোতাম টেপার পরে পকেটে চাবি রাখার সময়ে নিশ্চয় রিংটা খুলে পড়ে যায়।"

আপাতভাবে এটা অস্বাভাবিক আচরণ মনে হলেও, এটা কিন্তু শীতকালে অনেকেই করে। আমিও মাঝেমাঝে করি। শীতকালে কার্পেটের উপর হেঁটে এসে লিফটের বোতাম কিংবা দরজার মেটাল হ্যান্ডেলে হাত দিলে প্রায়ই শক খেতে হয় স্ট্যাটিক ইলেক্ট্রিসিটির জন্যে। চাবির ডগা ঠেকালে সেখানেই স্পার্কটা হয়, গায়ে শক লাগে না।

আমি বললাম, "ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট তো নেই, আপনি এত খবর জোগাড় করলেন কী করে?"

"বল্লভ শাহই আমাকে বললেন স্যার। পুলিশের হাতে হেনস্তা হবার পর আমাকে ফোন করেছিলেন। কার কাছে জেনেছেন, আমি নাকি ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের দোস্ত। তাই বোধ হয় ভেবেছেন ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টকে ওঁর সাইডটা আমি বুঝিয়ে বলব।"

"আপনার কি মনে হয় উনি সত্যি কথা বলছেন?"

"গোলমাল নিশ্চয় কিছু আছে। ঠিক বুঝছি না, খামোখা কেন উনি বলতে গেলেন সকালে মিস্টার রয়ের বিল্ডিং-এ যাওয়ার কথা!"

"কারণ সিকিউরিটির লোকেরা ওঁকে দেখেছিল বলে।" প্রমথ মন্তব্য করল।

"সিকিউরিটির লোকেরা দেখে থাকলে স্যার অনেক আগেই পুলিশ ওঁকে জিজ্ঞাসাবাদ

করত।”

হঠাৎ আমার একটা প্রশ্ন জাগল, “আচ্ছা একেনবাবু, রোহিত রয়ের বিল্ডিং- লবিতে কোনো সিকিউরিটি ক্যামেরা নেই?”

“আছে স্যার। তবে রোহিত রয়ের মার্ডারের তিনদিন আগে থেকে তার রেকর্ডার খারাপ হয়ে গিয়েছিল। নতুন রেকর্ডার কেনা হয়েছে, কিন্তু ইনস্টল করা হয়নি।”

“কিন্তু সেই তথ্যটা তো বল্লভ শাহর জানার কথা নয়।”

“তা নয়। কিন্তু তিনি খুন করে থাকলেও পুলিশকে তা প্রমাণ করতে হবে। মার্ডারের সময়ে উনি উপস্থিত ছিলেন বলে শুধু শুধু পুলিশকে সাহায্য করবেন কেন?”

“দিলীপ যখন খুন হয়, তখন বল্লভ শাহ কোথায় ছিলেন?” প্রমথ প্রশ্ন করলো।

“উনি বলছেন বাড়িতে ছিলেন। সন্ধ্যা ছ’টায় দিলীপ পারেখকে দোকানে রেখে উনি বাড়ি ফেরেন। তারপর আর বাড়ি থেকে বেরোননি। ন’টা নাগাদ বাইরে থেকে খাবার আনিয়েছিলেন। ক্লান্ত লাগছিলো বলে খেয়েদেয়ে দশটার মধ্যে শুয়ে পড়েন।”

“এটা তো ওঁর গল্প,” প্রমথ বলল।

“রাইট স্যার। তার ওপর উনি অবিবাহিত, অ্যাপার্টমেন্টে একা থাকেন। যে অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন, সেখানে আবার কোনো সিকিউরিটি গার্ড নেই। সুতরাং তিনি যে ঘরেই ছিলেন তার কোনো প্রমাণ নেই। হি হ্যাস নো অ্যালিবাই।”

এরপর একেনবাবু যা বললেন সেটা হল ওঁর স্পেকুলেশান। পুলিশ নিশ্চয় অনুমান করছে রোহিত রয় আর দিলীপের সঙ্গে বল্লভ শাহও ব্ল্যাকমেইল রিং-এ ছিলেন। হয়তো বখরা নিয়েই ওঁদের মধ্যে ঝগড়া লেগেছিল। পাপকাজের বন্ধুরা যখন শত্রু হয়, তখন হয় সেই শত্রুর নাশ, নয় নিজের বিনাশ।

“আমার মনে হচ্ছে, আপনি পুলিশের সঙ্গে ঠিক একমত হতে পারছেন না।”

“তা নয় স্যার। তবে কিনা খোঁজ নিয়ে জানলাম মারা যাবার আগে পর্যন্ত দিলীপ পারেখের আচরণ খুব স্বাভাবিক ছিল। আই অ্যাম লিটল কনফিউজড স্যার।”

এর মধ্যে কী এমন কনফিউশনের আছে বুঝলাম না। তবে একেনবাবুর কথাবার্তা অনেক সময়েই হঠাৎ ক্রিপ্টিক হয়ে যায়!

## ।। ২২।।

পর পর দুটো মার্ডারের পর শিশিরবাবুর ব্যাপারটা আমরা প্রায় ভুলতেই বসেছিলাম। রাত্রে প্রভাসের একটা ই-মেইল পেলাম। লিখেছে ওখানকার ও.সি রাখালবাবু নাকি একেনবাবুর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন। জিজ্ঞেস করেছে আমরা কিছু শুনেছি নাকি একেনবাবুর কাছ থেকে?

সকালে ব্রেকফাস্ট খাবার সময়ে আমি একেনবাবুকে শিশিরবাবুর কথা জিজ্ঞেস করলাম।

“হ্যাঁ স্যার, আপনাদের বলতে ভুলে গেছি, যা ঝামেলা যাচ্ছিল ক’দিন!”

তারপর যা বললেন, তা হল—

পুলিশ দুজন রিকশাওয়ালা আর শিশিরবাবুর বাড়িতে মতিলাল নামে যে কাজ করত, তার ভাইকে ধরেছে। রিক্সা-চালকদের বয়ান অনুসারে এক আধ-চেনা ভদ্রলোক ওদের বলেন যে শিশিরবাবুর বাড়িতে একটা ছোটো কাঠের বাক্স আছে, সেটা চুরি করে আনতে পারলে দু-হাজার টাকা দেবেন। ওরা ওদের বন্ধু মতিলালের ভাইকে ধরে। সে শিশিরবাবুর বাড়িতে অনেকবারই গিয়েছে। সে বলে দেয় কোথায় পুরোনো কাঠের বাক্সটা আছে। মতিলালের অজান্তে বাড়ির চাবিও বন্ধুদের দেয়। পরদিন শিশিরবাবু বাইরে যেতেই একজন বাড়িতে ঢোকে, অন্যজন বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে। তালা লাগানো দেখলে কারো কোনো সন্দেহ হবে না ভেতরে কেউ আছে বলে। একটু বাদেই ভেতর থেকে সিগন্যাল পেয়ে বাইরের লোকটি দরজা খুলতে যায়। এমন সময়ে শিশিরবাবু হঠাৎ বাড়ি ফিরে আসেন। শিশিরবাবু বুঝতেও পারেননি কী হচ্ছে! উনি লোকটিকে জিজ্ঞেসা করেন, 'কী চাও?' সে ভয় পেয়ে হঠাৎ ছুট লাগায়। যাবার সময় হাত থেকে চাবিটা পড়ে যায়। শিশিরবাবু নিশ্চয় অবাক হয়েছিলেন। কিন্তু দরজায় তালা আছে। সুতরাং লোকটির বদ-উদ্দেশ্য থাকলেও ক্ষতি করতে পারেনি। এই ভেবে নিশ্চয় তালা খুলে ভেতরে ঢোকেন। তখনই ভেতরের লোকটি ওঁকে ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে এসে দরজাটা ভেজিয়ে অদৃশ্য হয়। তার বক্তব্য, শিশিরবাবু যে ঐটুকু ধাক্কাতেই মারা যাবেন কল্পনাও করেনি। ও চোর, কিন্তু খুনি নয়। বুড়ো মানুষ মারা যাওয়াতে ও খুবই অনুতপ্ত, ইত্যাদি। যাইহোক, ওরা যখন বাক্সটা সেই ভদ্রলোককে দেয়। তিনি বলেন ওটা ভুল বাক্স। এই নিয়ে ওদের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। ভদ্রলোক শেষে রাগ করে পাঁচ-শো টাকা দিয়ে বাক্সটা নিয়ে যান। রাখালবাবু প্রভাসকে জিজ্ঞেস করে জেনেছেন যে পুরোনো একটা কাঠের বাক্স কাচের আলমারিতে ছিল। শিশিরবাবু প্রাণে ধরে কিছুই ফেলেন না। তবে এই বাক্সের জন্য কেউ দু-হাজার টাকা দেবে ভাবা যায় না। ভদ্রলোক নিশ্চয় গয়নার বা অ্যান্টিক কোনো বাক্সের কথা বলেছিলেন, যেটা প্রভাস কখনও দেখেনি। রাখালবাবু দল নিয়ে শিশিরবাবুর বাড়িতে আবার গিয়েছিলেন, যদি অন্য কোনও বাক্স চোখে পড়ে। গিয়ে দেখেন দরজার তালা ভাঙা। এমনি কি গোদরেজের আলমারিও কেউ শাবল বা কিছু দিয়ে ভেঙেছে। দুয়েকটা পুরোনো জামাকাপড় ছাড়া মূল্যবান কিছুই সেখানে অবশিষ্ট নেই। অর্থাৎ, মহামূল্য সেই অলীক বাক্স শুধু নয়, কাপডিশ ইত্যাদিও সেই সঙ্গে অদৃশ্য হয়েছে। বাক্সের খোঁজ যাঁরা করছিলেন তাঁরা তো এসেছিলেনই, সেইসঙ্গে ছিঁচকে চোরও ভাঙা দরজার সুযোগ নিয়েছে বলে মনে হয়। পুলিশ এখন চেষ্টা করছে সেই বাবুটিকে ধরার। ভদ্রলোকের চেহারার একটা বিবরণ পুলিশ পেয়েছে। বেঁটে, দেহটা একটু মোটার দিকে, অল্প ভুঁড়ি আছে, গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মাথায় অল্প টাক, নাকে এক চিলতে গোঁপ। এরকম অজস্র লোক রাস্তায় চোখে পড়বে।

একেনবাবুর দীর্ঘ কাহিনি শেষ হবার পর আমি বললাম, "আপনার কথা শুনে তো মনে হচ্ছে, শান্তিনিকেতনের পুলিশ ডেড-এন্ডে গিয়ে পৌঁছেছে।"

একেনবাবু তার উত্তর না দিয়ে বললেন, "স্যার, কাল সকালে কি আপনার ক্লাস আছে?"

"না, কিন্তু কেন?"

"আপনার সঙ্গে নিউ জার্সি যেতাম।"

"নিউ জার্সিতে? কোথায়?"

"জার্সি সিটিতে।"

"সেখানে কে থাকেন?"

"একজন থাকেন স্যার।"

"নিশ্চয় একজন থাকেন," প্রমথ বলল। "কিন্তু সেই একজনটি কে? আপনার কি একজন গার্লফ্রেন্ড হয়েছে নাকি?"

"ছি ছি, কী যে বলেন স্যার।"

"কেন মশাই, বউদিকে এদ্দিন ছেড়ে আছেন, একটু যদি মন উড়ু উড়ু হয় — তাতে তো অবাক হবার কিছু নেই।"

"সত্যি স্যার, আপনার মুখে কিছু আটকায় না!"

"তাহলে লোকটি কে?"

"লোক নয় স্যার, একজন মহিলা।"

"পথে আসুন, কত বয়স মহিলাটির?"

"ধারণাই নেই স্যার, আশি-টাশি হবে।"

"ওরে বাবা, তা এই বুড়ির সঙ্গে আপনার কী দরকার?"

"উনি টম ক্যাসিডির পিসি। হয়তো টম ক্যাসিডির খোঁজ জানতে পারেন।"

"তা এই পিসিটির সন্ধান জোগাড় হল কী করে?"

"সে এক কাহিনি স্যার।"

এমন সময়ে ফোন। একেনবাবুই ধরলেন। দুয়েকটা কথা বলে ছেড়ে দিয়ে বললেন, "কাল স্যার ছুটি। এইমাত্র খবর পেলাম টম ক্যাসিডির খোঁজ পাওয়া গেছে। মাস দুই আগে সেলসম্যানের চাকরি নিয়ে অ্যারিজোনা গেছেন।"

## ।। ২৩ ।।

সকালে কোনো ক্লাস ছিল না। বিকেলেও আজ না গেলে চলে। যে কাজ আছে বাড়িতে বসেই করতে পারি। প্রমথ ল্যাব-এ চলে গেছে। একেনবাবু সোফায় বসে বসে পা নাচাচ্ছিলেন। হঠাৎ উঠে গায়ে অলওয়েদার কোটটা চাপিয়ে বললেন, "একটু ঘুরে আসছি স্যার।"

এটা একেনবাবুর একটা বৈশিষ্ট্য। কিছুতেই বলবেন না ঠিক কোথায় যাচ্ছেন। এই নিয়ে প্রমথর সঙ্গে ওঁর প্রায়ই লাগে। প্রমথ বলে, "আপনি ভীষণ সিক্রেটিভ।"

"কেন স্যার?"

"বলে যেতে পারেন না, কোথায় যাচ্ছেন?"

"কী করে বলব স্যার, আমি নিজেই জানি না ঠিক কোথায় যাব।"

"কী যা তা বকছেন, আপনি জানেন না এখন কোথায় যাচ্ছেন?"

"তা জানি স্যার। কিন্তু সেখান থেকে কোথায় যাব — সেটা তো ঠিক করিনি।"

"তা এখন যেখানে যাচ্ছেন সেটা তো বলতে পারেন!"

"তাহলে তো স্যার ইনফরমেশানটা কমপ্লিট হল না।"

"আপনি কি বউদিকেও না জানিয়ে এরকম অদৃশ্য হতেন?"

“খেপেছেন স্যার, আমার ফ্যামিলির চোখ এড়িয়ে কিছু করা শিবের অসাধ্যি!”

“দাঁড়ান আজকেই বউদিকে লিখছি যে এখানে এসে আপনার পাখা গজিয়েছে!” প্রমথ থ্রেট করল।

তবে একটা কথা ঠিক একেনবাবু যখন ফিরে আসবেন বলেন, ঠিক সেই সময়েই ফিরে আসেন। যদি কোথাও আটকা পড়ে যান, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে আমাদের জানিয়ে দেন। এ নিয়ে কমপ্লিমেন্ট দিলে বলেন, “ কি যে বলেন স্যার, আপনারা ছাড়া এদেশে আমার কে আছেন বলুন।”

“তারমানে ওদেশে আমরা আপনার কেউ নই।” প্রমথ টিপ্পনি কাটে।

“প্রমথবাবু না স্যার, সত্যি!”

ওরা বেড়িয়ে যাবার পর আমি আমার ই-মেইল চেক করতে বসলাম। বেশিরভাগই কাজ সংক্রান্ত। শুধু একটা নয়, সেটা বন্দনার। বন্দনা লিখেছে, ওদের বিয়ের কথা। ওরা দুজনে শান্তিনিকেতনে চলে এসেছে। নতুন সংসার সাজাতে ব্যস্ত। প্রভাসের কাজের চাপ হঠাৎ বেড়েছে। একজন অধ্যাপক অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁর ক্লাসও প্রভাসকে নিতে হচ্ছে। বন্দনা ভাবছে ও-ও কিছু একটা করবে। কিন্তু কী করবে এখনও ঠিক করতে পারছে না। শেষে লিখেছে যার বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায়,

> তোমার কথা প্রায়ই ও বলে। আমার তো সব সময়েই মনে হয়। আর কতদিন ওদেশে পড়ে থাকবে? তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। আমার এক বন্ধু অছে, খুব মিষ্টি আর দারুণ সুন্দরী। তোমার সঙ্গে চমৎকার মানাবে। রাগ করলে না তো? এখানে কোনো কম্পিউটার নেই। অনেক পথ হেঁটে একটা সাইবার কাফে থেকে তোমায় লিখছি।
>
> ভালোবাসা নিও।
>
> তোমার বন্দনা

চিঠিটা পড়ে কেন জানি না একটা বিষণ্নতা আমায় পেয়ে বসল। ‘তোমার বন্দনা’ কথাটা পড়লাম কয়েকবার। সেন্স অফ গিল্ট? বন্দনার চোখ আমি কোনো দিনই ফাঁকি দিতে পারিনি, তাই নিশ্চয় ওর খারাপও লাগছে। আমি যে ওকে সম্পূর্ণ হারাইনি, সেটাই আমাকে মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করছে ‘তোমার বন্দনা’ কথা দুটোর মধ্যে দিয়ে। আমার একাকিত্ব দূর করার জন্যও ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। চোখের সামনে ফোটোগ্রাফিক ফ্রেমের মতো একের পর এক বন্দনার নানান ছবি চোখের সামনে ভেসে ভেসে উঠতে লাগল। কম-বয়সি বন্দনা, কিশোরী বন্দনা, যৌবনে পরিপূর্ণা বন্দনা। হঠাৎ তীব্রভাবে অনুভব করলাম বন্দনাকে কী ভীষণভাবে আমি চেয়েছিলাম! আমার বহু নিদ্রাহীন রাত্রি কেটেছে বন্দনার কথা ভেবে। কল্পনায় ওকে আমার পাশে পাশে রেখেছি, যা সামনা-সামনি বলতে পারিনি, তা অনায়াসে কল্পনায় ওকে বলেছি, যা শুনতে চেয়েছি তা শুনেছি। কিন্তু বাস্তবে কখনোই সাহস করে বলতে পারিনি যে ওকে চিরজীবনের জন্য কাছে পেতে চাই। হাসি-ঠাট্টার মধ্যে দিয়ে একবার প্রেমের প্রসঙ্গ তুলেছিলাম ঠিকই, কিন্তু পরে নিজেই লজ্জিত হয়েছি সেই হাস্যকর প্রচেষ্টায়। আসলে আমার ভয় ছিল ও আমায় প্রত্যাখ্যান করবে। কিন্তু প্রত্যাখ্যানেরও তো একটা মূল্য আছে। বহু অনাবশ্যক কল্পনা, স্বপ্নের জাল বোনা চিরতরে সেটা স্তব্ধ করে দিতে পারে। লাঠির বড়ো একটা বাড়ি মেরে

রূঢ় বাস্তবের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দেয়, শরীর ও মনকে আশা-নিরাশার দ্বন্দে কুরে কুরে নষ্ট হতে দেয় না। আমার এই ভীরুতার ফল সারা জীবনই ভোগ করতে হবে। বন্দনার চিঠি আরও পাব, কারণ সিলেক্টেড হইনি ঠিকই, কিন্তু রিজেক্টেডও হইনি। আর সেই চিঠি আমায় যেমন দেবে আনন্দ, তেমনি বয়ে আনবে না পাওয়ার পুরোনো বেদনা।

আমি বন্দনাকে একটা উত্তর লিখতে বসলাম। লিখলাম "এক সুন্দরীকে চেয়ে পাইনি, কী করে তুমি ভাবছ আরেক সুন্দরীকে না চেয়েই পাব।" হঠাৎ মনে হল, একি পাগলের মতো লিখছি! কম্পিউটার বন্ধ করে টিভি খুলে বসলাম। মনকে বন্দনা-মুক্ত করা দরকার।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়ালও নেই। ঘুম যখন ভাঙল, তখন দেখি একেনবাবু কিচেনে কফি বানাবার চেষ্টা করছেন। আমি উঠেছি দেখে বললেন, "প্রমথবাবুও ফিরেছেন। একটু বাইরে গেছেন কি একটা পার্সেল করতে।"

আমি জানি সেটা কি। ফ্রান্সিস্কার এক বন্ধুর বিয়ে হচ্ছে বাল্টিমোরে-এ। ওরা যাবার প্ল্যান করেছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে কাজের জন্য আটকা পড়েছে। বন্ধুকে দেবে বলে সুইস আল্পসের একটা সুন্দর ফ্রেমে বাঁধানো ছবি কিনেছিল ফ্রান্সিস্কা। সেটাই নিশ্চয় প্রমথ পার্সেল করতে গিয়েছে।

প্রমথ বাড়ি ফিরতে জিজ্ঞেস করলাম, "কিরে, পার্সেল করা হল?"

প্রমথ বলল, "বলিস না, জোর গচ্চা গেছে স্টুপিড পার্সেলটা করতে!"

"কত নিলো?"

"পঞ্চান্ন ডলার, বিশ্বাস করবি? ছবিটা তিরিশ ডলার হবে কিনা সন্দেহ!"

একেনবাবু পয়সাকড়ির ব্যাপারে খুব সেন্সেটিভ। "বলেন কি স্যার, এত হাইওয়ে রবারি! যাই বলুন স্যার, আমেরিকা হল আজব দেশ। বিচির থেকে খোলের দাম বেশি।"

প্রমথ তর্ক করতে ভালোবাসে। বলল, "এ একটা বাজে কথা বললেন। লোকে বিচি ফেলে বাইরের অংশ খায় — আম বলুন, লিচু বলুন, আঙুর বলুন।"

একেনবাবু বললেন, "আপনি উলটোগুলো দেখছেন না কেন স্যার। খোলসের মধ্যেই থাকে চিনেবাদাম, শুক্তির মধ্যে থাকে মুক্তো।"

আমি ভাবছিলাম, উঃ, মাঝে মাঝে এত বাজে বকবক করতে পারে ওরা! প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্য বললাম, "দুদিকেই অজস্র উদাহরণ আছে। আর সবই রিলেটিভ। যারা ছবিটা পাচ্ছে, তাদের কাছে ছবিটাই আসল। বাইরের বাক্স বা বাবল র‍্যাপিং-এর দাম কত, সে নিয়ে ভাববে না। অন্যদিকে প্রমথ গাঁটের পয়সা খরচা করে প্যাকিং করিয়েছে, এয়ারে শিপ করছে — তাই ওগুলোই ওর কাছে আসল।"

"এটা ভালো বলেছেন স্যার।" বলে একেনবাবু চুপ মেরে গেলেন।

প্রমথ বলল, "অবাক করলেন মশাই, শুধু একটা বাক্যবাণে মৌনীবাবা হয়ে গেলেন যে বড়ো?"

"কেন স্যার, আমি কি বেশি বকবক করি?"

"আলবাৎ করেন। যদি না আপনার মাথায় অন্য কোনো চিন্তা ঘুরপাক না খেতে শুরু করে!"

"আপনাকে বলিহারি স্যার, একেবারে বাঘের চোখ। ধরেছেন ঠিক।"

"কী ভাবছিলেন?"

"বাপিবাবুর কথায় হঠাৎ আরেকটা জিনিস মনে এল।"

"কী সেটা?"

"এই স্যার, শিশিরবাবুর কথা। উনি ওঁর মহামূল্য প্রেমপত্রগুলো বাক্সবন্দি করে রাখলেন। ওঁর কাছে প্রেমপত্রগুলোই বড়ো, বাক্সটা নিমিত্ত মাত্র। অথচ আরেকটা লোক সেই মহামূল্য চিঠিগুলোকে মাটিতে ফেলে দিয়ে বাক্সটা নিয়ে অদৃশ্য হল। ভ্যালু ব্যাপারটাই একেবারে রিলেটিভ স্যার।"

"শিশিরবাবুর প্রেমিকা যদি কোনো সেলিব্রেটি হতেন — ধরুন, নার্গিস বা সুচিত্রা সেন, অথবা তার থেকেও উর্ধে চলে যান, ক্লিওপেট্রা — তাহলে হয়তো চিঠিগুলোই চুরি হতো। কি মশাই, হত না?" প্রমথ প্রশ্ন করল।

"তা হতো স্যার। চড়া দামেই বিক্রি হত চিঠিগুলো।"

"এখন প্রশ্ন হল বাক্সটার অ্যান্টিক ভ্যালু কত। আপনার কোনো ধারণা আছে?"

"তেমন নেই স্যার। মিস্টার লংফেলোর সঙ্গে এই নিয়েই দু'দিন আগে কথা বলছিলাম।"

"লংফেলো মানে, যে লোকটি রোহিত রয়ের সঙ্গে সেদিন দেখা করতে এসেছিল?"

"হ্যাঁ স্যার। ভদ্রলোক অ্যান্টিক সম্পর্কে অনেক জানেন।"

"আপনি কি সেই জন্যেই ওঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলেন?"

"কী করব স্যার, মাথায় কিছুতেই ঢুকছিল না একটা পুরোনো বাক্স কেউ চুরি করতে যাবে কেন!"

"মিস্টার লংফেলো কি বললেন?" এবার আমিই প্রশ্নটা করলাম।

"বাক্সটা না দেখে দাম বলা শক্ত। তবে চিঠিপত্র ছিল শুনে বললেন বড়ো সাইজের একটা জুয়েলরি বক্স হওয়া সম্ভব। তবে বাক্সটা যদি বেশি বড়ো হয়, তাহলে সম্ভবত ওটা ছিল রাইটিং ডেস্ক।"

রাইটিং ডেস্ক-এর কথা আমি বইয়ে পড়েছি। আগেকার যুগে বাক্সের ডালা বন্ধ করে তার উপরে খাতা রেখে হিসেবটিসেব চিঠিপত্র — এইসব লোকে লিখত। বাক্সের ভেতরে থাকত লেখার যাবতীয় সরঞ্জাম কাগজপত্র, খাতা-কলম ইত্যাদি।

"কি রকম দাম ওগুলোর?" প্রমথ জিজ্ঞেস করল।

"আমিও স্যার প্রশ্নটা করেছিলাম। বললেন, জিনিসটা না দেখে বলা যায় না।"

"একটা রেঞ্জ তো আছে?"

"তা আছে স্যার, পাঁচ ডলারও হতে পারে, আবার পাঁচ হাজার ডলারও হতে পারে। জর্জ ওয়াশিংটনের রাইটিং ডেস্ক হলে মিলিয়ন ডলার হওয়াও বিচিত্র নয়।"

"দু-চারশো টাকার রাইটিং ডেস্ক কখনোই ওটা ছিল না," আমি বললাম। "সেক্ষেত্রে চুরি করার জন্য অত টাকা কেউ দিত না।"

"আরেকটা সম্ভবনার কথাও উনি বললেন, সেটা হল টি-ক্যাডি। টি ক্যাডি অবশ্য সব সময়ে কাঠের হত না, তবে এককালে টার্ন ব্রিজের কাঠের টি-ক্যাডির বেশ চল ছিল। তবে টি-ক্যাডি হলে ভেতরে খোপ খোপ থাকত। সেগুলো কেটে উড়িয়ে না দিলে সেখানে চিঠিপত্র রাখা যেত না। তাই মনে হয় ওটা টি-ক্যাডি নয়।"

"সেই টি-ক্যাডিগুলোর দাম বেশি না কম?"

"সেটা জিজ্ঞেস করিনি স্যার। তবে মনে হয় ঐ একই রেঞ্জ।"

"তাহলে আর কি এসে গেল?"

"আমি শুধু পসিবিলিটির কথাগুলো বললাম স্যার।"

"আরেকটা পসিবিলিটিও তো হয়," প্রমথ বলল। "শ্রীনিকেতনের কোনো কাঠের মিস্তিরির তৈরি। হয় না?"

"তা হয় স্যার।"

"তাহলে সেটা ধরছেন না কেন?"

"ইউ হ্যাভ এ পয়েন্ট স্যার। তবে কিনা তার জন্য কেউ পয়সা দিয়ে ওটা চুরি করাবে না।"

"আপনি মশাই, আপনার অ্যান্টিক নিয়ে মাথা ঘামান," বলে প্রমথ আমাকে বলল, "এই বাপি, একটা সিডি কিনে আনলাম ইন্ডিয়া মিউজিক শপ থেকে। শ্যামলের। শুনবি?"

শ্যামল মিত্রের গান যদিও আমার মায়ের আমলের, কিন্তু ওই সময়কার গান শুনতেই আমার ভালো লাগে।

"তোর তো দেখছি ইদানিং বেশ গানে উৎসাহ হয়েছে? চমৎকার, লাগা।"

'কার মঞ্জীর বাজে' গান দিয়ে সিডির শুরু। আমার ফেভারিট।

একেনবাবু যিনি একেবারেই গান-বাজনা ভালোবাসেন না, তিনিও দেখলাম চোখ বুজে পা নাড়িয়ে নাড়িয়ে শুনছেন।

দেখেছি তোমাকে মুখর মেলায়
পথের বাঁকে আর রঙেরই খেলায়
জেনেছি তুমি মোর অনুরাগিনী।

হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ইনফ্যাক্ট দারুণ বলেছেন স্যার।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কিসের কথা বলেছেন?".

"ঐ যে স্যার, ছবি আর ছবির বক্স আর র‍্যাপিং-এর কথা।"

এটা কি এমন দারুণ সেটা অবশ্য আর ব্যাখ্যা করলেন না। উলটে একটা প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা স্যার, মাসিমা কি ফ্রেঞ্চ জানেন?"

সুভদ্রামাসি একটু আধটু ফ্রেঞ্চ জানেন আমি জানতাম। ফ্রান্সিস্কার সঙ্গে মাঝে মাঝে ফ্রেঞ্চে কথা বলতে শুনেছি। বললাম, "বোধহয়, কেন বলুন তো?"

"আসছি স্যার," বলে বোঁ করে ঘুরে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

একেনবাবুর সঙ্গে থেকে থেকে আমাদের এত অভ্যাস হয়ে গেছে যে এগুলো নিয়ে আর মাথা ঘামাই না। আমরা আয়েস করে বসে শ্যামলের গান শুনতে লাগলাম।

একটু বাদেই দেখি উনি ওঁর অল-ওয়েদার গায়ে চাপিয়ে এসেছেন।

"স্যার আমি একটু বেরোচ্ছি, খানিক বাদেই ফিরব।" তারপর প্রমথকে বললেন, "আমি স্যার আজ পিৎজা নিয়ে আসছি। রান্নাবান্না করবেন না।"

"হঠাৎ এই সুমতি?"

"না স্যার, আপনারাই তো খালি খাওয়ান, একদিন আমি খাওয়াতে পারি না?"

"একদিন কেন, চাইলে প্রতিদিন পারেন। এত আনন্দের কথা," প্রমথ বলল।

"স্যার, আপনার দিদিমার ছবিটা একটু নিয়ে যাচ্ছি — আপনার অ্যালবাম থেকে।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কেন, কি ব্যাপার?"

"বিরাট কোনো ব্যাপার নয় স্যার। হারাব না, ভয় নেই।" বলে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন।

একেনবাবুর অনেক কাজই খাপছাড়া, তাই খুব একটা অবাক হই না।

প্রমথ বলল, "জানি কেন নিয়ে যাচ্ছেন। তুই সেদিন কথায় কথায় বললি না কপি করা বলে ছবিটা খারাপ হয়েছে, সেটাই উনি ঠিক করে দেবেন। আজকে বেশ বদান্য-মুডে আছেন!"

একেনবাবু পিৎজা নিয়ে ফিরলেন একটু দেরি করেই। আসতেই প্রমথ ওঁকে ঝাড়লো, "কি মশাই, খাওয়াবেন বলে মাথা কিনে নিয়েছেন নাকি! আটটার সময় ডিনার টাইম আর আপনি ন'টার সময়ে হেলতে দুলতে আসছেন?"

আমি বললাম, "চুপ কর, ওঁর নিশ্চয় একটা এক্সকিউজ আছে।"

"তা আছে স্যার।" পিৎজার বাক্সটা খুলতে খুলতে বললেন, "আপনার জন্য পেপারোনি আর অনিয়ান, আর প্রমথবাবুর জন্য সসজে আর মাশরুম।".

"আর আপনি?"

"আমি স্যার আপনাদের দু'জনের কাছ থেকেই একটু শেয়ার করব।"

"ও, আপনি ভ্যারাইটি খাবেন, আর আমাদের জন্য সিঙ্গল আইটেম। বলিহারি হোস্ট আপনি।"

"কী মুশকিল স্যার, আপনি সসেজ মাশরুম ভালোবাসেন বলেই তো স্পেশালি আনলাম।

"তা হোক, আমিও আপনার মতো ভ্যারাইটি খাব।"

"নিশ্চয় খাবেন স্যার।"

আমি বললাম, "আপনার এক্সকিউজটা কি, সেটা তো বললেন না?"

"ও হ্যাঁ স্যার। তার আগে আপনার ছবিটা রেখে আসি।" বলে একেনবাবু ছবির খামটা আমার ঘরে রাখতে গেলেন।

এটাও একেনবাবুর বৈশিষ্ট্য, গল্পের আগে একটা সাসপেন্স ক্রিয়েট করতে ভালোবাসেন। চট করে কিছু না বলে সময় নেওয়া। তবে আমরা ওঁর অপেক্ষায় না থেকে পিৎজার একটা স্লাইস তুলে তার সদ্বব্যবহার শুরু করলাম। অতি সুস্বাদু পিৎজা। খুঁতখুঁতে প্রমথ মানল।

"নাঃ, ভালো মালই এনেছেন। তারপর পিৎজা-বক্সের ডালা উলটে নাম দেখে বলল, টমি'জ। আগে খেয়েছিস?"

একেনবাবু ইতিমধ্যে ফিরে এসেছেন। বললেন, "কেমন লাগছে স্যার?"

"দারুণ, কোত্থেকে খবর পেলেন দোকানটার?"

"বল্লভ শাহ-র কাছ থেকে।"

"বল্লভ শাহ! লোকটা তো সাসপেক্টেড মার্ডারার! তাঁর সঙ্গে আপনার এত দহরম-মহরম শুরু হল কবে থেকে?" প্রমথ প্রশ্ন করল।

"দহরম-মহরম নয় স্যার, হঠাৎ দেখা টাইমস স্কোয়ারে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় ভালো পিৎজা পাওয়া যায়। উনি বললেন টমি'জ। লোকে চেনে ডমিনোজ, পিৎজা হাট — এইসব। কিন্তু অথেন্টিক পিৎজার স্বাদ চাইলে টমি'জ-এর জুরি নেই।"

"অথেন্টিক মানে কি? পিৎজা তো এক এক জায়গায় এক এক ধরণের— সিসিলিয়ান স্টাইল, নেওপলিটান, পিৎজা রোমানা — কিসের কথা বলছেন?"

"তা তো বলতে পারব না স্যার। উনি বললেন অথেন্টিক, আমিও সেটাই রিপিট করলাম।"

"অথেন্টিক হোক বা না হোক, অতি উত্তম পিৎজা," আমি বললাম। "তা বল্লভ শাহর খবর কি? পুলিশ যে এখনও ওঁকে ধরেনি, কী ব্যাপার?"

"বেশ দুশ্চিন্তাতে আছেন স্যার। ওঁর ধারণা কেউ ওঁকে চক্রান্ত করে ফাঁসাচ্ছে।"

"সেই কেউ-টা কে?"

"সেটা উনি জানেন না স্যার। তবে কয়েকটা ইন্টারেস্টিং কথা বললেন।"

"যেমন?"

"রোহিত রয়ের বান্ধবী মিস আইলিন সম্পর্কে বেশ কিছু খবর জানলাম।"

"কী জানলেন?"

"দাঁড়ান, আগে একটা পিৎজা নিই।"

একেনবাবু প্লেটে পিৎজার একটা স্লাইস চাপিয়ে তার উপর ক্রাশড রেড-পেপার ছিটিয়ে লালে লাল করে কামড় বাসালেন।

তারপর চিবোতে চিবোতে বললেন, "মিস আইলিন স্যার, সত্যিই একটা ক্যারেক্টার।"

আমরা দুজনেই সপ্রশ্নে ওঁর দিকে তাকালাম।

"তিনি স্যার প্যারালাল প্রেম চালাচ্ছিলেন।"

"কার সঙ্গে?"

"নামটা বললেন না, তবে লোকটা ওয়ালস্ট্রিটের এক ব্যাঙ্কার।"

"মাই গড! রোহিত রয় জানতেন?"

"জানতেন কিনা বল্লভ শাহ শিওর নন। বোধহয় সন্দেহ করছিলেন।"

"সেটা ভাবার কারণ?"

"কারণ বল্লভ শাহকে মিস্টার রয় কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে মাঝে মাঝেই মিস আইলিন অদৃশ্য হয়ে যান। বল্লভ শাহর মতে, একটু বিরক্ত হয়েই।"

"বল্লভ শাহ কী করে জানলেন যে মিস আইলিন আরেকজনের সঙ্গে প্রেম করছেন?"

"সেটা বললেন না, তবে লোকটা সত্যিই রিসোর্সফুল স্যার।"

"আপনার কি মনে হয় মিস আইলিন এখন সেই ব্যাঙ্কারের কাছেই আছেন?"

"পসিবল স্যার।"

"বল্লভ শাহ কি পুলিশকে সেটা বলেছেন?"

"মনে হয় না স্যার। তবে ভালো করে সব কিছু জানতে পারব কালকে। আমার কাছে আসছেন কোনো একটা ব্যাপারে পরামর্শ নিতে।"

"আমার তো মনে হয় আপনার চেয়ে একজন উকিলের পরামর্শ নেওয়াটাই ওঁর পক্ষে আশু প্রয়োজন," প্রমথ বলল।

"তাও নিশ্চয় নিচ্ছেন স্যার।"

তারপর মিস আইলিন আর বল্লভ শাহর প্রসঙ্গ থেকে হঠাৎ এক-শো আশি ডিগ্রী ঘুরে একেনবাবু প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা স্যার, মিস সুজাতা কতদিন মাসিমার বাড়িতে আছেন?"

"হঠাৎ এই প্রশ্ন?"

"এমনি মনে হল স্যার। মাসিমা ওঁকে খুবই পছন্দ করেন। নিশ্চয় অনেক দিন ধরে আছেন।"

"ইউ মে বি রাইট," আমি বললাম। "ফ্র্যাঙ্কলি এ নিয়ে কোনোদিন সুপ্রভামাসির সঙ্গে কথা হয়নি। আমার জিজ্ঞাসা করার কোনো কারণও ঘটেনি।"

"তা তো বটেই স্যার।"

"আপনি ফোন করে জিজ্ঞেস করুন না। প্রশ্নটা যখন মাথায় জেগেছে, ওটা না জানা পর্যন্ত তো ছটফট করবেন!"

"আরে না স্যার। হঠাৎ মনে হল কথাটা, এদেশে তো এরকম সচারাচর দেখা যায়

না।”

হঠাৎ হঠাৎ একেনবাবুর কিছু মনে হয় না, কিন্তু এ নিয়ে আর প্রশ্ন করা হল না।

প্রমথ বলল, “ঐ যাঃ, আপনাকে বলতে গেছি স্টুয়ার্ট সাহেবের অফিস থেকে একটা মেসেজ আপনাকে দিতে বলেছে।”

“কী স্যার?”

“কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে যে চিঠিটার খোঁজ আপনি করতে বলেছিলেন, তার খবর ওরা নিয়েছে। উত্তর হল, হ্যাঁ, কিছুদিন আগে ইন্ডিয়া থেকে একটা চিঠি এসেছিল প্রফেসার রিচার্ড সাহেবের কাছে।”

“থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।”

“এর অর্থটা কি? আমি তো মাথামুন্ডু কিছুই বুঝলাম না।”

“সেটা উনিই জানেন,” প্রমথ বলল। “নিশ্চয় পরে একদিন জানতে পারব, যদি দয়া করেন।”

“আপনারা সত্যি স্যার, এত লেগপুল করেন।” কিন্তু মনে হল একেনবাবু খবরটা পেয়ে বেশ খুশি হয়েছেন। জিজ্ঞেস করলাম, “ব্যাপারটা কি?”

“বলব স্যার, বলব।”

## ।। ২৫ ।।

পরদিন সকালে যে ভদ্রলোক একেনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এলেন, তাঁকে আমি শান্তিনিকেতনে যাবার পথে দেখেছি। গলায় এখনও সেই BS লকেট লাগানো নেকলেস। বল্লভ শাহও আমাকে দেখে অবাক হলেন। “আপনাকে আগে কোথায় দেখেছি বলুন তো?”

“শান্তিনিকেতনে যাবার পথে।”

“ও ইয়েস, আপনার মেমারি তো ভীষণ শার্প!”

“না, আমার মেমারি খুবই বাজে। কিন্তু আপনার গলার নেকলেসটা যে দেখেছে, তার পক্ষে ওটা ভুলে থাকা কঠিন।”

“এটা ঠিকই বলেছেন। এই বুলশিট নেকলেসের জন্য আমাকে অনেকেই খ্যাপান। কিন্তু কি করব বলুন, পিতৃপুরুষের দেওয়া নামটাকে তো অস্বীকার করতে পারি না। বাই দ্য ওয়ে, আমি বল্লভ শাহ।”

আমিও নিজের নাম বললাম।

ইতিমধ্যে একেনবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। “আরে আরে, আসুন স্যার আসুন। আমি ভেবেছিলাম আপনি একটু দেরি করে আসবেন।”

“আরেকটু দেরিতেই আসার কথা ছিল, কিন্তু সকালের কাজটা চট করে মিটে গেল। তাই ভাবলাম সময় নষ্ট করে আপনার কাছেই চলে আসি।”

“ভালো করেছেন, এসেছেন। একটু কফি বানাই?”

“সিওর, জাস্ট ব্ল্যাক।”

আমি একেনবাবুকে বললাম, "আপনারা বসুন, আমি বানাচ্ছি।"

"আরে না না স্যার, এটা একটা কথা হল।" একেনবাবু ব্যস্ত সমস্ত হয়ে কফির জল চড়ালেন।

ইনস্ট্যান্ট কফি। জলটা গরম করতে যে সময়টুকু। কফি নিয়ে আমরা সবাই বসলাম। একেনবাবু বল্লভ শাহকে বললেন, "আপনি স্বচ্ছন্দে বাপিবাবুর সামনে যা বলার বলতে পারেন। আমরা এক সঙ্গে কাজ করি।"

একেনবাবু সব সময়েই এই সম্মানটা আমাকে আর প্রমথকে দেন, যদিও রহস্য সন্ধানে আমার বা প্রমথের কন্ট্রিবিউশন তিল পরিমাণও নয়। একেনবাবুকে এ নিয়ে বললে বলেন, "স্যার, উইদাউট ইউ টু, আই ডোন্ট এক্সিস্ট।" আর এমন নাটকীয় ভাবে কথাটা বলেন যে তার উপর কিছু বলতে পারি না। প্রমথর অবশ্য বলতে আটকায় না। "জানি, জানি, আমাদের কন্ট্রিবিউশন হল আমার রান্না আর বাপির গাড়ি।"

"কী যে বলেন স্যার, গাড়ি তো ভাড়া করলেই পাওয়া যায়, আর খাবারও রেষ্টুরেন্টে মেলে।"

"কিন্তু তার জন্য গাঁটের পয়সা লাগে, সেখানেই তো আপনার মুশকিল!"

"না না স্যার, আপনাদের সঙ্গে আলোচনায় কত যে ক্লু পাই, তা আপনাদের বলে বোঝাতে পারব না।"

এগুলো কিন্তু বেশ জেনুইনলিই উনি বলেন মনে হয়। সে কথা থাক।

বল্লভ শাহ একটু বোধহয় অস্বস্তি বোধ করছিলেন। বললেন, "এটা একটু ডেলিকেট ব্যাপার।"

একেনবাবু বললেন, "সেটা আমাকে বলাও যা, বাপিবাবুকে বলাও তাই। আপনি না চাইলে, কাক-পক্ষীও জানতে পারবে না।"

একেনবাবু অবশ্য কাক-পক্ষী বলেননি। কাকের ইংরেজি শব্দটা বোধহয় মনে পড়েনি, তাই শুধু পাখি বলেই ম্যানেজ করলেন।

"অলরাইট," বলে বল্লভ শাহ শুরু করলেন। "দেখুন আমি কতগুলো ব্যাপার জানি, যার সঙ্গে রোহিত রয়ের মৃত্যুর যোগ থাকতে পারে। কিন্তু পুলিশকে বলিনি। আই অ্যাম অলরেডি ইন ডিপ ট্রাবল উইথ দেম। আমি যাই বলি, উলটো ভাবে দেখবে।

আপনাকে বলছি, কারণ আমি জানি আমার অবস্থাটা বিবেচনা করে পুলিশের উপর আপনার যা ইনফ্লুয়েন্স সেটা অন্ততঃ আমার জন্য ব্যবহার করবেন।"

"আপনি নির্ভয়ে বলুন স্যার। আমি যতটুকু করতে পারি নিশ্চয় করব।"

"সেই জন্যেই আপনার কাছে এলাম," বলে বল্লভ শাহ, তাঁর কাহিনি শুরু করলেন—

"ডিসেম্বররের মাঝামাঝি আমার স্পেশালিটি স্টোরে একজন লোক আসে। মাথায় টুপি, চোখে কালো চশমা, মুখ-ভর্তি গোঁপ-দাড়ি। আমি অবশ্য তাকে দেখিনি। আমার সেলসম্যান দিলীপ-এর কাছে যে বর্ণনা শুনেছিলাম, সেটাই বললাম। লোকটা দিলীপকে বলে, তাকে একটা বাক্স এনে দিতে হবে। বাক্সটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের একটা জায়গায় আছে।"

কথাটা শুনেই আমি একেনবাবুর দিকে তাকালাম। একেনবাবুর মুখ ভাবলেশহীন। বল্লভ শাহ তখন কফিতে চুমুক দিতে ব্যস্ত, তাই আমার এই তাকানোটা খেয়াল করলেন না।

তিনি বলে চললেন, "লোকটার রিকোয়েস্ট শুনে দিলীপ অবাক। দিলীপ লোকটাকে বলে এভাবে কোনো জিনিস আমাদের কোম্পানি আনায় না। আমাদের বিক্রির জিনিস

সবই আসে আমাদের নিজস্ব সাপ্লায়ারদের কাছ থেকে। কিন্তু লোকটা নাছোরবান্দা। বলে, এর জন্য সে দু'হাজার ডলার পর্যন্ত দিতে রাজি আছে। দিলীপ তখন আমাকে ফোন করে। প্রথমে রাজি হইনি, মনে হচ্ছিল এর মধ্যে নিশ্চয় কোনও ঝুট-ঝামেলা আছে। ফোনে লোকটার সঙ্গে কথা বলি। লোকটা বলে যে এটা কাঠের বাক্স, এর মধ্যে কিছুই নেই। আমার লোক বাক্স খুলে দেখে নিতে পারে। এটা ওদের ফ্যামিলির পুরোনো স্মৃতি-জড়িত একটা বাক্স, চাপে পড়ে বহু বছর আগে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল। এখন ফ্যামিলির সবাই সেটা ফিরে পেতে চায়।

"ভেবে দেখলাম, একটা ছোটো বাক্স এনে যদি দু'হাজার ডলার পাওয়া যায়, তাহলে মন্দ কি। আর যে লোকটা এভাবে দু'হাজার ডলার খরচা করতে চাইছে, সে নিশ্চয় মালদার লোক। আমি তখন দিলীপকে ফোনটা দিতে বলি। দিলীপ ফোন ধরতে ওকে বলি, পাঁচশো ডলার অ্যাডভান্স নিতে, আর চেষ্টা করতে লোকটাকে যদি আর কিছু বিক্রি করতে পারে। তবে দিলীপকে তা বলার দরকার ছিল না, ও ইতিমধ্যেই লোকটার হাতে পিতলের একটা বুদ্ধমূর্তি ধরিয়েছে। দিলীপ তিন হাজার চেয়েছিল ওটার জন্যে। লোকটা অনেক নেড়েচেড়ে হাজার ডলার দিতে রাজি হয়েছে। তবে এই চুক্তিতে যখন বাক্সটা হাতে আসবে, তখনই মূর্তিটা কিনবে। পিতলের ঐ মূর্তিটা আমি তিনশো ডলার পেলেও বেচতাম। তাই দিলীপকে বললাম হাজার পেলে ওর কমিশন দুশো ডলার আর অর্ডার বইয়ে লোকটার নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর লিখে রাখতে। পরে জানতে পারলাম, লোকটার নাম ঠিকানা দেয়নি; তবে ক্যাশ অ্যাডভান্স করে ব্ল্যাঙ্ক রসিদ নিয়ে চলে গেছে। আমার তখনই খটকা লাগল। দিলীপকে বললামও কাজটা ঠিক ভালো বলে মনে হচ্ছে না। যাই হোক, মানি ইজ মানি। দিলীপ বলল, লোকটাকে দিলীপ কোথাও দেখেছে, বিশেষ করে গলার স্বর যেন চেনা চেনা। কিন্তু ঠিক মনে করতে পারছে না। দিলীপের কাছে বাক্সটার মোটামুটি একটা সাইজ আর কোথায় সেটা পাওয়া যাবে, লোকটা লিখে দিয়ে গেছে; শিশিরবাবু বলে শান্তিনিকেতনের একজন লোকের বাড়ি থেকে।" বল্লভ শাহ আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি শিশিরবাবুকে চেনেন?"

একেনবাবুর মুখে কোনও বৈকল্য নেই। আমি একটু থতমত খেয়ে উত্তর দিলাম, "না।"

মনে হল, বল্লভ শাহ হয়তো শিশিরবাবুর মৃত্যুর কথা জানেন না, নইলে এভাবে এত সহজে আমাদের কাছে কথাগুলো বলতেন না। অথবা উনি অদ্ভুত ভালো অ্যাক্টিং করছেন অন্য কোনো উদ্দেশ্যে।

বল্লভ শাহ বলে চললেন, "যাই হোক, আমি রতনলাল বলে একজন লোককে চিনতাম। সে শান্তিনিকেতনের কাছে থাকে। তাকে ফোন করে বললাম, শান্তিনিকেতনে শিশিরবাবু বলে এক ভদ্রলোক থাকেন, তাঁর বাড়িতে একটা পুরোনো কাঠের বাক্স আছে। সেটা যেন ও জোগাড় করে আমার জন্য রাখে। তারজন্য পাঁচ হাজার টাকা পাবে। আমার দেশে অন্য কাজ ছিল। সেগুলো শেষ করে আমি শান্তিনিকেতনে যাই। তখনই..." আমাকে দেখিয়ে বললেন, "এঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। বাক্সটা সেদিনই পাওয়া গেল। খুবই পুরোনো, অযত্নে রাখা একটা বাক্স। যদিও সাইজটা মোটামুটি মিলে যাচ্ছে, কিন্তু এই বাক্সের জন্য কেউ দু'হাজার ডলার খরচা করতে পারে বলে আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। রতনলালকে বললাম, 'এটা সেই বাক্স নয়।' রতনলাল আমতা আমতা করল। কিন্তু তখন নতুন করে বাক্স খোঁজার সময় নেই। ইন্ডিয়া থেকে আমি যে প্লেনে ফিরছি, রোহিতও সেই প্লেনে ছিল। রোহিত আমার অনেক দিনের বন্ধু। কিন্তু তখন রোহিতকে এ

বিষয়ে কিছু বলিনি।

"কয়েকদিন বাদে রোহিত আমার দোকানে এল। কথায় কথায় ওকে এই গল্পটা করে বাক্সটা দেখালাম। রোহিত একটা অদ্ভুত কথা বলল। বলল, এই বাক্সটার কথা ও জানে, এটা কাউকে না দিতে। আমি পড়লাম বিপদে। আমি অ্যাডভান্স টাকা নিয়েছি। কী ভাবে সেই খদ্দেরকে ফেরাই! রোহিত আমার সমস্যাটা বুঝতে পেরে বলল, "ওকে বলে দাও তুমি ওটা পাওনি।" আমি বললাম, "তা কি করে হয়, লোকটা দিলীপকে গতকাল ফোন করেছে। দিলীপ তাকে বলেছে যে মাল এসে গেছে।" রোহিত বলল, "ঠিক আছে, আই উইল ডিল উইথ হিম। তুমি শুধু ওকে ওর টাকাটা ফেরত দিয়ে দাও। আর বলে দাও যে বাক্সটার জন্য আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে।"

"রোহিত আমাকে একটা ঝামেলার মধ্যেই ফেলল। এই জিনিসটা জোগাড় করতে আমার অল্পই খরচ হয়েছে। সেটা নষ্ট হওয়া বড়ো কথা নয়। কিন্তু দোকানের সুনাম বলেও তো একটা ব্যাপার আছে। এদিকে রোহিত আমার বহুদিনের বন্ধু এবং ভালো খদ্দেরও। আমি ইতঃস্তত করছি দেখে রোহিত বলল, 'আরে বল্লভ, যেটা যার প্রাপ্য নয়, সে সেটা পাবে কেন? তুমি ওর কাছ থেকে দু'হাজার পেতে, আমিও না হয় তাই দেব। তবে এক্ষুণি দিতে পারব না, দিন কয়েক সময় লাগবে।' আমি বললাম, 'ঠিক আছে।' দিলীপকে ডেকে বললাম, লোকটা এলে ওর অ্যাডভান্সডটা ফেরত দিয়ে দিতে। ঝামেলা করলে রোহিতের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। লোকটা কয়েকদিন বাদেই এল। এসে যখন শুনল ওর বাক্সটা আর কাউকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তখন সে চটে আগুন! দিলীপ অনেক বোঝাবার চেষ্টা করল, কে কার কথা শোনে। বলল, 'তোমার মালিককে ডাকো।' দিলীপ বলল যে মালিকের কাছে জিনিসটা নেই, চাইলে রোহিত রয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। লোকটা তখন অশ্রাব্য কুশ্রাব্য গালাগাল করে চলে গেল। সেই রাতে আমি আমার আরেক বন্ধু বাবুর কাছে গিয়েছিলাম। ও টাকা পয়সা নিয়ে ভীষণ সমস্যায় পড়ে আমার কাছে কিছু ধার চেয়েছিল সেটা দিতে।"

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "আচ্ছা, এই বাবু কি বাবু পিন্টো?"

"হ্যাঁ, আপনি চেনেন?"

"চিনি মানে একবার দেখা হয়েছে।"

একেনবাবু বললেন, "আমার তো ধারণা ছিল ওঁর বিজনেস খুব ভালো চলছে!"

"তা চলছে। কিন্তু শেয়ার মার্কেটে মার্জিন-ট্রেডিং করতে গিয়ে প্রচুর লোকসান করেছে। যাই হোক, রোহিতও সেই বিল্ডিং-এ থাকে। আমি ফেরার পথে রোহিতের অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে রোহিতকে বললাম, সেই লোকটা এসে অনেক গালিগালাজ করে গেছে। রোহিত আমলই দিল না। এরপর বেশ কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে আমি বাড়ি চলে আসি। আর তার পরদিনই রোহিত মারা যায়। আমি অবশ্য সেটা জানতাম না। সেদিন সকালেই দু'দিনের জন্য আমি ফিলাডেলফিয়াতে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দিলীপের কাছে সব ঘটনা শুনলাম। এর ক'দিন বাদে, আমি দোকানে যাই। দিলীপ সেখানে ছিল না। আমার আরেকটি কর্মচারী আছে, তার নাম শরৎ। সে দিলীপ যখন থাকে না, তখন দোকানটায় বসে। শরৎ বলল, দিলীপ নাকি ধরতে পেরেছে যে কোন লোকটা সেদিন বাক্সের খোঁজ করছিল। শরৎকে আমি চাকরি দিয়েছি বটে, কিন্তু ও অনেক সময়েই ভুলভাল বোঝে — উলটোপালটা করে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কে সেই লোক?' সেটা শরৎ বলতে পারল না। তবে বলল, দিলীপ নাকি তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। সে অস্বীকার করেছে, কিন্তু দিলীপ বলেছে ও ভুল করেনি। কিন্তু, তারপর আমিও কতগুলো

ঝামেলা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, দিলীপের সঙ্গে কথা এ নিয়ে আর কথা হয়নি। এরপর হঠাৎ দিলীপও খুন হল।” বলে বল্লভ শাহ চুপ করলেন।

“আপনার মনে হয় স্যার, এই দুটো মৃত্যুর সঙ্গেই সেই মিস্ট্রিম্যান জড়িত?”.

“সেটা আমি বলতে পারব না। আমি শুধু যা জানি বললাম।”

একেনবাবু বললেন, “আপনি কি জানেন স্যার যে শিশিরবাবু মারা গেছেন?”

“ও মাই গড, না তো!” বল্লভ শাহর মুখে মনে হল অকৃত্রিম বিস্ময়!

“ওঁর বাড়িতে যারা চুরি করতে ঢুকেছিল, তারাই ওঁর মৃত্যুর জন্য দায়ী।”

“চুরি করতে ঢুকেছিল!”

“হ্যাঁ, আপনার বাক্সটা।”

“কী বলছেন, আমি তো রতনলালকে ওটা কিনে রাখতে বলেছিলাম!”

“আপনার রতনলাল চুরিটাই শস্তা এবং সহজ পথ ভেবেছিলেন।”

বল্লভ শাহর মুখটা একেবারে সাদা হয়ে গেল! আবার “ও মাই গড,” বলে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, “আই অ্যাম ইন ডীপ শিট।”

আমরা চুপ।

বল্লভ শাহ হঠাৎ উঠে একেনবাবুর হাতদুটো ধরে বললেন, “আমাকে আপনার বাঁচাতে হবে মিস্টার সেন, একটা কথাও আমি মিথ্যে বলছি না, বিশ্বাস করুন।”

রাতে প্রভাসের কাছ থেকে একটা ইমেইল পেলাম। লিখেছে পুলিশ রতনলাল বলে একজন লোককে গ্রেফতার করেছে। রতনলাল স্বীকার করেছে দুজন রিকশাওয়ালাকে সে শিশিরবাবুর বাড়িতে একটা বাক্স চুরি করতে পাঠিয়েছিল। সেইসময়েই ধাক্কাধাক্কিতে শিশিরবাবু মৃত্যু হয়। তবে রতনলালের বক্তব্য, তার নিজের জন্য নয়, আরেকজন তাকে বাক্সটা জোগাড় করে দিতে বলেছিল। বাক্সটা কেন এত বহুমূল্য সেটা পুলিশ বুঝতে পারছে না, তবে সেই আরেকজন কে পুলিশ জানে। ইন্টারপোলে খবর পাঠানো হয়েছে শুনে প্রভাসের ধারণা এর সঙ্গে কোনো বিদেশি চক্রের যোগ আছে। লিখেছে, শান্তিনিকেতন আর শান্তিনিকেতন নেই, চুরি-নিকেতনে দাঁড়াচ্ছে!

## ।। ২৬।।

বল্লভ শাহর কাহিনি কতটা সত্য আর কতটা বানানো সেটা ভাবার বিষয়। প্রমথ বাড়ি ফিরে সব কিছু শুনে ওর সুচিন্তিত মত দিল, “এটা একটা ইলাবোরেট মার্ডার প্লট। উনি ঠিক করেছিলেন রোহিত রয় আর দিলীপকে মারবেন। তার প্রিপারেশন করতেই শান্তিনিকেতনে একটা বাক্স চুরি করালেন। আর সেটা চুরি করালেন একটা মিস্ট্রিম্যানের জন্যে, যাকে কেউই চেনে না! দিস ইস ইনক্রেডিবল! বল্লভ শাহ কি এতই কাঁচা লোক যে কেউ ওঁকে একটা বাক্স নিয়ে আসতে বললেই উনি নিয়ে আসবেন? বাক্সটাতে তো ফলস বটম থাকতে পারত — স্মাগলাররা তো এইভাবেই হিরে-মুক্তো চালান করে।”

“ইউ হ্যাভ এ পয়েন্ট স্যার।”

"আরও দেখুন, এই ঘটনাটা যারা জানে, মানে এই মিস্ট্রিম্যানের ব্যাপারটা— তারা কনভিনিয়েন্টলি কেউই বেঁচে নেই। সুতরাং তাদের প্রশ্ন করে এই গল্পের সত্যতা বার করা যাবে না।"

আমি বললাম, "দ্যাট্‌স নট টোটালি ট্রু, শরৎ না কে, সে তো আছে।"

"সেটাও বল্লভ শাহ ক্লিয়ার করে রেখেছেন, শরৎ উলটোপালটা বকে বলে।"

আমাকে মানতেই হবে প্রমথর কথাগুলো খুবই যুক্তিপূর্ণ।

একেনবাবুও বললেন, "আপনি স্যার সত্যি খুব ইনসাইটফুল কথা বলেন।" বলেই উঠে পড়লেন।

আমি বললাম, "কোথায় চললেন?"

"এই একটু ঘুরে আসি স্যার, স্টুয়ার্ট সাহেব ছুটি থেকে ফিরেছেন, একটু মুখ দেখিয়ে আসি। তারপর একটু লাইব্রেরিতেও যাব।"

"তাড়াতাড়ি ফিরবেন," প্রমথ বলল। "আজকে কষা মাংস রাঁধব।"

"ওঃ, আপনি স্যার, সত্যি একজন মহাপুরুষ!" বলে একেনবাবু অদৃশ্য হলেন।

প্রমথ আজ নিজেই নিজেকে ছাড়িয়ে গেছে। সারা অ্যাপার্টমেন্টে কষা-মাংসের যে খুশবাই বেরিয়েছে, তাতেই অর্ধেক খাওয়া যায়! তার ওপর আমায় বলেছে পুরি বানাতে সাহায্য করতে, যেটা আমার পক্ষে বাস্তবিকই একটা রেয়ার প্রিভিলেজ। প্রমথর রাজত্বে আমি বড়োজোর শাকসবজি এবং বাসনপত্র ধোয়া-টোয়ার কাজ পাই। তবে ওর এই উৎসাহের কারণটা একটু বাদেই আমার কাছে স্পষ্ট হল। আমাদের কাছে পুরির গল্প শুনে ফ্রাইন্সস্কা পুরি খেতে চেয়েছে, তাই প্রমথর এই উদ্যোগ। আমার উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আটার সঙ্গে অল্প একটু ময়দা মিশিয়ে জল দিয়ে সেটাকে মাখা। নুন-টুন আর বোধহয় একটু মার্জারিন — যাই হোক, যা দেবার সেটা প্রমথই দিয়েছে। আমার যেটা দেওয়ার, সেটা শুধু ম্যানুয়াল লেবার। কিন্তু তার ওপরও প্রমথ খবরদারি চলছে। "এটা কি হচ্ছে, তুই কি কলম পিষছিস? একটু মাসল পাওয়ার দে।"

নিতান্ত খাবার লোভে অপমানগুলো হজম করছি। ভাগ্যক্রমে এই সময়ে ফ্রান্সিস্কা এসে গেল। ওর সঙ্গে প্রমথ সুবিধা করতে পারে না। আমি বুদ্ধি খাটিয়ে চট করে আমার দায়িত্বটা ওর ঘাড়ে চাপালাম। এরপর প্রমথ যেই 'ওফফ ওরকম করে নয়' বলতে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সিস্কা ধমক, "ডোন্ট বি সিলি, আমি অনেক ডো বানিয়েছি, জাস্ট হ্যাভ সাম পেশেন্স।"

সাধে কি বলে নারীশক্তি! একেনবাবুর ভঙ্গিতে বলতে হয়, "ম্যাডামের পায়ে শতকোটি প্রণাম।' ফ্রান্সিস্কা শুধু আটা ভালো মাখল না, লিভার লাগান প্রেশার প্লেট দিয়ে চমৎকার গোল গোল করে পুরিও বেলে ফেলল। পুরি ভাজা আরম্ভ হওয়ার মিনিট কয়েকের মধ্যেই একেনবাবু এলেন। খাবারের গন্ধে দেখলাম মুখ একেবারে উদ্ভাসিত।

খেতে বসে আমি একেনবাবুকে বললাম, "পুরিগুলোর জন্য কিন্তু সব ক্রেডিট ফ্রান্সিস্কার।"

"তাই নাকি! সত্যি ম্যাডাম ফ্রান্সিস্কা, এরকম পারফেক্ট গোল গোল পুরি কিন্তু আমি অনেকদিন দেখিনি, একেবারে অ্যামেজিং!"

প্রমথ বলল, "আপনার মতো নিমক-হারাম দুনিয়াতে নেই। কেন, আমি আপনাকে আগে গোল গোল পুরি খাওয়াইনি?"

"কি মুশকিল স্যার, নিশ্চয় খাইয়েছেন। তবে অনেকদিন খাওয়াননি।"

"আর এই যে মাংস খাচ্ছেন — সেটার কথা তো বললেন না!"

"আমি তো মাংসের কথায় আসছিলাম স্যার, আপনি তো তার সুযোগই দিলেন না।"

"থাক, আর আসতে হবে না।"

ফ্রান্সিস্কা আমায় জিজ্ঞেস করল, "হচ্ছেটা কি?"

আমি বললাম, "প্রমথর হিংসা হচ্ছে যে একেনবাবু তোমার পুরির প্রশংসা করছেন, কিন্তু প্রমথর রান্নার প্রশংসা করেননি।"

ফ্রান্সিস্কা প্রমথর দিকে তাকিয়ে ভারি মিষ্টি করে হেসে বলল, "কাম অন, ইউ নো ইউ হ্যাভ ডান এ সুপার জব।"

খাওয়া দাওয়ার পর ফ্রান্সিস্কা কফি বানাতে বসল। মেয়েটা সত্যিই অপূর্ব কফি বানায়। সেই একই কফি বিন, একই গ্রাইন্ডার আর একই কফি-মেকার ব্যবহার করে। কিন্তু কেন যে এত ভালো স্বাদ হয় ভগবান জানেন। প্রমথ ভালো কফি বানায়। কিন্তু ফ্রান্সিস্কার কাছে লাগে না। একেনবাবু অবশ্য ইনস্ট্যান্ট কফি তৈরি করা ছাড়া অন্য ভেঞ্চারের মধ্যে পা দেন না। ফ্রান্সিস্কা কফি বানাতে বানাতেই জিজ্ঞেস করল, "ডিটেকটিভ, তোমার মার্ডার মিস্ট্রি সলভ হল?"

একেনবাবু বললেন, "না ম্যাডাম, এখনও একটু খটকা আছে।"

"কি রকম?"

"মানে যে লোকটা মার্ডার করেছে বলে আমরা সবাই মনে করছি, সে হয়তো করেনি যদি প্রমথবাবু যা বলছেন, তা সত্যি হয়।"

"কী যা-তা বকছেন মশাই, আমি আবার কি বললাম?" প্রমথ অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

"ঐ যে স্যার আপনি বললেন, ফলস বটমে মণি-মুক্তো লুকোনো থাকার কথা। শিশিরবাবুর বাক্সে যদি সত্যিই মণি-মুক্তো লুকোনো থাকে, তাহলে সেই বাক্স দু'হাজার ডলার খরচা করে আনতে বলার অর্থ হয়। তাহলে বল্লভ শাহর গল্পটা একেবারে বানানো নাও হতে পারে। সেইজন্যই বলছিলাম এখনও খটকা আছে।"

"আপনি কি গাঁজা-ফাঁজা খাচ্ছেন নাকি?"

"কী যে বলেন স্যার, এই তো পুরি আর মাংস খেলাম!"

আমি বললাম, "দাঁড়ান, আপনি নিশ্চয় কিছু জানেন, যা আমাদের বলছেন না।"

"কী মুশকিল স্যার। আমি যা জানি, আপনারাও তাই জানেন।"

"ওসব ছাড়ুন," প্রমথ বলল, "বটম লাইনটা কি?"

"বটম লাইন হল স্যার, পুলিশ মনে হচ্ছে বল্লভ শাহকেই ধরবে।"

"আর আপনি?"

"আমি স্যার এখনও একটু কনফিউজড।"

"ডিটেকটিভ, ইউ আর অলওয়েজ কনফিউজড," বলে ফ্রান্সিস্কা প্রথম কফির কাপটা একেনবাবুর হাতে ধরিয়ে দিল। একেনবাবুকে ফ্রান্সিস্কা খানিকটা শিশুর মতোই দেখে।

"থ্যাঙ্ক ইউ, ম্যাডাম ফ্রান্সিস্কা, " কাপটা হাতে নিয়ে একেনবাবু অননুকরণীয় ভঙ্গিতে মাথা নোয়ালেন।

"ইউ আর ভেরি ওয়েলকাম, ডিটেকটিভ।"

আমরা সবাই কফি নিয়ে সোফায় বসার পর একেনবাবু বললেন, "ভালো কথা স্যার, মিষ্টার পিন্টোর কাছে একটা মেসেজ পেলাম। আমি ফোন করিনি বলেই বোধ হয়।"

"আপনি আর যাননি! উনি যে সেদিন আপনাকে বললেন কিছু টিপস দেবেন?"

"সময় পেলাম কোথায় স্যার। কাল যাব ভাবছি, আপনারা আসবেন?"

"যাবেন কিনা ভেবে দেখুন," প্রমথ বলল।
"কেন স্যার?"
"ওই যে শুনলাম ওঁর টাকা-পয়সার টানাটানি চলছে। আপনার গাঁটের পয়সা যদি খসাতে পারেন, সেই জন্যেই নিশ্চয় ফোনটা করেছেন।"
একেনবাবু মনে হল একটু চিন্তিত হয়েছেন। "না স্যার, যাব। আপনারাও আসুন না, জোর করে তো আর পয়সা নিতে পারবেন না।"
"ও, আমরা যাব আপনাকে ওঁর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য?"
"কী যে বলেন স্যার।"
ঠিক হলো আমি আর প্রমথ দুজনেই যাব।
ফ্রান্সিস্কা বলল, "সে কি, আমি যেতে পারি না? আমি জিনিওলজিতে খুব ইন্টারেস্টেড।"
"আপনি আসবেন ম্যাডাম?"
"না ইনভাইট করলে কি করে যাই?"
"আঃ, সে কি কথা, নিশ্চয় আসবেন ম্যাডাম। আমি মিষ্টার পিন্টোকে বলে রাখব, আমরা অনেকে যাব। আমার মনে হয় না ওঁর আপত্তি থাকবে বলে।"
"মোটেই নয়," প্রমথ বলল, "এতগুলো পোটেনশিয়াল ক্লায়েন্ট।"

## ।। ২৭।।

একেনবাবু সকাল ন'টায় বাবু পিন্টোর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিলেন। ফ্রান্সিস্কা সেইজন্য সকাল সকাল এসে হাজির হয়েছে। বাড়ি থেকে যখন বেরোতে যাচ্ছি, তখন একেনবাবুর একটা ফোন এল। "আমি একটু আসছি স্যার," বলে ঘরে গিয়ে উনি ফোনটা ধরলেন। খানিকক্ষণ বাদে বেরিয়ে এসে বললেন, "একটু কফি খাওয়া যাক স্যার কি বলেন?"
প্রমথ ব্যাপারটা আঁচ করল, "বাবু পিন্টো অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যানসেল করলেন বুঝি? আপনাকে মুর্গি বানানো যাবে না, লেট-এ হলেও বুঝছেন।"
"সে সব বোঝার উনি উর্দ্ধে স্যার, হি ইস ডেড।"
"হোয়াট!" প্রমথ চেঁচিয়ে উঠল। আমি আর ফ্রান্সিস্কা হতবাক।
"ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট এক্ষুণি ফোন করে জানালেন।"
"আরেকটা মার্ডার?"
"মনে হয় না স্যার। আমার বিশ্বাস এটা সুইসাইড।"
"সুইসাইড! কী করে বুঝলেন?"
"আগে একটু কফি খেতে হবে স্যার, গলাটা শুকিয়ে গেছে।"
"আর ইউ অলরাইট?" ফ্রান্সিস্কা একটু চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করল।
"আমি ঠিক আছি ম্যাডাম। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা বলতে সময় লাগবে — কফি ছাড়া পারব না।"

"হেঁয়ালি ছেড়ে একটু হিন্ট দিন না, পুরো ব্যাপারটা মানে কি?" প্রমথ প্রশ্ন করলো।

"মানে স্যার, এই সুইসাইড, মার্ডার, চুরি — এইসব।"

"লুকস লাইক ইউ সলভড দ্য মিস্ট্রি!" ফ্রান্সিস্কা সপ্রশংসদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল কথাটা।

"আই থিঙ্ক সো ম্যাডাম। তবে ক্রেডিট আমার একার নয় — প্রমথবাবু আর বাপিবাবুরও অনেক কনট্রিবিউশন।"

কথাটার প্রতিবাদ করার আগেই ফ্রান্সিস্কা কপট রাগের ভান করে বলল, "বাঃ, আমার নয় কেন?"

"কী যে বলেন ম্যাডাম, আপনি হলেন ইনস্পিরেশন। আপনি মিস্ট্রি সলভ করতে না বললে কি মিস্ট্রি সলভড হত?"

"থ্যাঙ্ক ইউ।"

"থাক, ফ্রান্সিস্কাকে আর তেল দিতে হবে না, আমি কফি বানাচ্ছি। কিন্তু না বানানো পর্যন্ত একটা কথা নয়।" হুকুমটা দিয়ে প্রমথ সোফা ছেড়ে উঠল।

"কি মুশকিল স্যার, এইভাবে মৌনভাবে কি করে বসে থাকি?"

"চেষ্টা করুন।" বলে প্রমথ কিচেনে অদৃশ্য হল।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, "কি করে শিওর হলেন, এটা সুইসাইড?"

"বাপি কোনো কোয়েশ্চেন নয়," প্রমথ কিচেন থেকে হুঙ্কার দিল।

"দিস ইস সিলি," ফ্রান্সিস্কা বলল, "এইভাবে চুপ করে বসে থাকা যায় নাকি! ডিটেকটিভ তুমি কিচেনে চলো, সেখানে বলবে। তবে সব কিছু ডিটেইলস-এ বলতে হবে — ফ্রম দ্য বিগিনিং টু দ্য এন্ড।"

"ম্যাডামের হুকুম স্যার, চলুন," আমার দিকে তাকিয়ে একেনবাবু বললেন।

কিচেনে গিয়ে একেনবাবু বললেন, "আসলে মিস্ট্রি তো স্যার একটা নয়, ছিল দু-দুটো — একটা শিশিরবাবুর মৃত্যু আর অন্যটা এখানকার দুটো মার্ডার। এদের মধ্যে যে কোনো যোগ ছিল, সেটা মোটেও ভাবিনি। ফ্র্যাঙ্কলি স্যার, যেদিন জানলাম শিশিরবাবুর মৃত্যুর সঙ্গে প্রভাসবাবু জড়িত নন, ও নিয়ে আর ভাবিওনি। রোহিত রয় খুন হবার আগে পর্যন্ত সময় কাটাচ্ছিলাম রিচার্ডমেসোর ডায়রি পড়ে। যাই বলুন স্যার, জিনিওলজি ব্যাপারটা দরুণ ইন্টারেস্টিং। রিচার্ডমেসো অনেক খেটেছিলেন ফ্যামিলি হিস্ট্রি বানাতে। তবে একটা জিনিস স্যার, সুভদ্রামাসির বাবার দিকটায় উনি নজর দেননি। মায়ের দিকে অনেক ইনফরমেশন আছে, নামের পাশে একটা A+ ও লাগিয়েছেন। বাবাকে দিয়েছেন গোল্লা। হয়তো কিছু খুজে পাননি বলে পাশে একটা কোয়েশ্চেন মার্ক দিয়ে রেখেছেন। বাপিবাবু সেটা শুনে বলেছিলেন, অধ্যাপক মানুষ, নিজেকেও গ্রেড দিয়েছেন। মনে আছে স্যার?"

আমি মাথা নাড়লাম।

"শুধু তাই নয় স্যার, খেয়াল করেছিলেন কিনা জানি না, মাসিমার বাড়িতে রিচার্ডমেসো যে ছবিগুলো বাঁধিয়ে রেখেছিলেন, সেখানেও বাবার সাইডে কারোর কোনো ছবি নেই।"

"করেছি," প্রমথ বলল, "বাপিকে বলেওছি সেকথা। কিন্তু আপনি কি সুভদ্রামাসির জিনিওলজি নিয়ে লেকচার ঝাড়বেন, না মার্ডার সম্পর্কে কিছু বলবেন?"

"বলছি স্যার, বলছি। আসলে এগুলো সবই কানেক্টেড। একটু ধৈর্য ধরুন।"

"ইয়েস, হ্যাভ সাম পেশেন্স," ফ্রান্সিস্কাও একটু বকল প্রমথকে।

"থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম।" একেনবাবু বলে চললেন, "হয়তো স্যার এর পেছনে কোনো

রহস্য ছিল না। রিচার্ডমেসোর আনটাইমলি ডেথই ছিল এর কারণ। অথবা মাসিমার বাবা পিতৃপরিচয়হীন অনাথ। সেক্ষেত্রে অবশ্য এক লাইন ডায়েরিতে লিখতে পারতেন! ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটল, যেটা ম্যাডাম আপনি জানেন না, কিন্তু প্রমথবাবু আর বাপিবাবু জানেন।"

আমি আর প্রমথ দুজনেই তাকালাম একেনবাবুর দিকে।

"সে দিন বাপিবাবু আমাদের সবাইকে কফি না খাওয়ালে আসল ক্লু-টাই হয়তো মিস করে যেতাম।"

"কোনদিনের কথা বলছেন আপনি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"ঐ যে স্যার, যেদিন আপনার বাবার ছবিটা নিয়ে আমরা সবাই বেরোলাম, ফেরার পথে আপনি আমাদের কফি খাওয়ালেন, মনে নেই?"

"তা মনে আছে। কিন্তু তার সঙ্গে ক্লু-র কি সম্পর্ক?"

"মনে পড়ছে, সেদিন কতগুলো ছেলে বাজে বাজে কথা কাচের দেয়ালের উপরে লিখছিল?"

প্রমথ এক কাপ করে কফি সবার হাতে ধরিয়ে একেনবাবুকে বলল, "মশাই, বাপি সুবোধ ছেলে, নোংরা নোংরা কথা ও মনে রাখে না। কিন্তু কথাগুলোর মধ্যে কী এমন ক্লু পেলেন?"

"কথাগুলো নয় স্যার। ওরা বাইরে কাচের ওপর লিখছিল, আর আমি ভেতরে বসে উলটো করে পড়ছিলাম। তখন হঠাৎ খেয়াল হল, 'নীলিন' শব্দটা উলটো করে পড়লে 'নলিনী' হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, অশুদ্ধ ভাবে নিলীন-কে নীলিন লেখা কি বাই চান্স ঘটেছে, না ভেবেচিন্তেই হয়েছে।"

"আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড," ফ্রান্সিস্কা বলল।

সত্যিকথা বলতে কি, আমিও বুঝতে পারছিলাম না, একেনবাবু কিসের কথা বলছেন। কিন্তু তারপরেই মনে পড়ে গেল। আশ্চর্য! উনি ঠিক মনে রেখেছেন শিশিরবাবুর বাড়ির নাম এবং তার ভুল বানানের কথা! প্রমথ অবশ্য ধরতে পেরেছিল। "আমি এক্সপ্লেইন করে দিচ্ছি," বলে সংক্ষেপে শিশিরবাবুর বাড়ির নাম আর ভুল স্পেলিং-এর জাস্টিফিকেশনের গল্পটা ফ্রান্সিস্কাকে বুঝিয়ে দিল।

"ওকে, গো এহেড।"

"শিশিরবাবু বিদগ্ধ লোক স্যার, উনি বানানটা ভুল দেখে শুদ্ধ করার চেষ্টা করবেন না, এটা বিশ্বাস করতে পারিনি। যদিও প্রভাসবাবুকে প্রপার নাউনের বানান নিয়ে একটা বিরাট ব্যাখ্যা উনি দিয়েছিলেন। সেগুলো আসল কারণ ঢাকার চেষ্টা।"

আমি বুঝতে পারছিলাম একেনবাবু কোনদিকে যাচ্ছেন, তাও জিজ্ঞেস করলাম, "আসল কারণ?"

"আসল কারণ স্যার, শিশিরবাবু নিশ্চয় নলিনী নামে কোনো মেয়েকে চিনতেন। নামটা স্ত্রী, মা বা অন্য কোনো পরমাত্মীয়ার হলে, উলটো করে লিখতেন না — ঠিক ভাবে লিখেই স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতেন। উলটো করে লেখার অর্থ বাইরের কাউকে না জানিয়ে একান্ত গোপনে স্মৃতিকে আঁকড়ে রাখা।"

প্রমথও আঁচ করেছিল একেনবাবু কি বলতে চান। "তারমানে নলিনী বলে উনি কাউকে ভালোবাসতেন এবং সেটা ব্যর্থ প্রেম ছিল। এ নিয়ে এত ধানাই পানাই করছেন কেন, সোজা বলে ফেলুন না কথাটা।"

"ঠিকই বলেছেন স্যার। এখন প্রশ্ন হল এই নলিনী মেয়েটি কে? একজন নলিনীর নাম

আমরা এখানে সবাই শুনেছি, যিনি মাসিমা-র মা। তিনি কি এই নলিনী হতে পারেন? হওয়ার সম্ভবনা খুবই অল্প। নলিনী একটা চলতি নাম। শিশিরবাবুর সমসাময়িক বহু মেয়ের নামই নলিনী ছিল। তবু এটা একটা তথ্য স্যার, মনের মধ্যে গেঁথে রইল। তারপর মাসিমার বাড়িতে গিয়ে আমি শুনলাম যে মাসিমা শিশিরবাবুর নাম শুনেছেন— বলা উচিত সম্ভবত শুনেছেন এবং শুনেছেন রিচার্ডমেসোর কাছ থেকে। রিচার্ডমেসোর সঙ্গে শিশিরবাবুর যোগাযোগ থাকবে কী সূত্রে? শিশিরবাবু ইংরেজির অধ্যাপক, রিচার্ডসাহেব অ্যানথ্রপলজির লোক। দেখা কি হঠাৎ করে হয়েছে, না অন্য কারণে? এর মধ্যে মাসিমার কাছে জানলাম রিচার্ডসাহেব জিনিওলজির ব্যাপারে নানান জায়গায় ঘুরেছেন, নানান লোকের সঙ্গে কথা বলেছেন। তার সঙ্গে কি এর কোনো যোগাযোগ আছে? আমি কিন্তু ডায়েরির প্রতিটি লাইন পড়েও শিশিরবাবুর কোনো উল্লেখ দেখিনি। হয়তো অন্য কোনো সূত্রে ওঁদের দুজনের যোগাযোগ হয়েছিল। মোটকথা শিশিরবাবুর প্রিয়া নলিনী সম্পর্কে যে আঁধারে ছিলাম, সেই আঁধারেই রইলাম।

“এরমধ্যে একদিন কথায় কথায় বাপিবাবু বললেন, শূন্যর কনসেপ্ট হিন্দুদের। তখন আমার মাথায় এল, সেইজন্যেই আমাদের অ-আ-ক-খ-র মধ্যে শূন্যের মতো দেখতে কিছু নেই। কিন্তু ইংরেজি অ্যালফাবেট-এ “ও” আর শূন্য দেখতে এক রকম। মনে আছে স্যার?”

আমি বললাম, “মানে আছে, ধরে নিয়েছিলাম ওটা নম্বর এবং স্ক্রিপ্ট সম্পর্কে আপনার নিজস্ব থিওরি।”

“সে যাই হোক স্যার। আপনি যখন বলেছিলেন রিচার্ডমেসো নিজেকে গ্রেড দিয়েছেন, তখন মনে হয়নি। কিন্তু প্রমথবাবুর কথায় খেয়াল হল, এদেশে পরীক্ষায় ভালো করলে A বা A+ দেয় ঠিকই, কিন্তু বাজে নম্বর দিতে গোল্লা তো দেয় না— দেয় D বা F। তাহলে গোল্লা কেন? তার মানে স্যার, উনি নিজেকে গ্রেড করেননি, উনি অন্য কিছু লিখেছিলেন। গোল্লা যদি না হয়, তাহলে ওটাকে হতে হবে অক্ষর O। হঠাৎ A+ আর O উনি কেন লিখতে যাবেন, আর কেনই বা O -র পরে একটা প্রশ্নচিহ্ন দেবেন?”

“ব্লাড-গ্রুপ,” প্রমথ মন্তব্য করল।

“নাঃ স্যার, আপনাদের মাথা ভীষণ সাফ। ঠিকই, দুটোই হল ব্লাডগ্রুপ। তাহলে কি উনি মাসিমার মা আর বাবার ব্লাডগ্রুপের কথা লিখেছেন? কিন্তু তাই যদি হবে তাহলে কোয়েশ্চেন মার্কটার অর্থ কি? বাপিবাবুর কাছে মাসিমার মা আর বাবার মৃত্যুর সময়কার খবর আমরা সবাই শুনেছি। দুবারই রিচার্ডমেসো কলকাতায় ছিলেন। মায়ের বেলায় নিজে একবার রক্তও দিয়েছেন, তাই না স্যার?”

“হ্যাঁ” আমি উত্তর দিলাম।

“মাসিমার বাবার বেলায় সেটা দিয়েছিলেন কিনা জানি না, তবে ধরে নিচ্ছি মাসিমার বাবার ব্লাড টাইপ কি তা নিশ্চয় জানতেন, কারণ ওঁর সার্জারি হচ্ছিল। তিনি মারা যাবার পরে রিচার্ডসাহেব বাপিবাবুকে বলেছিলেন, ‘ট্রুথ ইজ অ্যাস অফন নট নোন।’ কেন, উনি এই কথাটা বলেছিলেন? তার অর্থ কি শুধু মৃত্যুর কারণ না জানা, না আরও একটা কিছু না জানার কথাও অজান্তে রিচার্ডসাহেবের মুখ থেকে বেরিয়েছিল।”

“কী বলছেন মশাই, একটু পরিষ্কার করে বলুন তো?” প্রমথ অধৈর্য হয়ে বলল।

“বলছি স্যার, বলছি। আপনাদের মনে আছে যে মাসিমা একদিন বলেছিলেন ব্লাড নেবার ব্যাপারে উনি হলেন ইউনিভার্সাল রিসিভার। তার মানে ওঁর ব্লাড-টাইপ নিশ্চয় AB। সেক্ষেত্রে মাসিমার মা’র ব্লাড-টাইপ A+ হলে, বাবার ব্লাড-টাইপ O হওয়াটা প্রায়

অসম্ভব।”

“এটা ঠিক বললেন না,” প্রমথ বলল, “ব্লাড টাইপ দিয়ে পিতৃত্ব বিচার করা যায় না। জেনেটিক মিউটেশনের একটা ব্যাপার আছে।”

“সেই জন্যেই তো স্যার বললাম, প্রায় অসম্ভব। তাই ওই কোয়েশ্চেন মার্ক। রিচার্ডমেসোর মনে প্রশ্ন জেগেছিল, তাই উনি সংক্ষেপে নোটবইয়ে লিখে রেখেছিলেন।”

“ইন্টারেস্টিং, চালিয়ে যান,” আমি বললাম।

“বোধ হয় সেই জন্যেই উনি মাসিমার বাবার দিকের ফ্যামিলি ট্রি বানাননি। তবে খুব ইনট্রিগড হয়েছিলেন ব্যাপারটা নিয়ে এবং খোঁজ-খবর নিয়েছিলেন কার সঙ্গে মাসিমার মা'র ছেলেবেলায় পরিচয় ছিল। তার থেকেই শিশিরবাবুর নাম জানতে পারেন এবং ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এগুলো সবই আমার স্পেকুলেশন স্যার।”

এইটুকু বলার পর একেনবাবু কফিটা শেষ করলেন। তারপর বললেন, “আর একটু কফি বানাই?”

ফ্রান্সিস্কা বলে উঠল, “না, মাঝপথে থামা চলবে না। আমি বানাচ্ছি।”

গল্পটা এত জমে গেছে যে আমরা কিচেন থেকে নড়িনি। আমি বললাম, “বুঝতে পারছি আপনি কোনদিকে এগোচ্ছেন। বলতে চান শিশিরবাবুই সুভদ্রামাসির আসল বাবা, তাই তো?”

“তা বলতে পারি না স্যার, তবে হওয়া সম্ভব। কিন্তু ওঁদের মধ্যে যে প্রেম ছিল, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।”

“কী করে?”

“তার প্রমাণ হল শিশিরবাবুর বাড়ি থেকে পাওয়া চিঠিগুলো।”

আমিও ভেবেছিলাম উনি এটাই বলবেন। শিশিরবাবুর সঙ্গে যদি সত্যিই সুভদ্রামাসির মায়ের প্রেম থাকত, তাহলে ওঁর বাড়ি থেকে পাওয়া চিঠিগুলো সুভদ্রামাসির মায়েরই হওয়া উচিত।

“ওগুলো যে সুভদ্রামাসির মায়ের হাতের লেখা চিঠি, সেটা কী করে বুঝলেন?” প্রমথ জিজ্ঞেস করল।

“আপনি আর ম্যাডাম ছিলেন না স্যার, কিন্তু রোহিত রয় যেদিন মারা গেলেন, সেদিন বিকেলে বাপিবাবুর সঙ্গে মাসিমার বাড়ি গিয়েছিলাম। তখন মাসিমা ওঁর মায়ের একটা চিঠি দেখান। তখনই সন্দেহ হয়েছিল স্যার। বাড়িতে ফিরে শিশিরবাবুর চিঠিগুলো দেখে নিশ্চিত হলাম।”

“চিঠি তো আমিও দেখেছি, কিন্তু আমার তো খেয়াল হয়নি!”

“কারণ স্যার, হ্যান্ডরাইটিং নিয়ে আপনি চর্চা করেন না, তাছাড়া আমি যে সব কিছু মেলাচ্ছি — নীলিন, নলিনী, শিশিরবাবু।”

“মেলাচ্ছিলেন কেন, রোহিত রয়ের মৃত্যুর সঙ্গে শিশিরবাবুর মৃত্যুর কী সম্পর্ক ছিল?”

“মেলানো আমার স্বভাব স্যার। এক একটা জিনিস ভাবি, সেটা যখন মিলে যায়, বেশ মজা লাগে। বেশ কেমন জানতে পারলাম শিশিরবাবুর বান্ধবী ছিলেন মাসিমার মা।”

“কোথায় মিল পেলেন আপনি চিঠিগুলোতে?” আমি প্রশ্ন করলাম।

“আপনি যদি এখন মিলিয়ে দেখেন, আপনিও মিল ঠিক খুঁজে পাবেন। দেখবেন,

উকারের টান, ক, ণ, আর কয়েকটা অক্ষর সবগুলো চিঠিতেই হুবহু এক, আর খুবই আনইউস্যুয়াল লেখার ধরনটা।”

“আর বানান ভুলও নিশ্চয় নেই,” প্রমথ যোগ করল, “সেখান থেকে প্রমাণিত হবে

বাপি অন্ততঃ চিঠিটা লেখেনি। বলুন, তারপর কি?"

"তারপর অবশ্য স্যার আমরা জড়িয়ে পড়লাম, মিস্টার রয়ের মার্ডার নিয়ে। আর পুলিশ এগোতে থাকল ভুল দিকে। পুলিশের ধারণা হলো রোহিত রয় লোকদের ব্ল্যাকমেইল করতে শুরু করেছিলেন। যাঁদের ব্ল্যাকমেইল করছিলেন, তাঁদেরই কেউ খুন করেছেন রোহিত রয়কে। আরেকটা সম্ভাবনাও ছিল। সেটা হল, এই ব্ল্যাকমেইলের ব্যাপারে রোহিত রয়ের অন্য পার্টনার ছিলেন। সেই পার্টনার বা পার্টনারদের সঙ্গে রোহিত রয়ের বখরার কোনো গোলমাল লাগায় রোহিত রয় খুন হয়েছেন। আমি কিন্তু অন্য সম্ভবনাগুলোকে বাদ দিতে পারছিলাম না। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে রোহিত রয় ব্ল্যাকমেইলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সেখান থেকে প্রমাণিত হয় না যে তিনি তার জন্যেই খুন হয়েছেন। আর ব্ল্যাকমেইলের ব্যাপারটাও পুলিশের স্পেকুলেশন। ওঁর কম্পিউটারে কতগুলো আপত্তিকর ছবি পাওয়া গেছে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন সেলিব্রেটিও আছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে পুলিশ তো কোনো অভিযোগ পায়নি। এও তো হতে পারে যে আসল খুনি আমাদের ভুল পথে চালনোর জন্য এই ছবিগুলো ঢুকিয়েছে। কিন্তু এর পর খুন হলেন দিলীপ পারেখ, যিনি রোহিত রয়ের সঙ্গে ডিজিটাল ফোটো এডিটিং-এর ব্যাপারে জড়িত। রোহিত রয় ছবির রাফ কম্পোজিশন করে দিলীপ পারেখকে দিয়েই ফিনিশিংটা করাতেন। সেগুলো যেত অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সিতে। কিন্তু শুধু কি বিজ্ঞাপনের জন্যই ওঁরা এটা করতেন?

"দিলীপ খুন হবার পর বলতে গেলে পুলিশ প্রায় নিঃসন্দেহ হল এটি ব্ল্যাকমেইল সংক্রান্ত খুন। স্বভাবতই সন্দেহ পড়ল স্যার, বল্লভ শাহর উপরে। তিনি রোহিত রয়ের পরিচিত এবং দিলীপের বস। পুলিশ রোহিত রয়ের বান্ধবী আইলিনকেও খুঁজছিল। সে বল্লভ শাহর পরিচিত, সম্ভবতঃ চক্রটার সঙ্গে যুক্ত। মন কিন্তু বলছিল স্যার, রোহিত রয় বা দিলীপ কেউই ব্ল্যাকমেইল চক্রে যুক্ত নয়, যদিও বল্লভ শাহকে ধোয়া তুলসীপাতা মনে হচ্ছিল না। এই সময়ে শান্তিনিকেতন থেকে দুলালবাবু জানালেন, দুটো লোক লাগিয়ে একজন শিশিরবাবুর বাড়ি থেকে একটা পুরোনো বাক্স চুরি করিয়েছে। এতদিন পর্যন্ত আমরা ভাবছিলাম, বাক্স থেকে কিছু চুরি গেছে, এখন জানলাম উদ্দেশ্য ছিল বাক্স-চুরি। একটা পুরোনো বাক্স, কেন সেটা কেউ চুরি করাতে চাইবে? নলিনীদেবীর চিঠিগুলো মেঝেতে পড়েছিল, সুতরাং চিঠিগুলো ওই কাঠের বাক্সেই থাকত। বহু বছর আগে শিশিরবাবু হয়তো শখ করে কিনেছিলেন। অ্যান্টিক হলেও এমন কি দামি হবে? সেইজন্য আমি মিস্টার লংফেলোর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম, সে তো আপনাদের আগেই বলেছি। এমনি সময়ে থ্যাঙ্কস টু প্রমথবাবু, দ্য বিগেস্ট ক্লু পেয়ে গেলাম।"

প্রমথ বলল, "গুড, এতক্ষণ ভাবছিলাম আমার কথাটা চেপে যাচ্ছেন কেন! বলুন তো এবার, কী সাহায্য করলাম?"

"সেদিন যখন মিস্টার লংফেলোর কথা বলছিলাম, আপনি হঠাৎ শ্যামল মিত্রের গানটা চালালেন।"

"কোন গানটার কথা বলছেন?"

"ঐ যে স্যার, 'দেখেছি তোমাকে মুখর মেলায়, পথেরই বাঁকে আর রঙেরই খেলায়।' কেন জানি না স্যার ওই 'বাঁকে' কথাটা আমায় নাড়া দিল। তখনই মনে হলো ওটা আপনারই মুখে আগে শুনেছি। কবে? ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে গেল। ক্যালিস্টোর একটা লেখা আপনি অনুবাদ করেছিলেন, মনে আছে স্যার?"

"নিশ্চয় মনে আছে — 'রেখে দিও মোর শূন্য পাত্র পথের বাঁকে'।"

"না না, স্যার, ওটা ছিল — 'রেখে দিও মোর শূন্য চায়ের পাত্র, ব্রিজের বাঁকে বাঁকে'। বুঝতে পারছেন তো স্যার ব্যাপারটা?"

"না," আমি প্রমথ দুজনেই মাথা নাড়লাম।

"বুঝতে পারছেন না স্যার!" একেনবাবু এক্সসাইটেড হয়ে বললেন, "রেখে দিও — মানে কিপ ইট। চায়ের পাত্রটাকে টি কাপ না ভেবে ভাবুন টি ক্যাডি। আর ব্রিজের বাঁকে বাঁকে — টার্ন ব্রিজ। অর্থাৎ, টার্ন ব্রিজের ফাঁকা টি-ক্যাডিটা রেখে দিও। ওটা ছিল প্যারিস পাবলিকেশন্স-এর ছাপা ওঁর কবিতার বইয়ের টাইটল। আর "দ্য লাইট" ডায়মণ্ডটা কোথায় আছে, সেটার ক্লু তিনি মারা যাবার আগে দিয়ে গিয়েছিলেন — 'দ্য অ্যানসার ইস ইন দ্য টাইটেল'।

"আপনাদের মনে আছে কিনা জানি না স্যার, তখনই আমি বাপিবাবুর দিদিমা আর নলিনীদেবীর ছবিটা নিয়ে ছুটেছিলাম মিস্টার লংফেলোর কাছে। মিস্টার লংফেলো কনফার্ম করলেন, মূর্তির নীচের বাক্স নিঃসন্দেহে টার্ন ব্রিজের টি-ক্যাডি। ব্যাপারটা এবার বুঝুন স্যার, মাসিমা বলেছিলেন মূর্তি যে-বাক্সে থাকত সেটা ওঁর দাদুর ঠাকুরমার, অর্থাৎ জিনিওলজি অনুসারে ক্যালিস্টোর বোনের। মূর্তি শুদ্ধু বাক্সটা চুরি যায় নলিনীদেবীর বিয়ের ঠিক আগে। ছবিটা তোলা হয়েছিল নলিনী দেবীর যখন বিয়ে হয়নি, সুতরাং মনে করা যেতে পারে ওটাই সেই বাক্স!"

"দাঁড়ান মশাই দাঁড়ান, এত জোরে রেলগাড়ি চালাবেন না। ওটা তো চুরি গেছে বহুদিন, শিশিরবাবুর কাছে যায় কি করে?"

"বলছি স্যার, বলছি। মনে আছে, দুলালবাবু নলিনী দেবীর লেখা চিঠিগুলো পাঠিয়েছিলেন, তার শেষ চিঠিটাতে কী লেখা ছিল?

এটা রেখে দিও, আর কাল ভোর চারটের সময় ট্যাক্সি নিয়ে বাইরে অপেক্ষা কোরো।

সেই 'এটা'-র উল্লেখ আর কোনও চিঠিতে নেই। চিঠিটা তাড়াহুড়ো করে একটা ছেঁড়া কাগজে লেখা। মনে হয় স্যার, কোনও মতে একটা কাগজ জোগাড় করে বাড়ির লোকদের অজান্তে চিঠিটা পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু এই 'এটা'-টা কী? তখনই আমার মনে পড়ল, মাসিমা বলেছিলেন সোনা-রূপোর ওই নারী-মূর্তি ওঁর মা'র বিয়ের সময়ে চুরি যায়, কিন্তু পরে চোর এসে সেটা ফেরত দেয়। এইবার আমার কাছে ঘটনাগুলো স্পষ্ট হতে লাগল। চিঠির 'এটা' হল সেই নারী-মূর্তি। নলিনীদেবী বিয়ের আগের দিন সেটি বাক্স-সমেত বিশ্বস্ত কারোর হাত দিয়ে তার প্রেমিক শিশিরবাবুকে দিয়েছিলেন। কথা ছিল খুব ভোরবেলা শিশিরবাবু ট্যাক্সি নিয়ে আসবেন, উনি পালাবেন।"

"বুঝলাম না," প্রমথ বলল, "অফ অল দ্য থিংস, ওই মূর্তিটা উনি পাঠালেন কেন?"

"সেটাও স্যার মাসিমা বলেছিলেন। দিদিমার কাছ থেকে পাওয়া ওই মূর্তি ছিলো মাসিমার মা নলিনীদেবীর প্রাণপ্রিয়। বাড়ির সঙ্গে সব যোগাযোগ ছিন্ন হতে যাচ্ছে বুঝে মায়ের দেওয়া মূর্তি কাছে রাখতে চেয়েছিলেন। কেন নলিনী দেবী তার পরদিন বেরিয়ে যেতে পারেননি, কে জানে! শিশিরবাবুই হয়তো ভয় পেয়ে পিছিয়ে গিয়েছিলেন। হতে পারে নলিনীদেবীই বেরোবার সময়ে ধরা পড়ে যান। মোটকথা নারীমূর্তি অদৃশ্য হয়। পরে ওটা শিশিরবাবু লুকিয়ে লুকিয়ে ফেরত দিয়ে যান। তিনি জানতেন মূর্তিটা নলিনীদেবীর কী ভীষণ প্রিয় ছিল। কিন্তু বাক্সটা ফেরত দেননি। মানুষের সাইকোলজি নানা ভাবে কাজ করে স্যার। হয়তো একটা স্মৃতি চিহ্ন শিশিরবাবু ধরে রাখতে চেয়েছিলেন। প্রিয়াকে তাঁর প্রিয়বস্তুটা ফেরত দিলেও পুরোটা দিলেন না। অন্তরটা দিলেন স্যার, কিন্তু খোলসটা অর্থাৎ বাক্সটা ধরে রাখলেন। নাউ ইট স্টার্টেড মেকিং সাম সেন্স স্যার।

"প্রমথবাবু হয়তো খেয়াল না করেই বলেছেন, বল্লভ শাহ কখনোই অচেনা কারোর কথায় বাক্স আনার মতো কাঁচা কাজ করবেন না, বাক্সের ফলস বটমে তো মণি-মুক্তো-ও থাকতে পারে। আপনি কিন্তু স্যার পারফেক্টলি রাইট।" প্রমথর দিকে তাকিয়ে একেনবাবু বললেন। "ক্যালিস্টো টি-ক্যাডির খোপগুলো কেটে একটা ফলস বটম বানিয়ে 'দ্য লাইট' আর কিছু দামি মণিমুক্তো রেখেছিল। পুলিশ সব জায়গায় খুঁজেও ওখানে আছে ভাবেনি। ক্যালিস্টোর সব কিছুই পায় তার বোন। বোন বাচ্চা হবার পরপরই মারা যান, আর তাঁর স্বামী অর্থাৎ সুভদ্রামাসির দাদুর ঠাকুরদা বাচ্চাকে নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। সেই সঙ্গে টি-ক্যাডিটাও আসে।"

আমার মনে প্রশ্ন জাগল, "এটা তো অন্য কোনো টি- ক্যাডিও হতে পারত?"

"তা পারত। তবে কিনা দুটো জিনিস। প্রথমত, ক্যালিস্টোর বোন, অর্থাৎ সুভদ্রামাসির দাদুর ঠাকুরমা, মারা যাবার আগে বলে গিয়েছিলেন ওই টি-ক্যাডি যেন ওঁর বাচ্চা পায়। মাসিমা যখন কথাটা বলেছিলেন আমার খুব স্ট্রেঞ্জ লেগেছিল। অফ অল দ্য থিংস স্যার, কোন মা তার বাচ্চাকে টি-ক্যাডি দিয়ে যাবার কথা ভাববে! তাই মনে হয় ক্যালিস্টো-র বোন নিশ্চয় জানতেন যে ওতে মহামূল্য জিনিস লুকোনো আছে। দ্বিতীয়ত স্যার, এটা অর্ডিনারি টি-ক্যাডি নয়। এর ভেতরটা মডিফাই করা হয়েছে। নইলে ঐ নারীমূর্তি ওর ভেতর ঢুকত না। সেইজন্যেই শিশিরবাবুও নলিনীদেবীর চিঠিপত্রগুলো ওর মধ্যে রাখতে পেরেছিলেন।"

"কিন্তু এটাও তো সম্ভব যে শিশিরবাবু বহুদিন আগেই ওই টি-ক্যাডিটা ফেলে দিয়েছিলেন, এটা সম্পূর্ণ অন্য একটা কাঠের বাক্স — হয়তো শ্রীনিকেতন থেকে বানানো?" প্রমথ প্রশ্ন তুলল।"

"গুড পয়েন্ট স্যার। কিন্তু মনে রাখবেন রোহিত রয় ওটাকে চিনতে পেরেছিলেন।"

"কী করে?"

"কী মুশকিল স্যার, উনিই তো বাপিবাবুর দিদিমা আর সুভদ্রামাসির মায়ের ছবিটা ডিজিটালি এনহ্যান্সড করেছিলেন!"

"এ পর্যন্ত বুঝলাম, আমি বললাম। কিন্তু রোহিত রয়কে খুন করল কে?"

"বাবু পিন্টো।"

"বাবু পিন্টো!"

"হ্যাঁ স্যার। বাবু পিন্টো মাসিমার জিনিওলজিটা খুব ভালোভাবেই জানতেন। রিচার্ডসাহেবের নোটবুকের প্রায় সব তথ্যই বাবুর কাছ থেকেই পাওয়া। আমরা লজিক্যালি যেসব জিনিস চিন্তা বার করছি, বাবু পিন্টো সেইভাবেই সেগুলো বার করতে পারবেন, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। উনি সম্ভবতঃ শিশিরবাবুর সঙ্গে সুভদ্রামাসির মায়ের সম্পর্কটাও আবছা আবছা জানতেন। হয় রিচার্ডসাহেবের কাছ থেকে অথবা রোহিত রয়ের কাছ থেকে। রিচার্ড সাহেব নিজের স্ত্রীকে না বললেও জিনিওলজির ব্যাপারে অনেক কথাই হয়তো কনফিডেনশিয়ালি এঁদের বলেছিলেন। শিশিরবাবু যখন অন্যের কাছ থেকে পাওয়া সব জিনিস ফেরত দিচ্ছেন স্যার, তখন বাক্সটাও ফিরিয়ে দেবার কথা ভাবছিলেন। এ প্রসঙ্গে আপনাদের প্রভাসবাবুকে বলেও ছিলেন যে এক বহু পুরোনো পরিচিতের জামাইয়ের সঙ্গে হঠাৎ দেখা। তার জিনিসটাও ফিরিয়ে দিতে হবে। সেটা যে সত্যি সত্যিই করার চেষ্টা করছিলেন, সেটা জানলাম কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে খোঁজ নিয়ে। রিচার্ডমেসোর কাছে একটা চিঠি এসেছিল ইন্ডিয়া থেকে, সেটা ভুল করে ওরা রিচার্ডমেসোর পুরোনো ঠিকানায়, অর্থাৎ রোহিত রয়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল।" সঙ্গে

সঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল, স্টুয়ার্ট সাহেবের সেদিনের সেই মেসেজের কথাটা, যেটার মাথামুন্ডু তখন বুঝিনি। এখন সেটা পরিষ্কার হল।”

একেনবাবু বলে চললেন, “রোহিত রয় সেই চিঠি থেকে বাক্সর কথা জানলেন। বাবু পিন্টোও একই কথা জানালেন অন্যভাবে। রিচার্ডমেসোর কার্ডে দুটো ঠিকানাই ছিলো। একটা হল ওঁর পুরোনো ম্যানহাটানের ঠিকানা, যেখানে রোহিত রয় থাকতেন। আরেকটা হল ওঁর কলেজের ঠিকানা। আমার বিশ্বাস, শিশিরবাবু দু-জায়গাতেই চিঠি পাঠিয়েছিলেন, যাতে একটা চিঠিটা অন্ততঃ ঠিকমতো রিচার্ডসাহেবের হাতে পৌঁছয়। রোহিত রয় বাইরে থাকায় বাবু পিন্টো মিস্টার রয়ের চিঠিগুলো তোলেন। রিচার্ডসাহেব বহুদিন হল মারা গেছেন, চিঠিটা আসছে শিশিরবাবুর কাছ থেকে, যার সম্পর্কে বাবু পিন্টো জানেন। উনি চিঠিটা খোলেন। তখনই উনি জানতে পারেন যে শিশিরবাবু একটা কাঠের বাক্স ফেরত দিতে চান। এ-ও সম্ভব স্যার যে সেই চিঠিতে উনি হয়তো লিখেও ছিলেন যে ওটা ওঁর শাশুড়ির পুতুলের বাক্স বা ওরকম কোনো কথা। মিস্টার পিন্টো বুঝতে পারেন যে এটাই সেই বাক্স! উনি সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যান করলেন কী ভাবে এটাকে খুব তাড়াতাড়ি আনানো যায়। উনি জানতেন স্যার, বল্লভ শাহ প্রায়ই ইন্ডিয়া যান জিনিসপত্র আনতে। কিন্তু উনি যদি সোজাসুজি এটা আনতে বলেন, তাহলে সন্দেহ জাগতে পারে। তাই উনি ছদ্মবেশের আশ্রয় নিলেন। দিলীপের সঙ্গে ওঁর সব কথাবার্তার কথা তো স্যার বল্লভ শাহর কাছেই শুনেছেন।”

“তা শুনেছি, তারপর?”

“যাইহোক, রোহিত রয় এই বাক্সের হিস্ট্রি কতটা জানতেন জানি না। জানলে এক কথা। না জানলেও উনি চাননি, একটা অচেনা লোক এইভাবে মাসিমাদের ফ্যামিলির জিনিস নিয়ে যাবে। বাবু পিন্টো বাক্সটা রোহিত রয়ের কাছে আছে জেনে সকালে রোহিত রয়ের অ্যাপার্টমেন্টে আসেন, বাক্সটা ওঁকে দিতে বলেন। না পেয়ে রোহিত রয়কে গুলি করেন। ব্যাপারটাকে অন্য একটা অ্যাঙ্গল দেবার জন্য কতগুলো বাজে বাজে ছবি রোহিত রয়ের কম্পিউটারে পুরে দেন।”

“এতদিনের এক বন্ধুকে এর জন্যে খুন!”

“স্যার, আমি আপনাকে বলেছিলাম, দেয়ার হ্যাস টু বি এ মোটিভ। বল্লভ শাহ সেদিন বললেন, আর স্টুয়ার্ট সাহেবও খবর নিয়েছেন — বাবু পিন্টোর ফাইনানশিয়াল অবস্থা একেবারে শোচনীয়। শেয়ার মার্কেটের ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝি না স্যার। এটুকু বুঝি দেনায় ওঁর চুল বিকিয়ে গেছে। বলতে পারেন এটা ছিল পাওনাদারদের হাত থেকে রক্ষা পাবার একমাত্র উপায়। হি ডিসাইডেড এগেইন্সট ফ্রেন্ডশিপ।”

“দিলীপকে মারলেন কেন?” প্রমথ জিজ্ঞেস করল।

“দিলীপ ওঁর ছদ্মবেশটা ধরে ফেলেছিল স্যার। সুতরাং না সরিয়ে ওঁর কোনো উপায় ছিল না।”

এমন সময়ে ফোনটা আবার বেজে উঠল। ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট। নিশ্চয় কংগ্র্যাচুলেশনস জানাচ্ছেন। একেনবাবু বারবার বলছেন, “থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ। না না স্যার, আমি একা কেন — এ তো সবাই মিলে সলভ করা। হ্যান্ডগানটা তাহলে পাওয়া গেছে?... নিশ্চয় স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ এগেইন।”

ফোনটা নামাতেই আমরা চেপে ধরলাম।

“কি ব্যাপার?”

“স্টুয়ার্ট সাহেব বললেন ব্যারেল-কাটা হ্যান্ডগানটা পাওয়া গেছে।”

“ওরকম ক্রিপ্টিক্যালি কথা বলছেন কেন, একটু বিশদ করুন। ব্যারেল-কাটা হ্যান্ডগানের বিশেষত্বটা কি?” প্রমথ প্রশ্ন করল।

“ওটা একটা ওল্ড টেকনিক স্যার। হ্যান্ডগানের ব্যারেলটা কেটে ফেললে তার গুলির গায়ে কোনো মার্কিং থাকে না। গুলিতে মার্কিং না থাকলে গানটা আইডেন্টিফাই করা কঠিন।”

“কঠিন কেন, আমি বললাম, সেক্ষেত্রে ব্যারেল কাটা হ্যান্ডগান থেকেই গুলিটা বেরিয়েছে।”

“সেটা খুব পজিটিভ আইডেন্টিফিকেশন হল না — যে কোনো ব্যারেল কাটা গান থেকেই গুলিটা বেরোতে পারে।”

“তাহলে সবাই ব্যারেল-কাটা হ্যান্ডগান ব্যবহার করে না কেন?”

“গুড কোয়েশ্চেন স্যার। মুশকিল হল, ব্যারেল কাটা থাকলে নিশানা করা খুব কঠিন। খুব কাছাকাছি না থাকলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা খুবই বেশি। গুলিটাও সোজা না বেরিয়ে চক্কর খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে যায়। যখন শুনলাম গুলিতে মার্কিং নেই আর বড়ো সাইজের ক্ষত, তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল।”

প্রমথ বলল, “সবই তো শুনলাম, কিন্তু এগুলো দিয়ে তো প্রমাণ হতো না যে বাবু পিন্টোই খুনি। উনি আত্মহত্যা করতে গেলেন কেন?”

“ইউ আর রাইট স্যার, যা বললাম তা দিয়ে প্রমাণ করা যেত না। সেই জন্যেই ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট বাবু পিন্টোর ব্যাঙ্ক লকার চেক করেছেন। সেখানে ‘দ্য লাইট’ আর বেশ কয়েকটা হিরে, রুবি, ইত্যাদি পাওয়া গেছে। বুদ্ধমূর্তিতে আঙুলের ছাপগুলোও নেওয়া হয়েছে। পাওনাদারের চাপে আর তদন্তের জাল ধীরে ধীরে গুটিয়ে আসছে বুঝতে পেরে উনি নিজের মান বাঁচিয়েছেন। ব্যারেল-কাটা হ্যান্ডগানটা ওঁর অফিসে পাওয়াতে পাজলের শেষ ফাঁকটা পূর্ণ হল।”

একেনবাবুর কথা শেষ হতেই, “কনগ্র্যাচুলেশন্স মাই ডিটেকটিভ, ইউ ডিসার্ভ এ কিস,” বলে ফ্রান্সিস্কা একেনবাবুকে জড়িয়ে ধরে গালে একটা চুমু দিল। একেনবাবুর মুখের অবস্থা তখন দেখার মতো। লজ্জায় বেগুনি। মাথা নুইয়ে নুইয়ে বললেন, “থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।”

# হরপ্পার শিলালিপি

বইয়ের গ্রুপ ॥ বইয়ের চ্যানেল

।। ১।।

গোয়েন্দা হিসেবে একেনবাবুর দেশে যতটা পরিচিতি থাকা উচিত নিঃসন্দেহে তা নেই। প্রমথ কয়েক বছর আগে কলকাতা গিয়ে একটা র‍্যান্ডাম স্যামপ্লিং করেছিল। পঞ্চাশ জনকে প্রশ্ন করেছিল, তাদের একজনও একেনবাবুকে চিনতে পারেননি। আগেই বলে রাখি প্রমথর উদ্যোগী হয়ে এই স্যাম্পেল সার্ভে করার উদ্দেশ্য একেনবাবুর পপুলারিটি বিচার নয়। একেনবাবু নিজে প্রচারবিমুখ। একেনবাবুর কীর্তিকলাপ আমিই এক আধ সময়ে পত্রপত্রিকায় লিখেছি। প্রমথর এই উদ্যোগ লেখক হিসেবে আমি কতটা অক্ষম সেটা প্রমাণ করা।

এরপর একেনবাবু সম্পর্কে আমি আর কিছু লিখব না বলে ঠিক করেছিলাম, কিন্তু আবার কলম ধরলাম ভৈরব মিত্রের তাগাদায়। ভৈরববাবু কুইন্সে থাকেন। ম্যানহাটানের 'রাজা-অ্যাণ্ড-রাণী' রেস্টুরেন্টের মালিক। যখনই ওঁর সঙ্গে দেখা হয় জিজ্ঞেস করেন, "কী মশাই, একেনবাবুর লেখাটা কদ্দূর এগোল?"

আমার লেখা নিয়ে ভৈরব মিত্রের এই আগ্রহটা অবশ্য একেবারে নিঃস্বার্থ নয়। ওঁর রেস্টুরেন্ট থেকে বেশ কিছুদিন ধরে কাপ-ডিশ, কাঁটা-চামচ এইসব চুরি হচ্ছিল। বোঝাই যাচ্ছিল রেস্টুরেন্টেরই কেউ এর মধ্যে জড়িত। একেনবাবু ওখানে এক-আধবার খেয়েছেন। ভৈরব মিত্র এসে ধরলেন একেনবাবুকে। দু'দিনের মধ্যে বামাল-সমেত চোর গ্রেফতার। ভৈরব মিত্রের খুব ইচ্ছে সেই সম্পর্কে আমি লিখি। ওঁর রেস্টুরেন্টের তাতে একটা পাবলিসিটি হবে। প্রমথর র‍্যান্ডাম স্যামপ্লিং-এর খবরটা নিশ্চয়ই জানতেন না। সে কথা থাক, ভৈরব মিত্রের ছিঁচকে চুরির গল্প লেখার জন্য আমি কলম ধরিনি। আমার লেখা কেউ পড়ুক না পড়ুক, একেনবাবুর কীর্তিকে আমি কোনোমতেই খাটো করতে চাই না। লিখছি অন্য একটা কাহিনি... গোড়া থেকেই শুরু করি।

আমি, একেনবাবু আর প্রমথ ধীরে সুস্থে আয়েস করে শনিবার সকালে ব্রেকফাস্ট শেষ করেছি। কলেজ নেই, তাই কোনো তাড়াও নেই। এমন সময় ডোর বেল। দরজা খুলে দেখি এক সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে, হাতে একটা হলুদ রঙের খাম। ভদ্রলোক একেনবাবুকে খুঁজছেন। আমি আঙুল দিয়ে একেনবাবুকে দেখিয়ে দিতেই ভদ্রলোক কেমন জানি নিষ্প্রভ হয়ে গেলেন। একেনবাবুর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে এরকম রিয়্যাকশন অল্প-বিস্তর সবারই হয়। ওঁর পোশাক বা চেহারা কোনোটাই ইম্প্রেসিভ নয়। যাঁরা প্রথম দর্শনের এই ধাক্কা সামলাতে পারেন, আখেরে অবশ্য তাঁরাই লাভবান হন। দ্য নিউ স্কুল ফর সোশ্যাল রিসার্চ-এর প্রফেসর জন গেরহার্ট যে সেই দলেই পড়বেন বুঝলাম। ভেতরে ভেতরে দমে গিয়ে থাকলেও বাইরে তা মোটেই প্রকাশ পেল না। নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, "অসময়ে এসে পড়েছি। ফোন নম্বরটা ছিল না, তাই ফোন করতে পারিনি..."

বলতে বলতেই ওঁর নজরে পড়ল ব্রেকফাস্টের কাপডিশগুলো তখনও টেবিলে।

"আপনাদের বোধহয় ব্রেকফাস্ট শেষ হয়নি।"

“কী যে বলেন স্যার, আসার আবার সময় অসময় কি। তাছাড়া খাওয়া শেষ হয়ে গেছে।”

ভদ্রলোক আমার আর প্রমথর দিকে তাকালেন বোধহয় কনফার্মেশনের জন্য।

আমি কাপ-ডিশগুলো সরাতে সরাতে বললাম, “হ্যাঁ, খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আমরা গল্প করছিলাম। আপনি প্লিজ বসুন।”

“থ্যাঙ্ক ইউ” বলে অধ্যাপক চেয়ারে বসলেন।

আমাদের দুজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে একেনবাবু সবাইকে যা বলেন সেটাই আওড়ালেন। “আপনার যা বলার স্যার, এঁদের সামনে স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন। আমরা এক টিমে।”

দুয়েকটা মামুলি কথাবার্তার পর প্রফেসর বললেন, “আসলে কাহিনিটা একটু দীর্ঘ।”

“তাতে কী হয়েছে। বলুন স্যার, আমরা তো বসেই আছি।”

“বেশ, বলছি,” প্রফেসর শুরু করলেন। “কিছুদিন আগে ওয়াশিংটন স্কোয়ার পার্কে আপনাদের দেশের এক মহিলা দীপা রয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। পার্কে যখন হাঁটতাম, দীপাকে দেখতাম একা একা বেঞ্চে বসে আছেন। একদিন নিজেই গিয়ে আলাপ করলাম। আলাপ হয়ে যাবার পর থেকে হাঁটার আগে কিছুক্ষণ ওঁর পাশে গিয়ে বসতাম। সেই ‘কিছুক্ষণ’টা বাড়তে লাগল। একটু একটু করে ওঁর ব্যক্তিগত অনেক কথাই জেনে গেলাম।”

এরপর যা বললেন সেটা সত্যিই দীর্ঘ কাহিনি, সংক্ষেপে লিখছি...

দীপার স্বামী দেবেশ রয় ইণ্ডিয়ান আর্কিওলজিকাল সার্ভেতে কাজ করতেন। রিটায়ার করার কিছুদিন আগে একটা ফেলোশিপ নিয়ে আমেরিকা এসেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ হরপ্পায় গিয়ে রিসার্চ করার একটা সুযোগ এসে যায় বলে ফেলোশিপ শেষ না করেই দেশে ফিরে যান। দেশে কয়েকদিন থেকেই হরপ্পা। হরপ্পা যাবার পর দেবেশের কাছ থেকে শুধু কয়েকটা চিঠি আর একটা ফোন এসেছিল। হরপ্পা-ক্যাম্পসাইটে ফোন না থাকায় চিঠি ছাড়া যোগাযোগ করারও কোনো উপায় ছিল না। বেশ ক’দিন চিঠি আসছে না। হঠাৎ পুলিশ এসে জানাল দেবেশ একটা দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। ওঁর ডেডবডি ফিরিয়ে আনার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। এর থেকে বেশি স্থানীয় পুলিশ জানে না। দীপা নানান জায়গায় চেষ্টা করে শেষে ইসলামাবাদে ভারতীয় হাইকমিশনের অফিস থেকে জানতে পারেন যে ক্যাম্পের সিকিউরিটির সঙ্গে ডাকাতের গুলি চালাচালির সময়ে দেবেশের মৃত্যু ঘটেছে। ওঁর জিনিসপত্র লুঠ হয়ে গেছে। পাকিস্তান পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউই ধরা পড়েনি।

এটা প্রায় চার বছর আগের ঘটনা। মাস ছয়েক আগে আরিফ নামে একটি লোক বাড়িতে আসে। সে নাকি হরপ্পায় দেবেশের দেখাশোনা করত! আরিফের কাছ থেকে দীপাদেবী জানতে পারেন, কোনো জরুরি কাজে দেবেশ ওঁর স্যুটকেস নিয়ে স্টেশনে যাচ্ছিলেন, আরিফও সঙ্গে ছিল। দেবেশ গাড়িতে ওঠার সময়ে কেউ ওকে গুলি করে। ড্রাইভার ভয় পেয়ে গাড়ি চালিয়ে দেয়। আরিফ গাড়িতে উঠে পড়েছিল বলে নামতে পারেনি। যাইহোক, আরিফ যখন স্যুটকেস নিয়ে ক্যাম্পসাইটে ফিরে আসছে তখন শোনে দেবেশ মারা গেছেন, পুলিশ আরিফকে খুঁজছে। সেই শুনে আরিফ পালিয়ে এক আত্মীয়ের বাড়িতে লুকিয়ে থাকে। দেবেশের দিল্লীর ঠিকানা আরিফ জানত না। কিছুদিন আগে কারোর কাছ থেকে পায়। কিন্তু পাসপোর্ট-ভিসার ঝামেলায় আগে আসতে পারেনি। তারপর লোকটি দীপাকে বলে — দেবেশসাব ওকে অনেক সাহায্য করেছেন, স্যুটকেসটা

মেমসাবের কাছে পৌঁছে না দিলে ওর গুণাহ হবে।

স্ট্রেঞ্জ স্টোরি। যাইহোক, স্যুটকেসটা দেবেশরই। জামাকাপড় আর টুকিটাকি জিনিস ছাড়া আরও দু'টি জিনিস সেখানে ছিল, একটা নোটবই আর চিত্রবিচিত্র খোদাই করা চ্যাপ্টা মতো একটা পাথরের টুকরো। নোটবই নানান স্কেচে ভর্তি। এক জায়গায় লেখা, 'ফাইনালি দ্য মিস্ট্রি উইল বি সলভড্'। কিসের মিস্ট্রি তার উল্লেখ অবশ্য নেই। এত বছর বাদে হঠাৎ স্বামীর জিনিসগুলো দেখে দীপা ন্যাচেরালি খুবই আপসেট হয়ে যান। এদেশে ওঁর ছেলেকে ফোন করেন। মায়ের মানসিক অবস্থা বুঝে সেই উদ্যোগ করে মা-কে এখানে নিয়ে আসে।

পাথরটার ব্যাপারে প্রফেসর গেরহার্টের যদিও ঔৎসুক্য ছিল, কিন্তু প্রসঙ্গটা এত ডেলিকেট ওঁদের মধ্যে এ নিয়ে তখন আর কোনো কথা হয় না। কয়েকদিন বাদে দীপা নিজেই প্রফেসরকে জানান উনি স্বামীর স্যুটকেসে পাওয়া পাথরটাকে নিয়ে এসেছেন। শোনামাত্র প্রফেসর বলেন দীপার উচিত কোনো মিউজিয়ামের সঙ্গে যোগাযোগ করা। দীপা কাউকেই এদেশে চেনেন না। ওঁর ছেলে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, তার এ ব্যাপারে কোনো উৎসাহই নেই। তখন প্রফেসর গেরহার্ট নিজেই উদ্যোগী হয়ে মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম অফ আর্ট-এ ওঁর এক পুরোনো বন্ধুকে ফোন করেন। বন্ধুটি নিজে এককালে সিন্ধু সভ্যতা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন। এছাড়া প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির এক প্রফেসরকে চেনেন যাঁর হরপ্পার ব্যাপারে ইন্টারেস্ট আছে। বন্ধু পাথরটা দেখতে চাওয়ায় দীপা ওঁদের দু'জনকে বাড়িতে আসতে বলেন। পরের দিন দীপার বাড়িতে গিয়ে ওঁরা দেখেন একটা চৌকো চ্যাপটা পাথর। লম্বায় বড়োজোর আট ইঞ্চি, চওড়া হবে ইঞ্চি চারেক। পাথরটার দু'দিকেই অনেক চিহ্ন খোদাই করা। আঁকিবুকিগুলো দু'রকমের দেখে বন্ধুর মনে হল এটা 'রোসেটা স্টোন'-এর মতো কিছু হতে পারে। কয়েকটা ছবিও তুললেন, পরে ভালো করে স্টাডি করবেন বলে।

এখানে বলে রাখি 'রোসেটা স্টোন' জিনিসটা কী আমার কোনো ধারণাই ছিল না। কিন্তু প্রফেসর গেরহার্ট এমনভাবে কথাটা বললেন যেন আমাদের সবার সেটা জানা উচিত। আমি আর প্রমথ চুপ করে ছিলাম, একেনবাবু বললেন, "আমি স্যার কনফিউজড্, রোসেটা স্টোন...?"

" না, না, ঠিক রোসেটা স্টোন নয়, আমি বলতে চাইছিলাম বাই-টেক্সট স্টোন।"

এই প্রাঞ্জল ব্যাখ্যাটাও আমার মাথায় ঢুকল না। প্রমথও চুপ। শুধু একেনবাবু বললেন, "তাও বুঝলাম না স্যার।"

প্রফেসর গেরহার্ট তখন ব্যাপারটা বিশদ করলেন। মিশরের লিপির সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়েছিল রোসেটা স্টোন পাবার পর। কারণ পাথরের ওই টুকরোর উপরে মিশরীয় ও গ্রীক ভাষায় একই কথা তিনটি বিভিন্ন লিপি — হাইরোগ্লিফিক, ডেমোনিক ও প্রাচীন গ্রীক ব্যবহার করে লেখা ছিল। যেহেতু গ্রীক লিপিটা পন্ডিতদের জানা ছিল, পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মিশরের লিপির পাঠোদ্ধারও সম্ভব হয়। দীপাদেবীর পাথরটা দেখে ওঁর বন্ধুর মনে হয়েছিল একদিকের আঁকিবুকিগুলো সিন্ধুলিপির মতো, অন্যদিকটা মোটেই সেরকম নয়। সুতরাং এটা সম্ভবত বাই-টেক্সট অর্থাৎ দু'রকমের লিপি-যুক্ত পাথর। অন্য লিপিটা জানা থাকলে, সিন্ধু-লিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব হতে পারে।

এইবার বুঝলাম। সেইজন্যই মনে হয় দেবেশবাবু নোটবইয়ে লিখেছিলেন, 'ফাইন্যালি দ্য মিস্ট্রি উইল বি সলভড্।' সেকথা থাক, আগে প্রফেসরের কাহিনিটা শেষ করা যাক —

কয়েকদিন আগে প্রফেসর গেরহার্টের বন্ধু ফোন করে জানান তিনি প্রিন্সটনে খোঁজ

নিয়েছেন। হরপ্পার সবচেয়ে বড়ো অথরিটি রবার্ট উড বছর পাঁচেক হল রিটায়ার্ড। রিসার্চ প্রফেসর হিসেবে বছর দেড়েক আগেও ইউনিভার্সিটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এখন আর নন। ফোনে যোগাযোগ করার উপায় নেই, পুরোনো নম্বরটা ডিসকানেক্টেড। রবার্ট উডের ঠিকানা অবশ্য পেয়েছেন, নিউজার্সি আর পেনসিলভ্যানিয়ার বর্ডারে ছোট্ট পাহাড়ি শহর পোকোনোর একটা ঠিকানা। তবে যেটা মোস্ট এক্সাইটিং নিউজ, সেটা হল মেট্রোপলিটান মিউসিয়াম অফ আর্ট পাথরটা কিনতে খুবই ইন্টারেস্টেড। এক্সপার্টদের দিয়ে আসল-নকল বিচার করার পর এ নিয়ে ফাইনাল কথা হবে। প্রফেসর উডের ঠিকানা আর মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম আর্ট-এর কনট্যাক্ট পার্সনের নাম আর ফোন নম্বর সঙ্গে সঙ্গে লিখে নিলেন প্রফেসর গেরহার্ট। পরের দিন দীপার সঙ্গে দেখা হতেই সেগুলো দীপাকে দিলেন। দীপা কিন্তু পাথর বিক্রির ব্যাপারে কোনো উৎসাহ দেখালেন না। সোজাসুজি বললেন স্বামীর স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে ওটা উনি কাছে রাখতে চান।

এর মধ্যে তিন দিনের জন্য প্রফেসর গেরহার্টকে বাইরে যেতে হল। ফিরে এসে পার্কে কয়েকদিন দীপাকে দেখতে না পেয়ে বাড়িতে খোঁজ নিতে গেলেন। গিয়ে দেখেন দীপা শারীরিক ও মানসিকভাবে একেবারে বিধ্বস্ত। শুনলেন ওঁর সেই পাথর কেউ চুরি করেছে।

প্রফেসর গেরহার্ট স্তম্ভিত। জিজ্ঞেস করলেন, "কারা ওই পাথরের কথা জানত?"

দীপার উত্তর, শুভ, প্রফেসর গেরহার্ট আর গেরহার্টের বন্ধু ছাড়া আর কেউই না।

প্রফেসর গেরহার্ট জানতে চাইলেন, দীপা পুলিশে খবর দিয়েছেন কিনা।

দেননি।

দীপাদেবীর ছেলে শুভ সেখানে ছিল। তার ধারণা কোনো বড়ো চক্র নিশ্চয় এর পেছনে কাজ করছে। কারণ দেশেও একবার ওটাকে চুরি করার চেষ্টা হয়েছিল।

এই খবরটা অবশ্য গেরহার্ট সাহেব আগে জানতেন না। কিন্তু দীপা বললেন কথাটা সত্যি।

শুভ বারবার বলছিল, পাথরটা নিশ্চয় খুব মূল্যবান। যদিও সোজাসুজি কিছু বলেনি, কিন্তু মনে হল শুভ বিরক্ত যে অধ্যাপক গেরহার্ট পাথরটার কথা বাইরে প্রচার করেছেন।

দীপা সেটা আঁচ করলেন। প্রফেসরের অস্বস্তি এড়ানোর জন্যই বোধহয় শুভকে বললেন, 'চুপ কর শুভ, যা গেছে তা গেছে। এখন সব কিছু ভুলে যাওয়াই আমার উচিত।'

প্রফেসর গেরহার্ট ওঁর কাহিনি শেষ করে বললেন, "দেখুন, দীপা কেন পুলিশকে রিপোর্ট করেননি জানি না। কিন্তু আমি এই চুরির মধ্যে জড়িয়ে গেছি। যেহেতু আমিই পাথরটার কথা প্রথম জেনেছি আর আমার জন্য আর কয়েকজন জেনেছেন। বুঝতে পারছেন কি বলছি?"

"বোধহয় পারছি স্যার," একেনবাবু মাথা চুলকে বললেন। "আপনি হয়তো ভাবছেন দীপাদেবী আপনাকে সন্দেহ করেন আর সেই কারণেই থানা-পুলিশ করছেন না।"

"হয়তো। কিন্তু উনি হলেন খাঁটি ভদ্রমহিলা। সন্দেহ করলেও সেটা জানতে পারব না। যাইহোক ব্যাপারটা নিয়ে অত্যন্ত ডিসট্রেসড হয়ে আছি। কালকে মেট্রোপলিটাম মিউজিয়াম অফ আর্ট-এর সেই বন্ধুকে ফোন করেছিলাম। ওই বলল নিউ ইয়র্ক পুলিশের ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট নাকি আপনার গুণমুগ্ধ। আপনার এই বাড়িটা ও চিনত। কিন্তু ফোন নম্বর জানত না। মিস্টার সেন, ওটা প্লিজ খুঁজে দিন, একটা বিরাট বোঝা বুক থেকে নেমে যাবে।"

একেনবাবু বললেন, "তা তো বুঝতে পারছি স্যার, কিন্তু ম্যাডাম যদি ইন্টারেস্টেড না

হন।”

প্রফেসরের মুখে একটা বিস্ময় লক্ষ্য করে আমি বললাম, “উনি দীপা রয়ের কথা বলছেন।”

“না, না, দীপা পুলিশের কাছে যেতে চান না, কিন্তু আপনি এ নিয়ে খোঁজখবর করলে ওঁর কোনো আপত্তি নেই। আমি সকালে ওঁর সঙ্গে কথা বলেই আপনার কাছে এসেছি।” তারপর একটু চুপ করে বললেন, “দেখুন আমি মাস্টারি করি, বড়োলোক নই। আপনার ফি আমি যতটা সম্ভব মেটাবার চেষ্টা করব। কিন্তু আমার সামর্থ অল্প।”

“ছি ছি স্যার, টাকাকড়ি নিয়ে ভাবছেন কেন। আমাদের দেশের লেডি বিপদে পড়েছেন, এটা তো আমাদের কর্তব্য স্যার। ভালোকথা, আপনার কাছে পাথরটার কোনো ছবি আছে কি?”

“আছে। আমার বন্ধু যে ছবিগুলো তুলেছিল তার একটা করে কপি।” হাতে ধরা হলুদ খামটা খুলে প্রফেসর কয়েকটা ছবি বার করলেন। সেইসঙ্গে একটা কাগজ যেখানে নিজের, ওঁর মিউজিয়ামের বন্ধু, প্রিন্সটনের রিটায়ারড প্রফেসর উড, দীপাদেবীর বাড়ির ঠিকানা — সবকিছুই গুছিয়ে লেখা রয়েছে। “আর এইটাও আপনি রাখুন বলে এক হাজারের ডলারের একটা চেক একেনবাবুর হাতে দিলেন। কিছু খরচাপাতি তো হবে আপনার।”

“এটা না দিলেই চলত স্যার।”

“আমার চলত না, ওটা দয়া করে রাখুন। আরেকটা কথা, দীপা জানেন যে আপনি এ ব্যাপারে খোঁজখবর করবেন। কিন্তু উনি নিজে এর মধ্যে জড়াতে চান না। স্বভাবতই একটু ভয় পাচ্ছেন। তাই আমার অনুরোধ যতটা সম্ভব দূরত্ব বাঁচিয়ে কাজটা আপনি করবেন।”

“তা করব, কিন্তু একবার ওঁর সঙ্গে আমার কথা বলা প্রয়োজন। এখানে আসতে পারলে ভালো হয়। অবশ্য আমরাও যেতে পারি ওঁর কাছে।”

“ঠিক আছে, আজ বিকেলে উনি পার্কে এলে ওঁকে বলব এখানে আমার সঙ্গে একবার আসতে। মনে হয় না ওঁর আপত্তি হবে বলে।”

“শুধু আরেকটা প্রশ্ন স্যার, কাদের সঙ্গে ওঁর স্বামী হরপ্পায় গিয়েছিলেন?”

“সেই প্রশ্নটা আমি প্রথমেই করেছিলাম। কিন্তু উনি স্বামীর কাজকর্মের খবর একেবারেই রাখতেন না। শুধু জানতেন মাস তিনেকের প্রজেক্ট, কিন্তু দু’মাস যেতে না যেতেই সব শেষ।”

“থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।”

## ।। ২।।

দীপাদেবী সেই বিকেলেই প্রফেসর গেরহার্টের সঙ্গে এলেন। দেখলে বোঝা যায় এককালে খুব সুন্দরী ছিলেন। তবে বয়সের ভাবে সেই সৌন্দর্য অনেকটাই চাপা পড়েছে। তার ওপর নিঃসন্দেহে উনি মানসিক অবসাদের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। চোখের নীচে কালি,

মুখটা বিষাদময়, নিজেকে যেন টেনে টেনে বয়ে বেড়াচ্ছেন। প্রফেসর সঙ্গে ছিলেন বলে উনি ইংরেজিতেই কথাবার্তা বললেন। কনভেন্টে পড়াশুনা করেছেন নিশ্চয়, আমাদের মতো হোঁচট খাওয়া ইংরেজি নয়। একেনবাবুকে বললেন, "দেখুন এ নিয়ে আমি একেবারেই জলঘোলা করতে চাইছি না। আমার অনেক গিয়েছে। একটা পাথরের টুকরো থাকল না গেল, তাতে কিছু এসে যায় না।"

একেনবাবু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আমি পাথরটা খুঁজে বার করি ম্যাডাম, সেটা আপনি চান না?"

"না," স্পষ্টভাবেই দীপাদেবী বললেন, "যা যাবার তা গেছে।"

প্রফেসর গেরহার্ট বিশদ করলেন, "দীপা আর এ নিয়ে খোঁজ খবর করতে চাইছেন না। আমি খুব সরি, আমার প্রথমে মনে হয়েছিল আপনি কেসটা নিলে ওঁর হয়তো আপত্তি হবে না। কিন্তু উনি সত্যিই ব্যাপারটা ভুলে যেতে চান।"

"তাহলে তো স্যার আমাদেরও ভুলে যেতে হয়," কথাটা বলে একেনবাবু ঘরে গিয়ে গেরহার্ট সাহেবের চেকটা নিয়ে ওঁর হাতে ধরিয়ে দিলেন।

গেরহার্ট সাহেব লজ্জিতভাবে বললেন, "এটা কেন ফেরৎ দিচ্ছেন!"

"সে কি স্যার, আমি তো কোনো কাজই করিনি আপনার জন্য।"

"কিন্তু এতটা সময় দিলেন আমার কথা শুনতে...।"

"কী যে বলেন স্যার!"

দীপাদেবীকে নিয়ে প্রফেসর চলে যাবার পর, একেনবাবু মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "ভেরি কনফিউজিং।"

"তা তো বটেই," প্রমথ বলল, "তার ওপর ডিপ্রেসিং, ধাঁ করে হাজার ডলার ঘরে এল আবার সাঁ করে বেরিয়ে গেল!"

আমি বললাম, "যাই বলিস, এই বয়সেও ভদ্রমহিলা কিন্তু খুবই সুন্দরী।"

প্রমথ বলল, "শালা, তোর লজ্জা করে না, মায়ের বয়সি মহিলা।"

"ইডিয়টের মতো কথা বলিস না। একটা জেনারেল স্টেটমেন্ট করছি। আর সেই সঙ্গে এও বলছি, ভদ্রমহিলার মস্তিষ্কে একটু ব্যামো আছে।"

আমার ধারণা প্রমথও সেটা বুঝেছে। কিন্তু তর্কের খাতিরে বলল, "এটা কেন বলছিস?"

"কারণ, জিনিস চুরি হয়েছে, পুলিশকে রিপোর্ট করছেন না। একেনবাবুকে ভার দিতে রাজি হয়ে পরে বেঁকে বসেছেন। এতো পিওর ক্ষ্যাপামি।"

"দুটোরই এক্সপ্লানেশন আছে," প্রমথ বলল। "এক নম্বর, উনি দেশ থেকে এসেছেন। দেশে থানা-পুলিশ করা মানে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনা। ভালোর থেকে মন্দ বেশি হয়। উনি নিশ্চয় এদেশেও তাই হবে ধরে নিয়েছেন। দ্বিতীয়, একেনবাবুর কেপেবিলিটি সম্পর্কের ওঁর আস্থা থাকার কোনো কারণ নেই। উইথ অল ডিউ রেস্পেক্ট একেনবাবু, আপনার চেহারাটা মোটেই ইমপ্রেসিভ নয়। কতদিন ধরে বলছি পোষাকটা অন্ততঃ একটু ভদ্রস্থ করুন।"

"তুই থামবি!" আমি বিরক্ত হয়ে বললাম।

একেনবাবু প্রমথর অপমানগুলো গায়েই মাখেন না। বরং বললেন, "প্রমথবাবুর কথাগুলো কিন্তু একেবারে ফ্যালনা নয় স্যার, মানতেই হবে।"

"তুই অত্যন্ত ডিসরেস্পেক্টফুল," আমি প্রমথকে বললাম।

"ডিসরেস্পেক্টের কী দেখলি? আমি তো একেনবাবুর ক্ষমতাকে অস্বীকার করছি না, ওঁর প্যাকেজিংটা ঠিক নয়। মাল ভালো হলে তো শুধু চলবে না, মার্কেটিংটাও দেখতে হবে। ভালোকথা, কী বুঝছেন একেনবাবু, কেসটা সম্পর্কে?"

"খুবই কনফিউজিং স্যার।"

"কিচ্ছু কনফিউজিং নয়," প্রমথ কনফিডেন্টলি বলল, "আমার থিওরি শুনবেন?"

"বলুন স্যার।"

"দীপাদেবীর সুপুত্র শুভই এই অশুভ কাজটি করেছে। পাথরটা চড়া দামে কোথাও বেচে মা-কে থানাপুলিশ না করতে বলেছে।"

"ইউ হ্যাভ এ পয়েন্ট স্যার। শুভবাবুকে আমরা সন্দেহের লিস্ট থেকে বাদ দিতে পারি না।"

"ফ্র্যাঙ্কলি আমি অবাক হব না, যদি আপনার ম্যাডাম দীপাদেবীও এর সঙ্গে জড়িত থাকেন।"

আমি বললাম, "কী স্টুপিডের মতো কথা বলছিস! গেরহার্ট সাহেব তো ওটা বিক্রি করার বন্দোবস্ত করছিলেন। টাকার জন্য হলে তো সেটা করলেই হত, এত লুকোচুরির কী দরকার?"

"তুই একটা ইডিয়ট," প্রমথ বলল। "পাথরটা স্মাগলড গুডস। এখানে যে-কোনো মিউজিয়াম কেনার আগে কাগজপত্র, টাইটেল বা ওনারশিপ সার্টিফিকেট, ইত্যাদি দেখতে চাইবে, তখন এক আফগান বা পাকিস্তানী এসে বাড়িতে বয়ে পাথরটা দিয়ে গেছে বললে তো চলবে না!"

একেনবাবু মাথা নেড়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "সত্যি স্যার, প্রমথবাবু আমার ভাত মারবেন।"

"কী করে মারবে?" আমি বললাম, "কেসটা তো আপনি পেলেনই না!"

"তা পেলাম না স্যার," একেনবাবু ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বললেন, "তবে সত্যিই পাস্টটা বেশ কনফিউজিং।"

"পাস্ট-টা মানে?"

"এই যে স্যার দেবেশবাবু, হরপ্পায় গিয়ে হঠাৎ তাড়াহুড়ো করে পাথরটা বাক্সে পুরে পালাবার প্ল্যান করছিলেন কেন?"

"পালাবার প্ল্যান! সেটা কোত্থেকে পেলেন?" প্রমথ জিজ্ঞেস করল।

"আমার অনুমান স্যার, কারণ ঐ সময় তো ওঁর বাড়ি আসার কথা ছিল না। তার ওপর একটা দামি পাথরের টুকরো নিয়ে! উনি কি রিসার্চ করতে গিয়েছিলেন, না কোনও প্রত্ন-চোরের দলে যোগ দিয়ে রাতারাতি বড়োলোক হবার ধান্ধা করছিলেন?"

"বুঝেছি। তার মানে সেটা করতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটির শিকার হয়েছিলেন আর সেই দলটাই এখন পাথরটা উদ্ধার করার চেষ্টা করছে।" প্রমথ যোগ করল।

"ঠিক স্যার। সম্ভাবনাটা তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না।"

"আপনি তো আচ্ছা লোক মশাই, এক মুহূর্তে একটা গবেষককে ক্রিমিন্যাল বানিয়ে দিলেন। আর প্রমথ, তুইও তাতে তাল দিচ্ছিস!"

"না, না, স্যার, আমরা শুধু সম্ভাবনাগুলো ভাবছি। ভেরি কনফিউজিং।"

এসব ঘটে যাবার ক'দিন বাদে হঠাৎ করে ভৈরব মিত্রের সঙ্গে রাস্তায় দেখা। "কী খবর,"

বলেই জিজ্ঞেস করলেন, "শুনলাম একেনবাবু নাকি সোনাবৌদির বাড়ির চুরি নিয়ে ইনভেস্টিগেট করছেন?"

"সোনাবৌদি!" আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

"মানে দীপা রায়, আমি ওঁকে সোনাবৌদিই ডাকি।"

"আপনি ওঁকে চিনলেন কী করে?"

"আরে মশাই, ওঁকে কি আমি এখন চিনি! আমার জ্যাঠতুতো দাদার কলিগ ছিলেন দেবেশদা, মানে সোনাবৌদির স্বামী। আমার থেকে অবশ্য ওঁরা অনেক বড়ো। সোনাবৌদি এককালে যা সুন্দরী ছিলেন না, সুচিত্রা সেনকেও টেক্কা দেবার মতো।"

"এখনও উনি যথেষ্ট সুন্দরী," আমি বললাম।

"এখন তো দেখছেন শুধু টেন পারসেন্ট, কি তাও নয়," ভৈরব মিত্র মুখ বাঁকালেন। তারপর গলাটা একটু নিচু করে বললেন, "বিটুইন ইউ এণ্ড মি, কতজন যে ওঁর প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছেন গুণে শেষ করা যায় না। উনি অবশ্য কাউকে পাত্তা দেননি। ভার্চুয়াস লেডি। অলওয়েজ ট্রু টু দেবেশদা, প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। বরং দেবেশদাই শুনেছি অন্য মহিলাদের সঙ্গে একটু-আধটু... বুঝতে পারছেন তো? আচ্ছা ভাবুন তো, এমন সুন্দরী যাঁর স্ত্রী! আরে মশাই বড়োদের কথা ছেড়ে দিন, আমরা ছোটোরাই ওঁর কাছাকাছি ঘুরঘুর করার সুযোগ পেলে ছাড়তাম না। উনি আমাদের কারোর সঙ্গে এসে কথা বললে বর্তে যেতাম, অন্যরা সবাই হিংসায় জ্বলত। কোনো খিদমত খাটতে বললে তো আমরা সেভেন্থ হেভেনে পৌঁছে যেতাম!..."

"তাই নাকি!" ওঁর বাল্য-কাহিনি থামাতে কথার মাঝেই বললাম। কাজ হল না, উনি বলেই চললেন, "শুধু সুন্দরী ছিলেন না, ভালো গাইতেন, নাচতেন, চিত্তরঞ্জন পার্কের কালচারাল অনুষ্ঠানগুলোতে এককালে ওঁকে ছাড়া চলত না। তবে এখানে এসে একেবারে একা হয়ে পড়েছেন। ছেলে তো সারাদিন অফিস করছে। উনি তো ঘরের মধ্যে আটকা। কোথায় যাবেন, কার সঙ্গেই বা বেরোবেন? চেনা-জানারা তো সব দেশে!..."

সোনাবৌদির প্রসঙ্গ হয়তো আরও অনেকক্ষণ চলত। কিন্তু আমার একটু তাড়া ছিল, তাই কথা ঘোরাবার জন্য বললাম, "আপনি কোত্থেকে জানলেন যে একেনবাবুকে উনি চোর ধরতে বলেছেন?"

"আরে সেদিন শুভ ওঁকে নিয়ে আমার দোকানে এসেছিল। একথা সেকথার পর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, একেনবাবুকে আমি চিনি কিনা। আমি বললাম, 'চিনি না মানে, উনি একজন ফ্যান্টাস্টিক গোয়েন্দা। ওঁর জন্যেই আমার দোকানে চুরি বন্ধ হয়েছে।' তখনই জানলাম একেনবাবুর ব্যাপারটা...।"

আমি কথাটা শেষ করতে দিলাম না। "খবরটা ভুল, একেনবাবু এখন ওঁর কাজটা আর করছেন না।"

"সত্যি!"

"হ্যাঁ, সত্যি।" বলে আমি বিদায় নিলাম।

সেই রাতে বাড়িতে ডিনার খেতে খেতে একেনবাবু বললেন, "বুঝলেন স্যার, গেরহার্ট সাহেব ঠিক খবরই এনেছিলেন, প্রফেসর উড হরপ্পার একজন অথরিটি।"

"আপনি কি এখনও ওই নিয়ে ভাবছেন নাকি? ফ্রি-তে কাজ করা তো আপনার হ্যাবিট নয়!" প্রমথ বলল।

"কী যে বলেন স্যার, গতকাল ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের সঙ্গে গল্প করতে করতে গেরহার্ট

সাহেবের গল্পটা ওঁকে বলেছিলাম। ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের এক বন্ধু স্ট্যানফোর্ডে আছেন, হরপ্পা নিয়ে রিসার্চ করেন। স্টুয়ার্ট সাহেবকে তো আপনারা জানেন। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুকে ফোন। ভদ্রলোক প্রফেসর উডকে খুব ভালো করে চেনেন। যেটা মোস্ট ইন্টারেস্টিং, সেটা হল দেবেশবাবুকেও উনি চেনেন। এক সপ্তাহের মতো দেবেশবাবু ওঁর ডিপার্টমেন্টে ছিলেন। পরে আবার এক সপ্তাহের জন্য আসার কথা ছিল। কিন্তু প্রোগ্রামটা ক্যানসেল করে দেবেশবাবু দেশে ফিরে যান। প্রফেসর উডের ডিপার্টমেন্টেও দেবেশবাবু কাজ করেছেন বললেন। উনি আর প্রফেসর উড অনেকবারই হরপ্পায় গেছেন, দুয়েকবার এক সঙ্গেও।”

“দেবেশবাবু কি ওঁদের সঙ্গে হরপ্পায় গিয়েছিলেন?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“না, ওঁর সঙ্গে যাননি। দেবেশবাবু হরপ্পার উপর কোনো কাজ করেননি। তাই হরপ্পায় গিয়েছিলেন শুনে উনি একটু আশ্চর্যই হলেন।”

এইসব নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করছি, তখন ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের একটা ফোন। পুরোনো এক কলিগের সঙ্গে দেখা করতে উনি পোকোনো যাচ্ছেন, আমরা যেতে চাই কিনা জানতে। স্টুয়ার্ট সাহেব মাঝেমাঝে আমাদের দুয়েক জায়গায় নিয়ে যান। উনিও একেনবাবুর মতো বকবক করতে ভালোবাসেন, লম্বা ড্রাইভে ওঁর দুয়েকজন শ্রোতার দরকার — এটা অবশ্য প্রমথর কনক্লুশন।

একেনবাবু বেড়াতে ভালোবাসেন। আমিও। তারওপর কাল কোনো ক্লাস নেই। সুতরাং না বলার প্রশ্ন ওঠে না। প্রমথ যেতে পারবে না, ল্যাব-এ ওর এক্সপেরিমেন্ট চলছে।

আমি বললাম, “যখন যাচ্ছিই, তখন প্রফেসর উডের সঙ্গে দেখা করবেন নাকি?”

“কী হবে স্যার, পাথরটা থাকলে না হয় দেখা করার একটা মানে হত।”

“তা ঠিক।”

## ।। ৩।।

পোকোনো ঘন্টা দুয়েকের পথ। পথে তিন জায়গায় টোল দিতে হয়। আগে টোল দিতে গাড়ির লম্বা লাইন হতো। আজকাল নিউ ইয়র্ক অঞ্চলে যারা থাকে তাদের প্রায় সবার গাড়িতেই E-ZPass রেডিও ট্র্যান্সমিটার থাকে। টোল বুথের E-ZPass লেন দিয়ে যাবার সময়ে বুথের কম্পিউটার রেডিও থেকে গাড়ির মালিকের অ্যাকাউন্ট নম্বর বেতারেই জেনে যায় আর সঙ্গে সঙ্গেই মালিকের E-ZPass অ্যাকাউন্ট থেকে টোলটা নিয়ে নেয়। খুবই চমৎকার ব্যবস্থা, গাড়ি থামিয়ে পয়সা বার করার কোনো ঝামেলা নেই। কিন্তু আজকে কম্পিউটার সিস্টেম বিগড়ে বসে আছে, তাই সবাইকে টোল বুথে থামতে হচ্ছে। দু'ঘন্টার বদলে আড়াই ঘন্টা লেগে গেল।

ভেবেছিলাম স্টুয়ার্ট সাহেব কোনো কেস নিয়ে আলোচনা করতে এসেছেন। ও হরি, এসেছেন ওখানকার পুলিশ চিফ বিল ক্রসের সঙ্গে জমি কেনা নিয়ে আলোচনা করতে! বিল ক্রস ফ্লরিডাতে একটা নতুন রিয়েল এস্টেট ডেভালপমেন্টের খবর পেয়েছেন, খুব

সস্তায় সেখানে প্লট আর বাড়ি বিক্রি করা হচ্ছে। জায়গাটা এখনও বিশেষ ডেভালপড নয়। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই ওখানে একটা গল্ফ কোর্স হচ্ছে — রাস্তাঘাট বাড়িঘর শপিং মল-এ ভরে উঠবে। তখন জমি বাড়ি দুটোর দামই আকাশ ছোঁয়া হবে। বিল ক্রস সেখানে একটা বাড়ি কিনছেন আর বন্ধুবান্ধবদের উদ্বুদ্ধ করছেন সেখানে কিছু কিনতে। ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টকে জায়গাটার ম্যাপ, বাড়িগুলোর ছবি, ভবিষ্যতে জায়গাটা কী দাঁড়াবে আর্টিস্টের আঁকা ছবিতে দেখালেন। আমাদেরও বললেন, "কিনে ফেলুন, এর থেকে ভালো ইনভেস্টমেন্ট আর কোথাও পাবেন না।"

বাড়ি কেনার টাকা বা সাহস কোনোটাই আমার নেই। ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট মনে হল ইন্টারেস্টেড, কিছু কাগজপত্র বিল ক্রসের কাছ থেকে নিলেন। এই ফাঁকে একেনবাবু বিল ক্রসকে জিজ্ঞেস করলেন উনি রবার্ট উডকে চেনেন কিনা। পোকোনো খুবই ছোটো শহর, বড়োসড়ো গ্রামই বলা চলে, এখানকার বাসিন্দাদের অনেককেই হয়তো পুলিশ চিফ চেনেন। বিল ক্রস একেনবাবুর দিকে একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে বললেন, "আপনি ওঁকে চেনেন?"

"না স্যার, তবে শুনেছি উনি হরপ্পার একজন অথরিটি।"

"তা হতে পারেন, কিন্তু হি ইজ ডেড।"

"ডেড!"

"হ্যাঁ, সাত দিন আগে একটা খাদের মধ্যে ওঁর ডেডবডিটা দেখতে পেয়ে একজন খবর দেয়, সেই নিয়ে এখনও তদন্ত চলছে।"

"মাই গড!" আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

"কেসটা ইন্টারেস্টিং," বলে বিল ক্রস যা বললেন তার মর্মার্থ হল :

রবার্ট উড বছর পাঁচেক আগে পোকোনোতে একটা বিশাল বাড়ি তৈরি করেন। ফ্যান্সি গাড়িও ছিল কয়েকটা। বহু বছর রবার্ট উড অকৃতদার ছিলেন। নিজে খুব খরচে ছিলেন না, আর বেশ কিছু সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। সুতরাং টাকাপয়সা ওঁর ভালোই ছিল। রিটায়ার করার মুখে ভদ্রলোক হঠাৎ নিজের এক ছাত্রীকে বিয়ে করে বসেন। ছাত্রী ক্লারার বয়স বছর পঁয়ত্রিশ, খুবই সুন্দরী। এর আগেও বোধ হয় বার দুই বিয়ে হয়েছিল। নানা ঘাটের জল খেয়ে আবার কলেজে এসে ভর্তি হয়েছিলেন। প্রফেসর উডের ক্লাসে পড়তে এসে দেখতে না দেখতে প্রফেসরের প্রেমে পড়ে যান। পড়াশুনা খতম, অল্পদিনের মধ্যে ওঁদের বিয়েও হয়ে যায়। রিটায়ার করার পর রাবার্ট উড স্ত্রীকে নিয়ে পোকোনোতেই থাকতে শুরু করেন। প্রতিবেশীদের কাছে ওঁরা ছিলেন অড্ কাপল। একজন ভিভেশাস, হইচই করে পার্টি করতে ভালোবাসেন, আরেকজন সময় কাটান বই-পত্তরে মুখে গুঁজে আর পুরোনো পাথর ঘেঁটে। তবে প্রফেসর আধখ্যাপা লোক হলেও স্ত্রীকে ভীষণ ভালোবাসতেন। ওঁদের ঐ বাড়ি আর ফ্যান্সি গাড়িগুলো তার প্রমাণ। পোকোনোতে আসার এক বছর বাদে প্রফেসর রিসার্চের কাজে কিছুদিনের জন্য বাইরে ছিলেন, ফিরে এসেই ওঁরা আলাদা হন। প্রতিবেশীদের ধারণা এর মধ্যে মহিলা নিশ্চয় আর কারোর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু এগুলো নিতান্তই সন্দেহ। ডিভোর্স হয়েছিল মিউচুয়াল কনসেন্টে। সেটলমেন্টে প্রফেসর যা দেবার তার থেকে অনেক বেশিই ক্লারাকে দেন। বাড়িটা আর গাড়িগুলো ক্লারা পান। সেই সঙ্গে ভালো একটা মাসোহারাও। দু-একজন শুনেছি ওঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন এতটা না দিতে। কিন্তু উনি কারোর কথা শোনেননি। কিছু বলতে গেলে চটে যেতেন। ফলে কেউই ওঁদের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাত না। ডিভোর্সের পর পরই ক্লারা বাড়ি বিক্রি করে চলে যান। প্রফেসর উড ওঁদের

পুরোনো বাড়ির খুব কাছেই একটা ছোট্ট টু-বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নেন। এমনিতেই প্রফেসর মিশুকে ছিলেন না, কিন্তু ডিভোর্সের পর প্রায় কারোর সঙ্গেই কথা বলতেন না। প্রথম দিকে ওঁর পুরোনো অধ্যাপক বন্ধুরা মাঝেমধ্যে আড্ডা দিতে বা কাজের সূত্রে আসতেন। পরে তাঁদের আসাও খুব কমে যায়। আত্মীয়স্বজন ওঁর ছিল না। তবে ক্লারা ছাড়াছাড়ি হলেও মাঝেমাঝে ওঁকে দেখতে আসতেন। ইতিমধ্যে ক্লারা একবার বিয়েও করেছিলেন কিংবা কারোর সঙ্গে থাকতেন। সেই সম্পর্কটাও টেঁকেনি। প্রতিবেশীদের ধারণা হয়েছিল ক্লারা হয়তো আবার প্রফেসরের কাছে ফিরে আসতে চান। মাস তিন চার আগে ক্লারা একবার আসেন। তখন ওঁদের দুজনের মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয়, বাইরে থেকেও ওঁদের চেঁচামেচি অনেকের কানে আসে। তারপর থেকে ক্লারা আসেননি। প্রফেসর উড যেন আরও ডিপ্রেসড হয়ে যান। বাড়িতেই বেশিরভাগ সময় কাটাতেন। বিকেলে ওঁর বাড়ি থেকে একটু দূরে একটা উঁচু টিলার উপরে যে বেঞ্চিগুলো আছে তার একটাতে বসে থাকতেন। জায়গাটা নির্জন, চোখের একটু আড়ালে। হয়তো সেইজন্যেই সেখানে যেতেন, যাতে কেউ এসে বিরক্ত না করে। ডিপ্রেসড মানুষদের এইসব আচরণ কিছু অস্বাভাবিক নয়। তবে ওঁর আচরণে একটা ব্যাপার রহস্যময়। দৈনন্দিন খরচের জন্য একশো দুশো ডলার তোলা ছাড়াও চার পাঁচ মাস অন্তর অন্তর উনি একটা মোটা অঙ্কের টাকা, প্রায় হাজার দশ-পনেরো ব্যাঙ্ক থেকে তুলতেন। কী করতেন সেই টাকা নিয়ে সেটা পুলিশের কাছে স্পষ্ট নয়। আর এটা ইদানীং কালের ব্যাপারও নয়, গত প্রায় চার বছর ধরে এটা করে যাচ্ছিলেন। শুধু মাস চারেক হল এই টাকা তোলা বন্ধ ছিল। সাধারণভাবে এটা আত্মহত্যা বলেই ধরা হতো, কিন্তু এই টাকা-রহস্যের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কেসটা ক্লোজ করা যাচ্ছে না।

"উডের এক্স-ওয়াইফের সঙ্গে কি তোমার কথা হয়েছে?" ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট বিল ক্রসকে জিজ্ঞেস করলেন।

"হয়েছে, কিন্তু ফোনে। ক্লারা মাস তিনেক ধরে ক্যালিফোর্নিয়াতে একটা ডে-কেয়ার সেন্টারে কাজ করছেন। গত তিনমাস রবার্ট উডের সঙ্গে ওঁর কোনো যোগাযোগই নেই। তিনমাস আগে ওঁদের ঝগড়া নিয়ে প্রশ্ন করাতে উনি বললেন, ওটা ওঁদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। রবার্ট ফোন করে ক্ষমাও চেয়েছে তার জন্যে। যখন জানতে চাইলাম, শেষবার ওঁদের কবে কথা হয়েছে? উত্তরে বললেন, আর কথা হয়নি। রবার্ট বলেছিল ফোনে আর ওকে ধরা যাবে না, লাইনটা ডিসকানেক্ট করা হচ্ছে।

আমি যখন জানলাম যে রবার্ট উড মারা গেছেন, মনে হল শুনে খুবই আপসেট। একটু সামলে নিয়ে বললেন, সবে চাকরিতে ঢুকেছেন, এক্ষুণি ওঁর পক্ষে আসা সম্ভব নয়, তবে ফিউনারেল এক্সপেন্স-এর জন্য যা লাগবে উনি তা পাঠিয়ে দেবেন।"

কথাগুলো বলে বিল ক্রস একেনবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "সরি, আপনার কথার প্রসঙ্গে অনেক কিছু বলে ফেললাম। ... আপনি রবার্ট উড 'ইউরোপা' না কীসের অথরিটি বলছিলেন?"

"ইউরোপা নয় স্যার, হরপ্পা।"

"সেটা কি?"

"ওটা ইন্ডিয়ার একটা পুরোনো সিভিলাইজেশন।"

বিল ক্রস চোখটা একটু কুঁচকে বললেন, "ইণ্ডিয়ার না পাকিস্তানের?"

আমি মনে মনে ভাবছি কী ভাবে এর উত্তর বিল ক্রসের মাথায় ঢোকানো যাবে। কিন্তু প্রয়োজন নেই বুঝলাম। প্রশ্নটা করার জন্য করা। উত্তরটা ওঁর জানা। বললেন, "এইসব

ব্যাপারেই উনি পাকিস্তান গর্ভনমেন্টের কনসাল্টেন্ট বা কিছু ছিলেন। মাঝে মাঝে পাকিস্তান থেকে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে লোকে আসত। যেদিন উনি মারা যান, সেদিনও এসেছিল একজন, প্রতিবেশীর কাছে ওঁর খোঁজ করছিল।”

“ভেরি ইন্টারেস্টিং স্যার।”

“ ইন্টারেস্টিং কিনা জানি না, কিন্তু এটা একটা হেডেক। গত দু’বছরে তিনটে ডেথ কেস আমরা ক্লোজ করতে পারিনি, তার মধ্যে দুটো ডেফিনিটলি হোমিসাইড। এটা নিয়ে হবে চারটে আনরিসলভ্‌ড কেস।”

ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট বললেন, “বিল, তুমি একেনকে কাজে লাগাও। হেডেক কমানোর এমন চমৎকার ওষুধ কোথাও পাবে না। কি বলো একেন?”

“কী যে বলেন স্যার। ওঁর অফিসে কি আর ডিটেকটিভের অভাব!”

“অভাব না থাকুক, আপনি একটু সাহায্য করলে তো সুবিধাই হয়। স্টুয়ার্ট তো আপনার প্রশংসায় সবসময়ে পঞ্চমুখ।”

“উনি স্যার, আমাকে একটু বেশি স্নেহ করেন।”

“যোগ্য লোককেই নিশ্চয় করেন, ” বিল ক্রস বললেন।

“তোমার কোনো আপত্তি আছে নাকি প্রফেসরের অ্যাপার্টমেন্ট আর যেখানে ওঁর ডেডবডি পাওয়া গেছে — সে জায়গাটা দেখাতে?” ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট বিল ক্রসকে জিজ্ঞেস করলেন।

“সে কি কথা, আপত্তির কী আছে?” বলে বিল ক্রস আমাদের নিয়ে বেরোলেন।

## ।। ৪ ।।

আমরা অল্প পরেই একটা ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে পৌঁছলাম। পোকোনোর এই দিকটা পুরোনো, দুয়েকটা ম্যানশন ছাড়া ছোটো ছোটো বাড়ি আর অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ ভরা। সংস্কারের অভাবে অনেকগুলোরই জরাজীর্ণ অবস্থা। একটা ডুপ্লেক্স বিল্ডিং-এর বাঁদিকের দরজা খুলে বিল বললেন, “এটাই প্রফেসরের অ্যাপার্টমেন্ট। কোনো কিছু সরানো হয়নি।”

ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে একেনবাবু প্রশ্ন করলেন, “মারা যাবার ঠিক আগে দুয়েকদিনের মধ্যে ওঁর বাড়িতে কি কেউ এসেছিলেন?”

“কেবল সার্ভিসের একটি লোক এসেছিল। তার কাছে জেনেছি ওঁর কেবল টিভি কাজ করছিল না, সার্ভিস কল ছিল। আর ক্যুরিয়র সার্ভিসের একটা লোক এসেছিল পার্সেল ডেলিভারি করতে।”

“কিসের পার্সেল স্যার?”

“বইয়ের।” বলে একটা বেডরুম, যেটা প্রফেসর মনে হয় স্টাডি হিসেবে ব্যবহার করতেন সেখানে ঢুকে টেবিলের ওপর রাখা বইয়ের একটা খোলা পার্সেল দেখালেন। টেবিলের উপরে বেশ কয়েকটা ভাঙা পাথরের মূর্তি আর কিছু কাগজপত্র ছড়ানো। একেনবাবু দেখলাম খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেগুলো দেখছেন।

“ও একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস, সেটাও আপনাকে দেখাই,” বলে টেবিলের ড্রয়ার খুলে

একটা চিঠি বের করলেন। চিঠিটা পুরোনো, পাতার নানা জায়গায় খাঁজ পড়া, কোনো তারিখ দেওয়া নেই। ইংরেজিতে লেখা চিঠি যার অনুবাদ—

প্রিয়তম R,

তুমি ভয় পাচ্ছো আমাদের সম্পর্কের কথা ও আঁচ করছে। সে তো আগেও করেছে, তাতে কী হয়েছে? আমি মনঃস্থির করেছি ওকে ছেড়ে তোমার সঙ্গেই থাকব; আর দেরি কোরো না। আগেও লিখেছি, আবার লিখছি এক্ষুণি চলে এসো।

তোমার
জানোই তো কে, C

"কার লেখা স্যার এটা?"

"রবার্ট উডের এক্স-ওয়াইফের। ওঁর বহু প্রেমিক ছিল বলে বাজারে গুজব। প্রফেসর উড ছিলেন সেই প্রেমিক দলের সপ্তম বা অষ্টম।"

"ভেরি ইন্টারেস্টিং স্যার, ভেরি ইন্টারেস্টিং। আর কোনো চিঠি পেয়েছেন?"

"না, পার্সোনাল চিঠি বলতে ওই একটাই।"

আবার 'ভেরি ইন্টারেস্টিং' বলে একেনবাবু এদিক ওদিক ঘরটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। একটা আলমারিতে বেশ কিছু ছোটোবড়ো পাথরের টুকরো, কয়েকটা ভাঙ্গা মূর্তি, পাথরের ফলা, ধাতুতে গড়া ছোটোখাটো কয়েকটা জিনিস — ঠিক কী বুঝলাম না, তবে সবগুলোই ধূলিধূসরিত অবস্থায় পড়ে আছে। বইপত্র কিছু আলমারিতে, কিছু মেঝেতে — বলতে গেলে যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে। টেবিল ল্যাম্পের শেডটা ভাঙ্গা। সমস্ত ঘরটাই অত্যন্ত অগোছালো।

একেনবাবু আলমারির জিনিসগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "এগুলোর দাম কত হবে স্যার?"

"গুড কোয়েশ্চেন। এত পুরোনো জিনিস যখন, কালেকটারদের কাছে দাম নিশ্চয় আছে।" বিল ক্রস বললেন।

"ওঁর কোনো ইন্সিওরেন্স ছিল?" ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট জিজ্ঞেস করলেন।

"সাধারণ অ্যাপার্টমেন্ট ইন্সিওরেন্স। জিনিসপত্রের জন্য বড়োজোর পঞ্চাশ হাজার ডলারের কাভারেজ।"

আমার নিজের এইসব জিনিস সম্পর্কে ধারণা নেই। তাও মনে হল যতগুলো জিনিস রয়েছে দেখলাম, সেগুলোর দাম কম হবে না। ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট একটা পাথরের মূর্তি তুলে বললেন, "হয়তো হাজার হাজার ডলার খরচা করে উনি এগুলোই কিনতেন। কুড বি স্মাগলড গুডস।"

আমিও তাই ভাবছিলাম। প্রফেসর উডের সঙ্গে নিশ্চয় কোনো ইন্টারন্যাশনাল গ্যাং-এর যোগাযোগ ছিল যারা এইসব প্রত্নতাত্ত্বিক জিনিস চুরি করে ওঁকে বিক্রি করত।

বিল ক্রসের মাথায় বোধ হয় সেই চিন্তাটা আগে আসেনি। একটু চিন্তিত ভাবেই বললেন, "কোয়াইট পসিবল। এইসব লোকদের সঙ্গে ক্যাশ দিয়েই কারবার করতে হয়।"

একেনবাবু দেখলাম গম্ভীরভাবে, কী জানি ভাবছেন। বললেন, "এবার চলুন স্যার, খাদটার কাছে যাই।"

"নিশ্চয়।"

জায়গাটা খুব একটা দূরে নয়। হাঁটা পথে মিনিট পাঁচেক। যে পথটা পাহাড়ের ধার দিয়ে নেমে বড়ো রাস্তায় পড়েছে তার পাশ দিয়ে বেড়িয়েছে একটা সরু পায়ে হাঁটার পথ। চারিদিক গাছপালায় ঢাকা। শেষ হয়েছে ছোট্ট একফালি মাঠে। সেখানে দু'টো বসার বেঞ্চি যেখান থেকে নীচে পোকোনো মেইন রোডটা এঁকে বেঁকে গেছে দেখা যায়। বেঞ্চিগুলোর ফিট দশেক সামনে নীচু জরাজীর্ণ তারের বেড়া। সেখানে কিছু দূর অন্তর অন্তর সাবধানবাণী আটকানো। বেড়াটা অনেক জায়গাতে ভেঙ্গেও পড়েছে। সেখানে 'ওয়ার্নিং' সাইন ঝুলিয়ে প্লাস্টিকের হলুদ ফিতে লাগানো। কিন্তু বেড়া বা প্লাস্টিকের ফিতে কোনোটাই খুব একটা সুরক্ষা দিচ্ছে না। বেড়ার ঠিক পেছন থেকেই শুরু হয়েছে গভীর খাদ। সতর্ক না হয়ে পাশ দিয়ে হাঁটলে উলটে খাদে পড়ে যাওয়াটা অসম্ভব নয়। সেই খাদেই মৃতদেহটা পাওয়া গিয়েছিল।

আমরা সেদিকে তাকিয়ে আছি দেখে বিল ক্রস বললেন, "বেড়টা বেশ কিছুদিন ধরেই ভাঙ্গা। পুলিশ রিপোর্টও করেছে সারানোর জন্য, কিন্তু পোকোনো মিউনিসিপ্যালিটি। এখনও সময় করে উঠতে পারেনি। হলুদ ফিতেটা ডেডবডিটা পাওয়ার পরে পুলিশ লাগিয়েছে।"

একেনবাবু এগিয়ে গিয়ে খাদের সামনে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে খানিকক্ষণ দেখলেন। আমার কোনো উঁচু জায়গা থেকে নীচের দিকে তাকালেই মাথা ঘুরতে থাকে। আমি কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে সরে এলাম। তারমধ্যেই দেখলাম প্রায় তিরিশ ফুট নীচে পাথরের একটা চাঁই বারান্দার মতো বেড়িয়ে আছে। সেখানেই নাকি ডেডবডিটা পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু খাদের শেষ অন্ততঃ আরও একশো ফুট নীচে হবে।

বিল ক্রস সঙ্গে একটা ফাইল নিয়ে এসেছিলেন খেয়াল করিনি। সেটা খুলে যে অবস্থায় প্রফেসর উডের মৃতদেহটা আবিষ্কৃত হয়েছিল তার কয়েকটা ক্লোজ-আপ ছবি দেখালেন। মৃতদেহের ছবি দেখতে আমার অসুবিধা হয়। তাই ভালো করে তাকালাম না। তবু দেখলাম রক্তাক্ত একটা দেহ চিৎ অবস্থায় ছেতরে পড়ে আছে। মাথার পাশে একটা মলাট খোলা বই আর কয়েকটা পাথরের টুকরো।

একেনবাবু দেখলাম খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছবিটা দেখছেন। "ছবিটার একটা কপি পেতে পারি স্যার?"

"নিশ্চয়, কিন্তু কী বুঝছেন?" বিল ক্রস জিজ্ঞেস করলেন।

"ভেরি ইন্টারেস্টিং, স্যার।"

"বইটা আর পাথরের টুকরোগুলোর কথা বলছেন?" বিল ক্রস বললেন। "বইটা প্রফেসর উডের। পাথরের টুকরোগুলোও ওঁর বাড়ির আলমারির পাথরগুলোর সঙ্গে ম্যাচ করেছে। উনি বাড়ি থেকে বইপত্র, পাথরের মূর্তি — এইসব নিয়ে এখানে এসে প্রায়ই বসতেন। এখানে বসেই নাকি ভাবনা-চিন্তা গবেষণা সব করতেন।"

"টিপিক্যাল খ্যাপা প্রফেসর," স্টুয়ার্ট সাহেব মন্তব্য করলেন।

"এক্স্যাক্টলি," বিল ক্রস স্টুয়ার্ট সাহেবকে বললেন। "আমার বিশ্বাস এটা আত্মহত্যাই। শুধু টাকার ব্যাপারটাই রহস্য হয়ে ছিল। কিন্তু তোমার অ্যাঙ্গেল ধরে এগোলে, সেটাও মনে হয় এক্সপ্লেইন করা যাবে।"

সেদিন ফিরতে ফিরতে আমাদের সন্ধ্যা হল। ফেরার পথে নানান কথার মধ্যে একেনবাবু আচমকা বলে উঠলেন, "আমি এখনও পাজলড স্যার।"

"কীসের কথা বলছ?" ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট জিজ্ঞেস করলেন।

"এই যে গবেষণা করার জন্য বাড়ি থেকে বইপত্তর আর পাথর এনে সেগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আত্মহত্যা। খুবই পাজলিং। কেন অধ্যাপক মশাই সেটা করলেন? কেন স্যার উনি কেবল টিভি সারাতে ডাকলেন, বই কিনলেন? মরে যাবার পর তো কেউ টিভি দেখে না, বইও পড়ে না... আমি সত্যিই কনফিউজড স্যার।"

বুঝলাম আমরা নানান কথা বলছি, কিন্তু প্রফেসরের মৃত্যুটা ওঁর মাথায় এখনও ঘুরছে।

## ।। ৫ ।।

বাড়িতে ফিরে হাতমুখ ধুয়ে একটু রিল্যাক্স করার জন্যেই অমিয় চক্রবর্তীর একটা কবিতার বই নিয়ে বসলাম। একেনবাবু দেখলাম বিল ক্রসের কাছ থেকে আনা ছবিটা মগ্ন হয়ে দেখছেন। সেটা দেখতে দেখতেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী পড়ছেন স্যার?"

"অমিয় চক্রবর্তীর একটা কবিতা। শুনবেন?"

"পড়ুন স্যার, আমি অবশ্য এগুলো বুঝি না।"

আমি 'সংগতি' কবিতাটা পড়লাম। যখন পড়লাম,

'তোমার সৃষ্টি, আমার সৃষ্টি, তাঁর সৃষ্টির মাঝে
যত কিছু সুর, যা-কিছু বেসুর বাজে
মেলাবেন।'

মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "এটা কিন্তু কবি মোক্ষম লিখেছেন স্যার।" বলে চেয়ার থেকে উঠে এসে বিড়বিড় করে নিজেই লাইন তিনটে কয়েকবার পড়লেন। তারপর বোঁ করে নিজের ঘরে চলে গেলেন। টিপিক্যাল একেনবাবু।

খানিকবাদে কান চুলকোতে চুলকোতে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "এক কাপ কফি চলবে নাকি স্যার?"

এমন সময় একটা ফোন। অন্যপ্রান্তে অধ্যাপক গেরহার্ট। একটা ভীষণ দুঃসংবাদ, দীপা আত্মহত্যা করেছেন। ওঁর ডেডবডি নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে।

আমরা সবাই ছুটলাম। গিয়ে দেখি ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টও সেখানে। আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "নিউজ ট্র্যাভেল ফাস্ট।"

একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার স্যার, সুইসাইড?"

"তাইতো মনে হচ্ছে।"

একটা সুইসাইড নোট রেখে গিয়েছেন। সুইসাইডে নোটের বয়ানটাও শুনলাম

'আমার জীবনের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। শুভ, তোকে আশীর্বাদ করে যাচ্ছি, তুই সুখে থাক।

মা'

ডেডবডি অটোপ্সি না করে ছাড়া হবে না। শুভ দেখলাম লাল চোখে এক কোণে দাঁড়িয়ে

কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলছেন। কাউকেই আমি চিনি না, নিশ্চয় ওঁর বন্ধুবান্ধব। চেনাজানার মধ্যে একমাত্র ভৈরববাবু। ভৈরববাবুই বললেন, "সোনাবৌদি হেভি ডোজে কোডিন খেয়েছেন, সম্ভবতঃ শুভ কাজে চলে যাবার পরপরই। ফিরে এসে দেখে সোনাবৌদি আর বেঁচে নেই"

কোডিন ব্যথা কমানোর ওষুধ বলে জানতাম, কিন্তু এটা খেলে যে এত তাড়াতাড়ি মৃত্যু হতে পারে সেটা জানা ছিল না।

প্রমথ দেখলাম জানে। বলল, "কোডিন, মরফিন বা যে কোনও ওপিয়েট নাকি বেশি খেলে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম অ্যাফেক্ট করে। ফলে কোমা-তে চলে গিয়ে রেস্পিরেটরি বা সার্কুলেটরি ফেইলিওর হয়।"

একেনবাবু দেখলাম একটু গম্ভীর হয়ে গেছেন। এদিক ওদিক কিছুক্ষণ উশখুশ করলেন। তারপর ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টকে গিয়ে কী জানি বললেন।

ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট মনে হল শেষে সম্মতি জানালেন। তারপর দুজনে গিয়ে শুভকে বারান্দায় ডেকে নিয়ে গেলেন। আমি আর প্রমথও পিছু পিছু গেলাম।

একেনবাবু শুভর হাতটা ধরে বললেন, "আমি জানি না স্যার, এই দুঃখে আপনাকে আমি কী বলে সান্ত্বনা দেব। কিন্তু এই চরম দুঃখের সময়েও আমি দুয়েকটা প্রশ্ন আপনাকে করব।"

শুভকে এর আগেও নিশ্চয় ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের লোকজন অনেক প্রশ্নই করেছে। বিষণ্ণ মুখে শুভ একেনবাবুকে বললেন, "বলুন।"

"মাস কয়েক আগে আরিফ বলে একটি লোক আপনার বাবার একটি স্যুটকেস আপনাদের বাড়িতে দিয়ে এসেছিলেন, আপনি সেটা জানেন?"

প্রশ্নের আকস্মিকতায় শুভ দেখলাম হতভম্ব এবং বিরক্ত। "এই প্রশ্ন এখন আমায় কেন করছেন?"

"দরকার আছে স্যার, প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।"

"হ্যাঁ, জানি। মা ফোন করে জানিয়েছিলেন।"

"কী বলেছিলেন আপনাকে?"

"মা খুবই আপসেট ছিলেন। ঠিক কী বলেছিলেন আমার স্পষ্ট মনে নেই।"

"আপনি মাকে কিছু জিজ্ঞেস করেননি স্যার, মা এত আপসেট কেন হয়েছেন?"

"করেছিলাম।"

"আপনার মা কী বলেছিলেন?"

"মা বারবার বলছিলেন, তুই বুঝবি না, তোকে বোঝানো যাবে না।"

"আপনি সিওর এই কথাটা মা আপনাকে বলেছিলেন?"

"হ্যাঁ, আমার পরিষ্কার মনে আছে।"

"আপনার মা কি এরকম আপসেট মাঝে মাঝে হতেন?"

"না, মা খুবই ধীর-স্থির ছিলেন, চট করে বিচলিত হতেন না। তাই আমি একটু চিন্তিতই হই, আর সেইজন্যই মা-কে চলে আসতে বলি।"

"আই সি। শেষ প্রশ্ন স্যার, আপনি কি দশ বারো দিনের মধ্যে নিউ ইয়র্কের বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন?"

"না, গত দুসপ্তাহ আমাকে প্রতিদিন কাজে যেতে হয়েছে, এমন কি শনি-রবিবারেও। মা নায়াগ্রা দেখতে চেয়েছিল। গত উইক-এণ্ডে নায়াগ্রা নিয়ে যাব ভেবেছিলাম, কাজের জন্য পারিনি। কোনোদিন আর পারবও না।" গলাটা বুজে এল শুভর।

"আই অ্যাম সরি স্যার, কিন্তু থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।"

## ।। ৬।।

দীপাদেবীর ফিউনারেল হল তিনদিন বাদে। ফিউনারেল হোম থেকে ভৈরববাবুর অনুরোধে আমরা সবাই রাজা-ও-রাণী রেস্টুরেন্টে গেলাম। আমরা মানে — প্রমথ, আমি, একেনবাবু, গেরহার্ট সাহেব আর ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট। শুভ আসতে রাজি হল না। ভৈরববাবুও পেড়াপেড়ি করলেন না। শুভর এক বন্ধু কয়েকদিন ওঁর সঙ্গে থাকবেন বলে এসেছেন। দ্যাট্স নাইস অফ হিম। এ সময়ে একজনের কাছে থাকাটা দরকার।

কোনো ফিউনারেল থেকে ফিরলে মনের যে অবস্থা থাকে, আমাদেরও তাই। প্রিয়জন বা পরিচিতকে চিরতরে হারানোর বেদনা তো থাকেই, সেইসঙ্গে জীবনের অসারতা, অনিত্যতা যেন আরও স্পষ্ট হয়ে মনটা ভারাক্রান্ত করে তোলে। শুভকে বাদ দিলে দীপাদেবীর মৃত্যু প্রফেসর গেরহার্টকে বোধ হয় শোকাপ্লুত করেছে সবচেয়ে বেশি। ভৈরববাবুর মনও যথেষ্ট খারাপ। সেটা কাটিয়ে ওঠার জন্যই নিজেকে নানানভাবে ব্যস্ত রাখছেন। ওয়েটারকে অনেক রকম নির্দেশ দিলেন মেনু নিয়ে।

রেস্টুরেন্টটাকে নতুন করে সাজানো হচ্ছে। নতুন একটা ভিডিও সিস্টেম পার্টিরুমে লাগিয়েছেন। সেটা সবাইকে ডেকে দেখালেন। দেয়ালের ওয়ালপেপার বদলানো হয়েছে। অনেক নতুন ছবি টানানো হয়েছে দেখলাম। আমার এসব ব্যাপারে উৎসাহ নেই, কিন্তু একেনবাবু আর ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট আগ্রহভরে এগুলো দেখলেন, প্রশ্নটশ্নও কিছু করলেন। এরমধ্যেই একটি ওয়েটার এক প্রস্থ স্পেশাল কফি আর মশলা চা নিয়ে এল, সেই সঙ্গে কিছু পেস্ট্রি আর ডেনিশ। ভৈরববাবু জিজ্ঞেস করলেন, টোস্ট বা অমলেট কেউ খেতে চাই কিনা। সবাই 'না' বললাম।

একটু বাদে প্রফেসর গেরহার্ট উশখুশ করে 'আমি আর বসব না' বলে উঠে দাঁড়ালেন। বারবার ভৈরববাবু অনুরোধ করাতেই উনি এসেছিলেন। সারাক্ষণই অন্যমনস্ক ছিলেন। মানসিকভাবে দীপাদেবীর সঙ্গে যে উনি নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

"একটু বসুন স্যার, আপনি আমায় একটা কাজের ভার দিয়েছিলেন। যদিও দীপাদেবী সেই দায়িত্ব থেকে আমাকে মুক্তি দেন, তবু তার রিপোর্টটা অন্ততঃ আপনাকে দিই।"

"তার কি আর কোনো দরকার আছে?" গলার স্বরেই স্পষ্ট সেটা জানার আগ্রহ ওঁর তরফ থেকে অন্তত নেই।

"আছে স্যার, আপনি শুনলে বুঝতে পারবেন।"

গেরহার্ট সাহেব অত্যন্ত ভদ্রলোক। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বসলেন।

একেনবাবু চায়ে একটা চুমুকুদিয়ে হঠাৎ ভৈরববাবুকে প্রশ্ন করলেন, "স্যার আপনি এরমধ্যে দীপাদেবীকে নিয়ে পোকোনোতে গিয়েছিলেন?"

প্রশ্নটা এত আকস্মিক যে ভৈরববাবুর হাত কেঁপে কিছুটা চা চলকে মাটিতে পড়ল।

"ত-তার মানে?" ভৈরববাবু কোনোমতে কথাটা বললেন।

"মানেটা পরে আসছি স্যার, কিন্তু সত্যি কথা বলবেন, কারণ আপনি গিয়েছিলেন কিনা, সেটা টোল-বুথের রেকর্ড থেকে স্টুয়ার্ট সাহেব অতি সহজেই বার করতে পারবেন। তাছাড়া পোকোনোতে আপনাকে দেখেছেন এমন লোকও আছেন।"

চায়ের কাপটা ভৈরববাবু তখনও ধরে আছেন, কিন্তু হাতটা অল্প অল্প কাঁপছে। একটু চুপ করে অনুচ্চস্বরে বললেন, "হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।"

"কেন স্যার?"

ভৈরববাবু চুপ।

"প্রফেসর উডের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল, সেটা আমি জানি। কিন্তু কেন গিয়েছিলেন আর কী ঘটেছিল সেখানে, সেটা স্যার আপনার মুখ থেকেই শুনতে চাই। কিছু লুকোনোর চেষ্টা করবেন না, প্লিজ।"

ভৈরববাবু দেখলাম একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছেন। মুহূর্তের মধ্যে কারও গলা ভেঙে যেতে পারে, সেটা আমি এই প্রথম দেখলাম। ভাঙা ভাঙা গলায় থেমে থেমে ভৈরববাবু বললেন, "সোনাবৌদি পোকোনোতে যেতে চেয়েছিলেন। আমি ভেবেছিলাম বেড়াতে যেতে চান। সেখানে পৌঁছনোর পর উনি প্রফেসর উডের ঠিকানা দিলেন। বললেন ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। প্রফেসর বাড়িতে ছিলেন না। পাশের বাড়ির একজন বললেন যে প্রফেসর উপরে একটা টিলায় বসে পড়াশুনা করেন। সেখানে সোনাবৌদিকে নিয়ে যেতেই সোনাবৌদি এগিয়ে গিয়ে ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করেন। আমি একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলাম সব কিছু ভালো শুনতে পাইনি।" এটুকু বলে ভৈরববাবু চুপ করলেন।

"যা শুনেছিলেন তাই বলুন স্যার। আর ঠিক কী কী ঘটেছিল সেটা বলুন।"

"প্রফেসর বেঞ্চে বসে একটা বই পড়ছিলেন। সোনাবৌদি সামনে গিয়ে একটা পাথর প্রফেসরকে দিতে উনি অবাক হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। সোনাবৌদি বললেন, 'এটা আপনার পাথর।'

প্রফেসর বললেন, 'এটা আপনি কোত্থেকে পেলেন?'

সোনাবৌদি বললেন, 'বলছি, কিন্তু তার আগে বলুন দেবেশ রায়কে মারা হল কেন' বা ঐরকম একটা কিছু। প্রফেসর কথাটা শুনে কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন। সোনাবৌদি এগিয়ে গিয়ে পাথর শুদ্ধ ওঁর হাতটা চেপে ধরে বললেন, 'এই পাথর আপনার, কিন্তু আপনাকে বলতেই হবে কেন আমি আমার স্বামীকে হারালাম?' তারপর এগোতে এগোতে সোনাবৌদি আরও কিছু বললেন। প্রফেসর পেছোচ্ছিলেন, কিছু একটা বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু আমি ঠিক শুনতে পাইনি। তবে সোনাবৌদির এই মূর্তি আমি আগে দেখিনি। ওঁকে প্রায় উন্মাদিনীর মতো মনে হচ্ছিল। সমস্ত ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটছে যে আমার বোধ-বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল। প্রফেসর ওঁর হাত ছাড়াবার চেষ্টা করছিলেন। না পেরে শেষে ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে পালাতে গিয়ে খাদের মধ্যে পড়ে যান। সমস্ত ঘটনাটাই কয়েক মিনিটের মধ্যে শেষ। সোনাবৌদি তখন ভীষণ কাঁদছেন, খালি বলছেন, 'আমি তো এটা চাইনি, আমি তো এটা চাইনি, এখন কী হবে?'

আমিও পুরো নার্ভাস। কী করা উচিত, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। ভীষণ ভয় পেয়ে কোনোমতে সোনাবৌদিকে গাড়িতে তুলে আমি চলে আসি। বিশ্বাস করুন প্রফেসরের মৃত্যুটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট, সোনাবৌদির কোনো দোষ নেই।" কথাগুলো বলে ভৈরববাবু কপালে হাত দিয়ে মাথা নীচু করে বসে রইলেন।

ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট উঠে এসে ওঁর কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, "আপনি আমার সঙ্গে চলুন, পুলিশ স্টেশনে গিয়ে আপনাকে স্টেটমেন্ট দিতে হবে।"

ভৈরববাবু আকুলদৃষ্টিতে একেনবাবুর দিকে তাকালেন।

"ভয় পাচ্ছেন কেন স্যার, যা সত্যি তাই বলবেন," একেনবাবু বললেন।

## ।। ৭ ।।

আমরা সবাই একেবারে হতবাক হয়ে বসে আছি। ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট ভৈরববাবুকে নিয়ে যাবার পর প্রমথ বলল, "আপনি অবাক করলেন মশাই, কীভাবে জানলেন ভৈরববাবু প্রফেসর উডের মৃত্যুর ব্যাপারটা জানেন?"

"সন্দেহটা একটু একটু করে হচ্ছিল স্যার, কিন্তু দীপাদেবীর সুইসাইডের পর প্রায় নিশ্চিত হলাম।"

"হেঁয়ালি ছেড়ে ভালো করে ব্যাপারটা বলুন তো।" প্রমথ ধমক দিল। "আর একটু সহজ করে বলুন, বাপিকে তো আবার লিখতে হবে আপনার কীর্তিকাহিনি। সহজ করে না বললে ওর মাথায় ঢুকবে না।"

একেনবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "প্রমথবাবু না স্যার, সত্যি!"

আমি বললাম, "ওর কথায় কান দেবেন না। যেমনভাবে বলতে চান, বলুন।"

একেনবাবু বাকি চা-টুকু খেয়ে শুরু করলেন, "আসলে দীপাদেবীর কেসটাতে কতগুলো ব্যাপার আমাকে ভীষণ কনফিউজড করছিল। এক নম্বর — দেবেশবাবু হরপ্পা বিশেষজ্ঞ না হয়েও হরপ্পায় যাবার সুযোগ কেন পেলেন? দু'নম্বর — স্বামীর মৃত্যুর পর চার বছর বাদে তাঁর একটা স্যুটকেস পেয়ে দীপাদেবী কেন অত বিচলিত হলেন? তিন নম্বর — সেই স্যুটকেস থেকে একটা পাথর দীপাদেবী নিয়ে এলেন, কিন্তু সেটা হারিয়ে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়েও সেটা ফেরৎ পাবার কোনো চেষ্টাই করলেন না।

কোনো প্রশ্নেরই সদুত্তর খুঁজে পাচ্ছিলাম না স্যার। এরপর পোকোনোতে গিয়ে রবার্ট উডের মৃত্যুর ব্যাপারে যা শুনলাম তাও বেশ কনফিউজিং। কেন উনি হরপ্পা থেকে ফিরে এসে মাত্র এক বছরের বিবাহিত স্ত্রী ম্যাডাম ক্লারাকে সম্পত্তির অধিকাংশ জিনিস দিয়ে ডিভোর্সে রাজি হলেন? কাকে তিনি কিছুদিন অন্তর অন্তর মোটা টাকা দিতেন? কেন তিনি ম্যাডাম ক্লারার পুরোনো একটা প্রেমপত্র রেখে দিয়েছিলেন? কেন উনি হঠাৎ আত্মহত্যা করতে গেলেন, যেখানে দুয়েকদিন আগেও আত্মহত্যার কোনো ইচ্ছে ছিল না? ফ্র্যাঙ্কলি স্যার আই হ্যাড নো ক্লু, কী থেকে কী হচ্ছে! তারপরেই বাপিবাবু আমার চোখখুলে দিলেন।"

"আমি!" অবাক হয়ে বললাম।

"হ্যাঁ স্যার, ঐ যে কবিতাটা, 'যত কিছু সুর, যা-কিছু বেসুর বাজে, মেলাবেন।' ঠিক তখনই আমার মনে হল দেবেশবাবুর মৃত্যু, প্রফেসর উডের মৃত্যু — এগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় স্যার। ধীরে ধীরে ক্লিয়ার হতে শুরু করল প্রফেসর উডের পাশে পাওয়া পাথরের টুকরোগুলোর সঙ্গে দীপাদেবীর পাথরের মিলটা।"

"আঃ, এতকথা না বলে বলুন ব্যাপারটা কী?" প্রমথ অধৈর্য হয়ে বলল।

"বলছি স্যার, বলছি। দেবেশবাবু রিটায়ার করার কিছুদিন আগে একটা ফেলোশিপ

পেয়ে আমেরিকাতে এসেছিলেন। প্রথমে স্ট্যানফোর্ডে এসেছিলেন পরে প্রিন্সটনে যান। প্রিন্সটনে কাজ করছিলেন প্রফেসর উডের সঙ্গে। প্রফেসর উড তখন রিটায়ার করে রিসার্চ প্রফেসর। ধরে নিচ্ছি নিজের বাড়িতেই রিসার্চের কাজ অনেক করতেন। সেই সূত্রে দেবেশবাবুর সঙ্গে রবার্ট উডের স্ত্রী ক্লারার পরিচয় হয়। রবার্ট উডের অজান্তেই সেই চেনাজানাটা দ্রুতগতিতে ঘনিষ্ঠতার পর্যায়ে পৌঁছয়। প্রফেসর উড সেটা জানতে পারেন, সে নিয়ে ওঁদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটিও নিশ্চয় হয়। কিন্তু এবার হল মুশকিল, রিসার্চের কাজে প্রফেসরকে যেতে হবে হরপ্পায়। নিজের সুন্দরী স্ত্রীকে ওঁর বিশ্বাস নেই, দেবেশবাবুকেও নয়। তখন রবার্ট সাহেব একটা প্ল্যান ফাঁদলেন। উনি দেবেশবাবুকে হরপ্পায় ওঁর সঙ্গে যেতে বললেন, যদিও দেবেশবাবুর কাজ হরপ্পার উপরে নয়। মনে আছে স্যার, স্টুয়ার্ট সাহেবের বন্ধু স্ট্যানফোর্ডের সেই প্রফেসরের কথা— যিনি খুব অবাক হয়েছিলেন দেবেশবাবুর হরপ্পা যাবার কথা শুনে। ধরে নিচ্ছি দেবেশবাবুর খরচা পাতি প্রফেসর উড নিজেই দিয়েছিলেন... ম্যাডাম ক্লারাকে দেবেশবাবুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এটা কোনো খরচই নয়।

দেবেশবাবুও প্রস্তাবে রাজি হলেন। হয় ওঁর নেশা কেটে গিয়েছিল, নয় উনি ভয় পাচ্ছিলেন প্রফেসর ওঁর অফিসে যদি ব্যাপারটা রিপোর্ট করেন, তাহলে একটা কেলেঙ্কারি হবে। বাকি প্রোগ্রাম ক্যানসেল করে উনি দেশে ফিরে গেলেন। এই জন্যই ওঁর ফেলোশিপে স্ট্যানফোর্ডে যাওয়ার কথা থাকলেও উনি আর যেতে পারেননি। তারপর দীপাদেবীকে বলে দেবেশবাবু হরপ্পায় গেলেন।”

“একটা প্রশ্ন”, প্রমথ বলল, “দেবেশবাবু যে রবার্ট উডের সঙ্গে যাচ্ছেন সেটা দীপাদেবীকে জানালেন না কেন।”

“ভেরি গুড কোয়েশ্চেন স্যার, একটু বাদেই সেখানে আসছি। হ্যাঁ, যা বলছিলাম প্রফেসর উড সাহেব যেটা বোঝেননি, সেটা হল ম্যাডাম ক্লারা দেবেশবাবুর জন্য একেবারে পাগল। দেবেশবাবুর মনোভাব জানা কঠিন, কিন্তু উনি নিশ্চয় ফাটা বাঁশের মাঝখানে স্যার। একদিকে দীপাদেবী, ম্যাডাম ক্লারাকেও এড়াতে পারছেন না, আবার প্রফেসর উডেরও ভয় আছে। হরপ্পায় ফোনে যোগাযোগ করতে পারাটা কঠিন, তাই মনে হয় ম্যাডাম ক্লারা তাঁর মনের কথা জানিয়ে দেবেশবাবুকে একটা চিঠি লিখেছিলেন। হয়তো একাধিক চিঠি লিখেছিলেন, কিন্তু একটা চোখে পড়েছিল রবার্ট উডের। এটুকু বলে আমার দিকে তাকিয়ে একেনবাবু বললেন, প্রফেসর উডের বাড়িতে যে চিঠিটা আপনি আর ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট দেখেছিলেন, সেটা প্রফেসর উডকে উদ্দেশ্য করে লেখা নয়,

সেটা দেবেশবাবুকে লেখা চিঠি। প্রিয়তম R-এর R হল রয়, দেবেশবাবুর পদবি, রবার্ট নয়। আমার বিশ্বাস ঐ চিঠিটাই প্রফেসর উডের হাতে কোনো-না-কোনোভাবে পৌঁছেছিল। মানুষের মন বিচিত্রভাবে কাজ করে স্যার। কেন ম্যাডাম ক্লারার আর কোনো চিঠি বাড়িতে না রেখে, শুধু এই চিঠিটাই প্রফেসর রেখে দিয়েছিলেন, সেটা মনোবিদরাই বলতে পারবেন।”

“যাইহোক,” একেনবাবু বলে চললেন, “প্রফেসর উড নিশ্চয় এই চিঠিটা দেখে ক্ষেপে উঠলেন। তারপর কী হল আমরা শুধু অনুমান করতে পারি স্যার। আমার ধারণা, দেবেশবাবু ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটবে আশঙ্কা করেছিলেন। সেই ভয়ে স্যুটকেস প্যাক করে, ক্যাম্প ছেড়ে পালাবার উদ্দেশ্যে স্টেশনে যাচ্ছিলেন। ওঁদের দুজনের মধ্যে তিক্ততা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে দেবেশবাবু ওঁর রিসার্চ পণ্ড করার জন্য ওঁদের যেটা সবচেয়ে বড়ো আবিষ্কার সেই পাথরটা নিজের স্যুটকেসে প্যাক করে নিয়েছিলেন। কিন্তু অদৃশ্য

হতে পারার আগেই তিনি খুন হন। প্রফেসর উড নিজে দেবেশবাবুকে খুন করেছিলেন, না অন্য কেউ ওঁর হুকুমে গুলি চালিয়েছিল, সেটা স্যার জানা অসম্ভব। তবে উনি যে দেবেশবাবুর মৃত্যুর জন্য দায়ী সে বিষয় আমি নিশ্চিত।"

"ওয়েট এ মিনিট," প্রমথ বলল, "এটা তো শ্রেফ আপনার কল্পনা বলে আমি উড়িয়ে দিতে পারি।"

"তা পারেন স্যার, কিন্তু তাহলে প্রফেসর উডের পরের অ্যাকশনগুলো এক্সপ্লেইন করতে পারবেন না।"

"তার মানে?"

"একটু ভাবুন স্যার, প্রফেসর ফেরা মাত্র ম্যাডাম ক্লারা ডিভোর্স চাইলেন আর প্রফেসর উচ্চবাচ্য না করে ম্যাডামকে বাড়ি, গাড়ি, ইত্যাদি — যা প্রাপ্যের থেকে অনেকে বেশি দিয়ে দিলেন। কেন?"

"আই ডোন্ট নো।"

"তার একটাই সম্ভাব্য কারণ স্যার, প্রফেসর উডের সঙ্গে যখন দেবেশবাবুর ঝগড়া চলছে, তখন দেবেশবাবু নিশ্চয় আঁচ করতে পেরেছিলেন যে ওঁর জীবনসংশয় হতে পারে। সেটা তিনি ম্যাডাম ক্লারাকে জানিয়েছিলেন। দেবেশবাবুর মৃত্যুর পর, সেটাই হয়ে দাঁড়াল ম্যাডাম ক্লারার তুরুপের তাস। প্রেমিককে তিনি পেলেন না, কিন্তু তার জন্য খেসারত পুরোপুরি আদায় করলেন প্রফেসর উডের কাছ থেকে। শুধু তাই নয়, আমার বিশ্বাস ডিভোর্সের পরেও যখন প্রয়োজন হতো সোজা এসে দশ পনেরো হাজার ডলার নিয়ে চলে যেতেন। টাকা না দিলে পুলিশের কাছে সব কিছু ফাঁস করে দেবেন ভয় দেখিয়ে। প্রফেসরের ভাঁড়ার যখন শূন্য হয়ে আসে তখন ম্যাডাম ক্লারা ক্যালিফোর্নিয়া চলে যান।"

"বুঝলাম, কিন্তু দীপাদেবী কেন সন্দেহ করলেন স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে রবার্ট উড জড়িত?"

"দীপাদেবীর চরিত্রটা স্যার মোস্ট কমপ্লেক্স। উনি পাথরটা নিয়ে এসেছিলেন অনেক ঝুঁকি নিয়ে। এইসব জিনিস বাইরে আনা বে-আইনি নিশ্চয় উনি জানতেন। তবু ওটা এনেছিলেন যাঁর প্রাপ্য তাঁকেই ফেরত দিতে। উনি জানতেন কার সঙ্গে দেবেশবাবু হরপ্পা গিয়েছিলেন, তবে জানতেন না কোথায় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে। নিজের অজান্তেই ওঁকে সাহায্য করলেন প্রফেসর গেরহার্ট।"

প্রফেসর গেরহার্ট বললেন, "দীপা তো প্রফেসর উড সম্পর্কে কিছু জানতে চাননি, আমিই বরং উদ্যোগী হয়েছিলাম।"

"তা চাননি স্যার, কিন্তু পাথরের প্রসঙ্গটা উনিই তুলেছিলেন। শুধু তাই নয় বলেছিলেন পাথরটা উনি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। স্বামীর মৃত্যু-কাহিনিতে এই পাথরের গল্পটা যোগ করা আমার একটু অবান্তর মনে হয়েছিল স্যার। কিন্তু দীপাদেবী জানতেন যে এই পাথর সম্পর্কে ইন্টারেস্ট শুধু কয়েকটি লোকের থাকবে। তাঁদের কাছ থেকেই প্রফেসর উডের খবর পাওয়া যাবে।"

প্রমথ বলল, "কিন্তু এত বাঁকা পথে এগোনোর কি দরকার ছিল, সোজাসুজি গেরহার্ট সাহেবকে বললেই তো হত।"

"তার কারণ খুব সিম্পল, উনি চাননি প্রফেসর উড আগের থেকেই জানুন যে দেবেশ রায়ের স্ত্রী ওঁর খোঁজ করছেন। দীপাদেবী আঁচ করেছিলেন স্বামীর মৃত্যুর ব্যাপারে প্রফেসর উড সম্ভবত জড়িত। সন্দেহ শুরু হয়েছিল ওই স্যুটকেসটা পাবার পর থেকে। হয় যে নিয়ে এসেছিল তার দেওয়া কোনো খবরে অথবা স্যুটকেসের ভেতর ম্যাডাম ক্লারার

কোনো চিঠিপত্র থেকে। দেবেশবাবু যে নারীঘটিত কোনো একটা সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁর আকস্মিক মৃত্যুটা কোনো ডাকাতের আক্রমণে নয়, এই সন্দেহ মনে হয় তাঁর জেগেছিল। যেটা আমরা জানি স্যার, সেটা হল স্যুটকেস পেয়ে দীপাদেবী খুবই বিচলিত হয়েছিলেন। শুভবাবু মাকে ধীরস্থির মহিলা বলেই জানতেন। তিনি মা-কে এরকম আপসেট হতে দেখে যখন প্রশ্ন করেছিলেন, দীপাদেবীর উত্তর, 'তুই বুঝবি না, তোকে বোঝানো যাবে না।' বাবার মৃত্যুতে মায়ের দুঃখ হয়তো ছেলেকে বোঝানো যায় স্যার। কিন্তু বাবার পদস্খলনে মায়ের দুঃখটা ছেলেকে বোঝানো শক্ত।"

এটুকু বলে একেনবাবু একটু চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "দীপাদেবী একজন রিমার্কেবল লেডি স্যার। ওঁর কর্তব্যজ্ঞান প্রবল। বহুমূল্য পাথরটা উনি যাঁর প্রাপ্য, যিনি এর সুব্যবহার করতে পারবেন — তাঁর হাতেই ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। অন্যপক্ষে শি ওয়াজ ইন এ মিশন টু ফাইণ্ড দ্য ট্রুথ।"

"তা বুঝলাম, কিন্তু ভৈরববাবু এ ব্যাপারে জড়িত — সেটা সন্দেহ করলেন কেন?"

"কারণ মনে হল স্যার, এ ব্যাপারে যিনি ওঁকে সাহায্য করতে পারেন তিনি হচ্ছেন ভৈরববাবু। ভৈরববাবুকে দীপাদেবী বহুদিন ধরে চিনতেন। তিনি ছিলেন প্রায় ভাইয়ের মতো এবং ওঁর প্রতি নিবেদিত-প্রাণ। একমাত্র তাঁর সাহায্যই চাওয়া যায় প্রফেসর উডের বাড়িতে পৌঁছে দেবার জন্য। ওই একটা জায়গাতেই আমি একটু চান্স নিয়েছিলাম স্যার। শুভর কোনো বন্ধুর সাহায্য নিতে পারতেন। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল এই মিশনে ছেলের কোনো বন্ধুকে জড়াবেন না। কিন্তু দেখলাম ভৈরববাবুকে চেপে ধরতেই বেশ মিলে গেল।"

"তাহলে পাথর চুরি হয়ে যাবার ব্যাপারটা পুরো সাজানো?"

"হ্যাঁ স্যার, হয়তো ভৈরববাবুর সঙ্গে পরামর্শ করেই গল্পটা বানিয়েছিলেন। কিন্তু প্রফেসর উডের মৃত্যুর জন্য যে তিনি দায়ী এই চিন্তাটা কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারছিলেন না। সেইজন্যই ওই ঘটনার পরে উনি মানসিকভাবে একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এরমধ্যে অধ্যাপক গেরহার্ট আমাকে নিযুক্ত করলেন চুরির কিনারা করতে। তখনই হল মুশকিল। খবরটা শুনে ভৈরববাবু নিশ্চয় ওঁকে সতর্ক করেছিলেন, কারণ ওঁর আবার আমার ক্ষমতার উপর একটু বেশি আস্থা। তাই প্রথমে 'হ্যাঁ' বলেও দীপাদেবী পিছিয়ে যান। ভৈরববাবুও স্যার নিশ্চিত হতে চাইছিলেন যে চুরি নিয়ে আমি আর তদন্ত করছি না, তাই বাপিবাবুকে দিয়ে সেটা কনফার্ম করার চেষ্টা করেছিলেন। চুরি-রহস্যের সমাধান হয়ে গেলে উনিও তো সমস্যায় পড়বেন। এদিকে বাঁচার ইচ্ছে দীপাদেবীর ফুরিয়েই আসছিল, সেটা তো দেখলেনই স্যার।"

আমি আর প্রমথ চুপ। প্রফেসর গেরহার্ট শুধু মাথা নেড়ে বললেন, হোয়াট এ ট্র্যাজেডি।

# ‘স্পোকেন ইংলিশ’ মার্ডার মিস্ট্রি

বইয়ের গ্রুপ ॥ বইয়ের চ্যানেল

।। ১।।

ডিসেম্বর মাস শেষ হবার মুখে। অন্যান্য বছরের তুলনায় কলকাতায় শীত নাকি একটু বেশি পড়েছে। রাস্তায় দেখছি শাল সোয়েটার কোট আর মাফলারের ছড়াছড়ি। কান-ঢাকা মাঙ্কি ক্যাপও চোখে পড়ছে, বিশেষ করে ভোরবেলায় আর সন্ধ্যার পরে। আমার শীত তেমন লাগছে না, বোধহয় নিউ ইয়র্কে ঠান্ডায় অভ্যস্ত বলে। গেঞ্জির ওপর ফুল হাতার সার্ট পরেই ঘোরাঘুরি করছি। এই বাহাদুরির ফলে না শ্রেফ পল্যুশনের জন্যে খুক-খুকে একটা কাশি হয়েছে যা কিছুতেই যাচ্ছে না! প্রমথর দেখছি কিছুই হয়নি, হালকা একটা সোয়েট সার্ট চাপিয়ে দিব্বি ঘুরে বেড়াচ্ছে!

ওই যাঃ, যেটা বলতে ভুলে গেছি — এবার আমি, প্রমথ আর একেনবাবু সবাই একসঙ্গে কলকাতায় এসেছি। নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে এই সময় চার সপ্তাহের ছুটি। একেনবাবু অবশ্য আমার বা প্রমথর মতো নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে পড়ান না। ক্রিমিনোলজি নিয়ে হাবিজাবি কী রিসার্চ করছেন জানি না, কিন্তু সাইডে গোয়েন্দাগিরি করে টু-পাইস কামাচ্ছেন। একেনবাবু ইচ্ছে করলে কলকাতায় বেশিদিন থাকতে পারতেন, কিন্তু থাকছেন না। প্রমথ জিজ্ঞেস করেছিল, 'এত তাড়াতাড়ি ফিরছেন কেন? বউদির সঙ্গে কিছুদিন কাটিয়ে তারপর আসুন! ঘোড়ার ডিম রিসার্চ যা করেন তা তো কলকাতায় বসেও করতে পারেন!' ওঁর উত্তর, "কী যে বলেন স্যার, এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন! তাছাড়া ফ্যামিলি তো নেক্সট ইয়ারে আসছেই।'

'ফ্যামিলি' মানে একেনবউদি। তবে একেনবাবুর নেক্সট ইয়ারের ডেফিনেশনটা আমি আর প্রমথ এখনও বুঝে উঠতে পারিনি। গত তিন বছর ধরে উনি এই 'নেক্সট ইয়ার' কথাটা বলে আসছেন। এবার এসে বুঝতে পারছি সমস্যাটা একেনবউদির দিক থেকে। নিউ ইয়র্কে গিয়ে থাকতে উনি রাজি নন। উলটে একেনবাবুকে চাপ দিচ্ছেন ওখানকার পাততাড়ি গুটিয়ে কলকাতায় ফিরে আসার। একদিন তো আমাদের সামনে বলেই ফেললেন, "ব্যোমকেশবাবু ফেলুদারা যদি কলকাতায় ডিটেকটিভগিরি করে সংসার চালাতে পারেন, তাহলে উনিই বা পারবেন না কেন!"

একেনবাবু আমাদের সাক্ষী মানলেন, "শুনছেন স্যার ফ্যামিলির কথা, কাদের সঙ্গে কার তুলনা! ওঁরা হলেন লেজেন্ডারি ফিগার। ওঁদের ব্রেন-ক্যাপাসিটির দশ পার্সেন্টও যদি আমার থাকত গর্ব বোধ করতুম!"

স্বামী-স্ত্রীর এইসব কথাবার্তার মধ্যে নাক না গলানোই ভালো। আমি চুপ করে ছিলাম। কিন্তু প্রমথকে চুপ করায় কার সাধ্যি! একেনবাবুকে বলল, "নিজেকে এত ছোটো ভাবছেন কেন, নাই-বা হল দশ পার্সেন্ট, সাত-আট পার্সেন্ট তো আছে।"

এই কথাতে যে বউদিকেও কষ্ট দেওয়া হল, সে বোধটাও ব্যাটার নেই! পরে বোধহয় বুঝল। একেনবউদিকে বলল, "ঠাট্টা করছিলাম বউদি, ম্যানহাটনে একেনবাবুর খুব নামডাক হয়েছে। দশ পার্সেন্টটা ওঁর বিনয়। কিন্তু সামনে বেশি প্রশংসা করতে চাই না, ল্যাজ মোটা হয়ে যাবে।"

ওই এক কথাতেই কাজ, আরেক প্রস্থ চা চলে এল।

কলকাতায় এসে আমরা তিন জায়গায় থাকলেও আড্ডাটা বেশ ভালোই চলছে। বিকেলে প্রায়ই একেনবাবুর বাড়িতে গিয়ে হাজির হই। একেনবউদির বানানো লুচি, আলুর দম, ঘুঘনি, পেঁয়াজি — নিত্যনতুন নানান স্ন্যাকস আর বেশ কয়েক কাপ চা খেয়ে কলকাতার প্রত্যেকটি সমস্যারই সহজ সমাধান আবিষ্কার করে ফেলি। মুশকিল হল, সেগুলো শোনানোর মতো তেমন লোক পাই না। একেনবাবুর এক পরিচিত, নাম মনোজ রায়, তিনি একদিন গল্প করতে এসেছিলেন। ভদ্রলোক আমাদের থেকে বয়সে একটু বড়োই হবেন, কলকাতা কর্পোরেশনে কাজ করেন। সেটা জানতে পেরে মনোজবাবুকে কলকাতার জঞ্জাল পরিষ্কার করার একটা স্কিম বললাম। আমার নিজের বানানো নয়, ব্রেজিলের কুরিচিবা শহরে এটা চালু করা হয়েছিল। ওখানেও জঞ্জাল পরিষ্কার করার লোকেরা ছিল ফাঁকিবাজ। তাদের দিয়ে হবে না বুঝে মেয়র বড়ো বড়ো প্লাস্টিক-ব্যাগ গরিবদের বিলি করলেন। যারা জঞ্জাল-ভর্তি ব্যাগ পিক-আপ সেন্টারে জমা দেবে, তারা এক দিনের খাবার আর পয়সা দুই-ই পাবে। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই কুরিচিবা শহর পরিচ্ছন্ন হয়ে গেল!

মনোজবাবু দেখলাম সব কিছুতেই খুব নেগেটিভ। আমার কথা শেষ হতে না হতেই বললেন, "ওসব এদেশে চলবে না। পয়সা খরচা হবে ঠিকই কিন্তু জঞ্জাল পরিস্কার হবে না।"

"কেন?"

"সুপারভাইসার বিলি করবে একশোটা ব্যাগ, বলবে হাজার। বাকি নয়শোটা ব্যাগ দোকানে বেচবে। হাজার ব্যাগ জঞ্জাল জমা পড়েছে বলে খরচার হিসেব দেবে, যদিও জমা পড়বে মেরে কেটে একশো। বাকি টাকাটা কার পকেটে যাবে গেস করুন?"

"সেটা কি করে হয়, সুপারভাইজারদেরও তো সুপারভাইজার আছে!"

"ক্ষেপেছেন, অফিসাররা কি নোংরা ব্যাগ গুনতে যাবেন? আর অফিসাররাও তো ধোয়া তুলসীপাতা নন, কাট তো সবারই থাকে!"

এসব ব্যাপারে আমাদের দেশের লোকদের মাথা অতি পরিষ্কার সন্দেহ নেই। আমেরিকায় আট বছর কাটিয়ে আমিই ভোঁতা হয়ে গেছি!

"কিচ্ছু হবে না মশাই এদেশে। টপ-টু-বটম করাপশন, ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হবে! আগে শুধু পুলিশ আর ট্যাক্সের লোকেদের ঘুষ দিতে হত, এখন ঘুষ-সংস্কৃতি শিক্ষা, স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে পাড়ার ক্লাব পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। ব্লিক ফিউচার মশাই, অতি ব্লিক ফিউচার। আমেরিকায় আছেন ভালো আছেন, এসব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।"

মনোজবাবু এত উত্তেজিত হয়ে কথাগুলো বললেন যে আমি আর উচ্চবাচ্য করলাম না। প্রমথ শুধু ফাজলামি করে একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার, আপনি এত চুপচাপ বসে অপমানটা হজম করছেন?"

"কী অপমান স্যার?"

"এই যে উনি বললেন পুলিশরা ঘুষখোর, আপনিও তো এখানকার পুলিশে ছিলেন?"

মনোজবাবু এবার লজ্জিত হলেন। "আরে না, না, একেনবাবু একজন এক্সেপশন। ওঁর মতো লোক এখনও কয়েকজন আছেন বলে দেশটা উচ্ছন্নে যায়নি।" তারপর একেনবাবুকে বললেন, "যাই বলুন, আপনার অ্যাবসেন্স এবার আমরা খুব মিস করেছি।"

"কেন স্যার?"

"আমার ডিপার্টমেন্টে কাজ করত একটি ছেলে, তার পিসতুতো বোন ছ'মাস আগে খুন হল। ব্রুটালি মার্ডারড। কল সেন্টারে কাজ করত মেয়েটা, বিধবা মা'র একমাত্র সন্তান। ওর টাকাতেই সংসার চলত। এতদিন হয়ে গেল পুলিশ কোনো কিনারাই করতে পারল না!"

"সে কি স্যার!"

"আর এটা তো শুধু একটা কেসের কথা। তারও মাস তিনেক আগে আরেকটা মেয়ে খুন হল প্রায় একইভাবে। ট্র্যাভেল এজেন্সিতে কাজ করত। একা থাকত গোলপার্কের কাছে। সেটাতেও কেউ ধরা পড়েনি। কী ভয়ানক ব্যাপার বলুন তো! এই যে চাকরির জন্যে এত মেয়ে কলকাতায় একা থাকে, তাদের মানসিক অবস্থাটা চিন্তা করুন? কোনো নিরাপত্তা যদি পুলিশ না দিতে পারে, তাহলে চলে কী করে!"

আমরা সবাই একেনবাবুর দিকে তাকালাম। বেচারা একেনবাবু, কলকাতা পুলিশের এই অকর্মণ্যতার দায় যেন ওঁর!

"পুলিশ কি হাল ছেড়ে বসে আছে, না এখনও ইনভেস্টিগেট করছে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম মনোজবাবুকে।

"কে জানে! আমাদের দেশের পত্রিকাগুলোও তো সেরকম। প্রথম ক'দিন একেবারে প্রথম পাতার খবর, সেই নিয়ে চর্বিতচর্বণ। তারপর অন্য কিছু এলেই আগেরটা আউট অফ ফোকাস। ২৪ ঘন্টার নিউজ চ্যানেলগুলোও তাই। কেউ ধরা পড়লে হয়তো শুনতে পাওয়া যেত। এনিওয়ে একেনবাবু যখন এসেছেন, আমি শুভেন্দুকে বলব এসে দেখা করতে।"

"শুভেন্দু কে স্যার?"

"ওই যে-ছেলেটা আমার ডিপার্টমেন্টে ছিল, যার বোন খুন হয়েছে। মেয়েটার মা একেবারে ডিভাস্টেটেড। খালি নাকি কাঁদেন আর বলেন আমার ফুলের মতো মেয়েটাকে যে মারল, সে এখনও পাড়ায় বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে — আর আমায় তা শুনতে হচ্ছে!"

"তার মানে? মহিলা কি কাউকে সাসপেক্ট করেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"নিশ্চয় করেন। কিন্তু এখানে তো অনেক পার্টির ব্যাপার আছে। রুলিং পার্টির লোক হলে ফরগেট ইট!"

বুঝলাম ভদ্রলোক দেশকে নিয়ে একেবারে তিতিবিরক্ত, কোনো ভালো ওঁর চোখে পড়ে না! এমন কি বউদির চমৎকার চা খেয়েও মন্তব্য করলেন, "বুঝলেন, আজকাল ভালো চা-ও পাওয়া যায় না এদেশে, সব এক্সপোর্ট হচ্ছে।"

মনোজবাবু চলে যাবার পর আমি একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, "ভদ্রলোক কর্পোরেশনে করেন-টা কি, মনে তো হচ্ছে অপজিশন পার্টির লোক!"

"ঠিক জানি না স্যার, তবে খুব রিসোর্সফুল। একবার মিউটেশনের ব্যাপারে খুব সাহায্য করেছিলেন।"

"আপনার সঙ্গে ওঁর পরিচয় হল কী করে?"

"সে এক কাহিনি স্যার। ওঁর দাদা মৃত্যুঞ্জয়বাবুর একটা রেস্টুরেন্ট আছে। সেখানে একবার ডাকাতি হয়েছিল।..."

"রেস্টুরেন্টে ডাকাতি! গয়নার দোকানে হয় শুনি।" কথার মাঝখানেই প্রমথ ফোড়ন কাটল।

"ব্যাপারটা স্যার একটু স্ট্রেঞ্জ ঠিকই। দু'জন ড্রাগ ডিলার রেস্টুরেন্টে বসে টাকার লেনদেন করছিল। ডাকাতরা ঢুকেছিল সেই টাকা লুট করতে। গোলাগুলি চলে। শেষে অবশ্য সবাই ধরা পড়ে। মধ্যে থেকে গুলি লেগে মৃত্যুঞ্জয়বাবু জখম হন। সেটা বার করতে হাসপাতালে সার্জারি করতে হয়! যাচ্ছেতাই ব্যাপার স্যার! মৃত্যুঞ্জয়বাবু খুব ভয় পাচ্ছিলেন এই নিয়ে পুলিশ বোধ হয় ওঁকে হ্যারাস করবে। উনি স্যার নির্দোষ, হ্যারাস করার প্রশ্ন উঠছে কেন? আমি ওঁকে ভরসা দিয়ে বলেছিলাম কেউ ঝামেলা করার চেষ্টা করলে আমায় খবর দিতে। সেই সময় মনোজবাবুকে নিয়ে মৃত্যুঞ্জয়বাবু কয়েকবার আমার কাছে এসেছিলেন।"

"কতদিন আগের ব্যাপার এটা?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

" তা স্যার প্রায় বছর ছয়েক হল। আপনারা হয়তো ওঁর দাদার রেস্টুরেন্টটা দেখেও থাকবেন। মেনকা সিনেমা থেকে হাঁটা পথ, মিলনী কাফে।"

"দেখে থাকব মানে!" প্রমথ একটু উত্তেজিত হয়েই বলল, "কতবার ওখানে খেয়েছি! কিরে বাপি, তুইও তো খেয়েছিস?"

"বহুবার খেয়েছি," আমি বললাম। "দারুণ মোগলাই করে! মালিকের নামটা জানতাম না, খুব গপ্পে লোক। হ্যাঁ ঠিকই, মনোজবাবুর সঙ্গে খানিকটা মিল আছে।"

"এক কাজ করুন না," প্রমথ প্রস্তাব দিল। "চলুন, বউদিকে নিয়ে সবাই মিলে একদিন ওখানে মোগলাই খেয়ে আসি।"

একেনবাবু ইতস্তত করছেন দেখে প্রমথ যোগ করল, "আর কিপটেমি করে 'না' বলবেন না। আপনার একটা পয়সাও খরচা হবে না, আমরা খাওয়াব বউদিকে।"

একেনবাবু লজ্জিত হয়ে বললেন, "কী যে বলেন স্যার, কলকাতায় আপনাদের আমি একদিন খাওয়াতে পারব না!"

"খাঁটি কথা, এটা তো ম্যানহাটান নয়, অনেক সস্তায় ব্যাপারটা সারতে পারবেন!" প্রমথ খোঁচা দিল। সামনে একেনবউদি বসে, প্রমথটার স্থান-কাল-পাত্র জ্ঞান নেই!

"চুপ কর তো! উনি যেন আমাদের নিউ ইয়র্কে খাওয়ান না!"

## ।। ২।।

মনোজবাবুর সঙ্গে গল্প করার পর দু'দিন বাদে একেনবাবুর বাড়িতে আড্ডা মারছি, এক ভদ্রলোক একেনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। দেখে মনে হল আমাদেরই বয়সি। তাই 'আপনি' করে লিখছি না। পরিচয় দিল শুভেন্দু মিত্র বলে।

"মনোজদার কাছে আপনার কথা শুনে এসেছি।"

সঙ্গে সঙ্গেই কানেক্ট করতে পারলাম। এর বোনই মার্ডারড হয়েছে!

আমাদের দিকে একঝলক তাকিয়ে শুভেন্দু একেনবাবুকে বলল, "অসময়ে এসে আপনাকে বিরক্ত করলাম না তো?"

"আরে না স্যার। ছুটিতে আছি, সময় অসময় কি? এমনি বসে বসে গল্প করছি।" তারপর একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন, "বসুন, স্যার, বসুন।"

শুভেন্দু বসতে বসতে বলল, “আমাকে আবার ‘স্যার’ বলছেন কেন, আপনি আমার দাদার মতো।”

প্রমথ গম্ভীর ভাবে বলল, “উনি ওঁর ভাইপোকেও ‘স্যার’ বলেন।”

অচেনা কারোর কথার পিঠে এ ধরণের মন্তব্য করা যে নিতান্ত অভদ্রতা সেটা প্রমথকে কে বোঝায়! শুভেন্দু যে একটু অপ্রস্তুত হয়েছে পরিষ্কারই বুঝলাম।

“‘স্যার’-টা ইগনোর করুন।” প্রমথ যোগ করল।

“হ্যাঁ, আচ্ছা মানে...” শুভেন্দু ঠিক কী বলবে বুঝতে না পেরে একেনবাবুর দিকে তাকাল।

একেনবাবু আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, “আপনি যা বলার এঁদের সামনে স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন। আমাকে এঁরা নানা ভাবে সাহায্য করেন। আমরা একটা টিম।”

এই কথায় কাজ হল। শুভেন্দু শুরু করল, “আমি মনোজদার আন্ডারে কাজ করতাম। মনোজদাই বললেন আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে। মনোজদা বোধ হয় আপনাকে বলেছেন আমার বোনের কথা।”

“হ্যাঁ স্যার, আমি শুনেছি। খুবই স্যাড ব্যাপার স্যার।”

“ছ-মাস হয়ে গেল ও মার্ডারড হয়েছে, কিন্তু পুলিশ কিছু কিনারাই করতে পারেনি। আমার মনে হয় পারবেও না বা করতে চায় না।”

“এটা কেন বলছেন স্যার?”

“প্রথমে যিনি তদন্ত করছিলেন, তিনি ভরসা দিয়েছিলেন দোষী ধরা পড়বেই। তারপর তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হল। তার বদলে যিনি এসেছেন তিনি কোনো কথাই বলেন না। প্রশ্ন করলে বলেন, যা করার আমরা করছি।”

“এখন কে ইনভেস্টিগেট করছেন?”

“অধীর মুখার্জী বলে একজন।”

“আমি তো তাকে চিনি!”

“চেনেন! তাহলে আপনি যদি ওঁকে একটু চাপ দেন। তার থেকেও ভালো হয় আপনি নিজে প্রাইভেটলি যদি কেসটা নেন। মনোজদার কাছে আপনার অনেক সুখ্যাতি শুনেছি। আপনার কীর্তিকাহিনির কথাও বইয়ে পড়েছি...।”

আরও হয়তো দুয়েকটা প্রশংসাসূচক মন্তব্য করতে যাচ্ছিল শুভেন্দু। কিন্তু একেনবাবু থামিয়ে দিয়ে বললেন, “অধীরের কাছে আমি নিশ্চয় খোঁজ নেব স্যার। কিন্তু আমি এখানে আছি আর সপ্তাহ দুয়েক। এর মধ্যে তো কিছু করে উঠতে পারব না।”

“আপনার কথা আমি পিসিকে বলেছি। ওঁর একান্ত অনুরোধ আপনি কেসটা নিন। পিসি নিজেই আসতেন, কিন্তু খাট থেকে পড়ে গিয়ে ক’দিন হল উনি শয্যাশায়ী। বেবি ছিল পিসির একমাত্র মেয়ে। তার খুনি এত বড়ো পাপ করেও শাস্তি পাবে না, তিনি ভাবতে পারছেন না। আমি অবশ্য এখানে আসার আগে পিসিকে বলেছিলাম, আপনি নিউইয়র্কের ডিটেকটিভ, নিশ্চয় আপনার ফি কয়েক লাখ টাকা। পিসি আপনাকে বলতে বলেছেন নিজের সোনাদানা যা আছে সব বেচে আপনার প্রাপ্য উনি মিটিয়ে দেবেন, শুধু খুনিকে ধরিয়ে দিন।”

“আরে ছি ছি, স্যার, টাকার প্রশ্ন উঠছে কেন! সমস্যাটা ফি নিয়ে নয়, সমস্যাটা হল সময়ের।”

শুভেন্দু একটু চুপ করে থেকে বলল, “পিসিকে তাহলে কী বলব?”

আমার খারাপ লাগল। আমি একেনবাবুকে বললাম, “কেসটা না হয় নাই নিলেন, কিন্তু

একটু দেখুনই না, পুলিশকে কিছু সাহায্য করতে পারেন কিনা।”

এতে যেটুকু কাজ হল, তার থেকে বেশি কাজ হল একেনবউদির কথায়। একেনবউদি কখন কাজের মেয়েটিকে নিয়ে চা দিতে ঢুকেছেন খেয়াল করিনি। একেনবউদি বোধহয় ভেতর থেকে আমাদের কথা শুনছিলেন। একেনবাবুকে বললেন, “একটা মেয়ে খুন হল, দেখো না কী করতে পারো।”

একেনবাবু শুভেন্দুবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, “এরপর আর ‘না’ বলি কী করে স্যার। কেসটা না নিলেও যতটুকু পারি সাহায্য করব। নিন স্যার, চা খান।”

“থ্যাঙ্ক ইউ।” শুভেন্দু একেনবউদির দিকে একবার কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে তাকাল।

চা খেতে খেতে দুয়েকটা মামুলি কথাবার্তার পর একেনবাবু বললেন, “এবার আপনার বোন আর খুনের ব্যাপারে যতটুকু জানেন বলুন।”

শুভেন্দু একটু চুপ করে থেকে শুরু করল—

“নন্দিতা আমার একমাত্র পিসির একমাত্র মেয়ে। আমার থেকে বছর আটেকের ছোটো, পঁচিশ বছর সবে পূর্ণ হয়েছিল যখন মারা যায়। পিসেমশাই মারা গিয়েছিলেন নন্দিতা যখন স্কুলে পড়ে। সেই থেকে ও বড়ো হয়েছে ওর ঠাকুরদার বাড়িতে, বর্ধমান জেলার গুসকরা টাউনে। আমার নিজের কোনো বোন নেই, ওকে আপন বোন হিসেবেই দেখেছি চিরকাল। পিসেমশাই মারা যাবার পর পিসি প্রায়ই কলকাতায় আমাদের বাড়িতে আসতেন, আমরাও নিয়মিত গুসকরায় দেখা করতে যেতাম।

নন্দিতা যখন স্কুলের পড়া শেষ করে কলকাতায় পড়বে ঠিক করল, তখন বাবা বললেন, আমাদের সঙ্গে ও থাকবে। পড়াশুনোয় ভালো ছিল, যাদবপুরে চান্স পেয়ে গেল। ও যখন ফাইনাল ইয়ারে, বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। সরকারি কোয়ার্টার ছেড়ে আমরা কোথায় যাব সে নিয়ে অনিশ্চয়তা। নন্দিতার কাকা তখন কলকাতায় মেয়েদের এক হস্টেলে ওর থাকার বন্দোবস্ত করে দিলেন। বি.এ পাশ করে আর পড়া হল না। বাড়ির আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। নিজের চেষ্টাতেই সাউথ সিটি মল-এ সেলসের কাজ জোগাড় করে ফেলল। সেখানে কাজ করতে করতেই সল্টলেকে ভালো মাইনের একটা চাকরি পেয়ে গেল। কল সেন্টারের কাজ। নাইট ডিউটি — রাত সাড়ে ন-টা থেকে সকাল সাড়ে ছ-টা। অফিসের গাড়ি রাত আটটার সময়ে তুলে নিয়ে যেত আর সকাল আটটা নাগাদ বাড়ি পৌঁছে দিত। ফলে ওর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ কমই হত।

মাস ছয়েক আগে নন্দিতার অফিস থেকে একটা ফোন পেলাম। এমার্জেন্সির জন্যে আমার নম্বরটা ওদের কাছে ছিল। তখনই জানতে পারলাম অফিসের গাড়ি গতকাল রাতে তুলতে গিয়ে ওকে পায়নি। ফোনেও ওকে পাওয়া যাচ্ছে না! নন্দিতা বাইরে কোথাও গেলে আমাকে অন্তত জানায়। দু’দিন আগেও কথা হয়েছে। কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি তো?

যার সঙ্গে নন্দিতা মাঝে মাঝে ঘুরত, তাকে আমার মোটেই ভালো লাগত না। বয়সে নন্দিতার থেকে অনেকটাই বড়ো, চল্লিশের কাছাকাছি। পড়াশুনো কদ্দুর কে জানে! স্থূল প্রকৃতি, কথাবার্তায় সোফেস্টিকেশনের অভাব। রেন্টাল কারের বিজনেস ছিল, প্রমোটারিও করত শুনেছি। নন্দিতা ওকে সমুদা ডাকত। ওর হস্টেলের কাছে মোড়ের মাথায় ছিল সমুদার অফিস। আমি মা-কে কিছু না জানিয়ে সোজা সেখানে চলে গেলাম। লাকিলি সমুদাকে অফিসে পেয়ে গেলাম। নন্দিতা কোথায় জিজ্ঞেস করাতে সমুদা কেমন জানি থতমত খেয়ে গেল। আমি বললাম কাল রাত থেকে নন্দিতার খবর পাওয়া যাচ্ছে না, এর

মধ্যে নন্দিতার সঙ্গে ওর কোনো কথা হয়েছে কি না। যদিও মুখে বলল হয়নি, কিন্তু বলার ধরনটা আমার ভালো লাগল না। মনে হল কিছু যেন গোপন করছে!

আমি সমুদাকে নিয়েই নন্দিতার হস্টেলে গেলাম। হস্টেলের সিকিউরিটি আমায় চেনে। বুঝলাম সমুদাকেও চেনে। তাই গেট খুলে দিল। নন্দিতার ঘরের দরজাটা বন্ধ, কিন্তু একটু ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। তখনই দেখলাম বীভৎস দৃশ্যটা! বিছানায় শোয়া অর্ধ-নগ্ন দেহ — উপর দিকটায় কিচ্ছু নেই, নীচে শুধু শালোয়ারটা রয়েছে। মাথাটা একদিকে হেলানো, গলায় দড়ি বাঁধা, বুক পেট রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

আমি আর্তনাদ করে ঘর থেকে ছুটে বেড়িয়ে এসে কোনোমতে পুলিশকে ফোন করলাম। আমার ভয়ার্ত চিৎকার শুনে নীচের সিকিউরিটি গার্ডও ছুটে এসেছে। পুলিশ না আসা পর্যন্ত আমরা নীচেই দাঁড়িয়ে রইলাম। হস্টেল-সুপার, নামটা ঠিক মনে নেই, পাশের বাড়িতে থাকেন। সিকিউরিটির কাছ থেকে খবর পেয়ে তিনিও এলেন। ওঁর কাছেই শুনলাম আগের রাতে নাকি নন্দিতা ফোন করেছিল হোস্টেলে ফিরতে একটু দেরি হবে বলে। উনি রাত দশটার সময় একবার দেখে যান সবাই ঘরে ফিরেছে কি না। কেউ যদি রাত করে তাহলে ওঁকে জানিয়ে রাখে, যাতে তিনি অযথা দুশ্চিন্তা না করেন। সুতরাং নন্দিতা কারোর সঙ্গে বাইরে বেশ রাত করে ছিল। সেইজন্যেই আমার মনে হচ্ছিল সমুদা কিছু একটা লুকাচ্ছে!”

“ইন্টারেস্টিং স্যার,” একেনবাবু এতক্ষণ বাদে মুখ খুললেন। “কখন মিস নন্দিতা ফিরেছিলেন সেই রাতে?”

“সেটা কেউ জানে না। হস্টেলে ঢোকার দুটো দরজা। বোর্ডাররা সাইডের দরজা চাবি দিয়ে খুলে ঢুকতে পারে। ভিসিটারদের সামনের দরজা দিয়ে ঢুকতে হয়।”

“ব্যাপারটা ঠিক ক্লিয়ার হচ্ছে না স্যার। সামনের দরজা দিয়ে ঢুকলে সিকিউরিটি গার্ডের সামনে দিয়ে যেতে হয়, আর সাইডের দরজা শুধু লক থাকে,

সেখানে কোনো গার্ড থাকে না সেটা বুঝলাম। কিন্তু সেখান দিয়ে ঢুকলে সিকিউরিটি গার্ড দেখতে পারে না কেন?”

“আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। হস্টেলটা চারতলা। সামনের দরজা দিয়ে ঢুকলে একটা লবি। সেখানে সিকিউরিটি গার্ড বসে থাকে। লবির পেছনে বাঁদিকে ওপরে যাবার লিফট। ডানদিকে দুটো সিঁড়ি নেমে একটা ছোট্ট প্যাসেজ। তার পাশে সাইডের দরজা। চাবি দিয়ে সাইডের দরজা খুলে লবিতে আসা যায় আবার উলটো দিকের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে যাওয়া যায়। কেউ যদি সাইডের দরজা দিয়ে ঢুকে সেই সিঁড়ি দিয়ে উপরে যায়, তাহলে সিকিউরিটি গার্ডের চোখে নাও পড়তে পারে।”

“পায়ের আওয়াজ তো কানে আসবে স্যার।”

“মেট্রন যখন প্রশ্ন করেছিলেন তখন গার্ড বলেছিল কোনো আওয়াজ ও শোনেনি। পুলিশ অবশ্য গার্ডকে অনেক জেরা করেছে শুনেছি। পুলিশ আর কিছু জেনেছে কি না জানি না। সমুদাকেও জেরা করেছে। আমাকেও একবার থানায় ডেকেছিল, কাদের সঙ্গে নন্দিতার পরিচয় আছে জানতে। এছাড়া আমি সন্ধ্যেবেলা থেকে কোথায় ছিলাম, রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম কি না, এই নিয়ে নানান প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছিল।

বাড়িতে এসে মা'র সঙ্গেও কথা বলে গিয়েছিলেন বিকাশবাবু, অধীরবাবুর আগে যিনি কেসটা হ্যান্ডেল করছিলেন।”

“ঠিক আছে স্যার, আমি অধীরের সঙ্গে কথা বলব। তবে এই অল্প সময়ের মধ্যে কী করে উঠতে পারব বলতে পারছি না। আপনার মোবাইল নম্বরটা দিয়ে যান।”

শুভেন্দু নম্বরটা একটা কাগজে লিখে পকেট থেকে একটা ফোটো বার করল।

"নন্দিতা মারা যাবার কয়েকদিন আগে তুলেছিলাম।" চোখটা চিকচিক করে উঠল শুভেন্দুর। "জানি না ছবিটা আপনার কোনো প্রয়োজনে লাগবে কি না, কিন্তু আপনার জন্যেই একটা কপি এনেছি।"

"থ্যাঙ্ক ইউ স্যার," ছবিটা হাতে নিয়ে ভালো করে দেখে একেনবাবু আমাদের দিকে এগিয়ে দিলেন।

প্যান্টস আর টপস পরা একটি যুবতী। অবিন্যস্ত ঘন চুল কানের ওপর দিয়ে আলগা করে পেছনে বাঁধা, কপালে ছোট্ট একটা টিপ, কানে ঝুমকো দুল। টানা ভুরুর নীচে আয়ত চোখ, নাকটা টিকালো, নীচের ঠোঁটটা একটু মোটা। দীর্ঘ গ্রীবা, সেটাকে জড়িয়ে একটা সরু হার বুকের খাঁজ পর্যন্ত নেমে এসেছে। শুধু সুন্দরী নয়, বেশ একটা সেক্সি ভাব আছে।

"কিছুদিন থাকুক স্যার এটা আমার কাছে," একেনবাবু বললেন। " আচ্ছা, মিস নন্দিতার পুরো নামটা কী ছিল?"

"নন্দিতা ঘোষ।"

"আর এই যে সমুবাবুর কথা বললেন, তাঁর পুরো নামটা কি?"

"সেটা বলতে পারব না। ভালো নাম বোধহয় সৌমেন বা সমীর।"

"আই সি। সমুবাবুর ঠিকানাটা কি আপনার জানা আছে?"

"গোলপার্ক থেকে বেরিয়ে কাঁকুলিয়া রোডের মোড়ে সাউথ কার রেন্টাল। বড়ো সাইনবোর্ড লাগানো, নম্বরটা মনে নেই।"

"ইনি ছাড়া অন্য কোনো বন্ধুর নাম বা ঠিকানা স্যার?"

"ভাস্বতী বলে ওর আরেক বন্ধু ছিল। মাঝেমধ্যে সে আমাদের বাড়িতে এসেছে।"

"উনিও কি কল সেন্টারে কাজ করতেন?"

"না, ভাস্বতী ওর সঙ্গে যাদবপুরে পড়ত। পরে কোনো একটা এয়ার লাইনে কাজ পেয়েছিল শুনেছি।"

"আর কেউ?"

"না, আর কারও কথা আমি জানি না।"

"সমুবাবুর সঙ্গে আপনার পরিচয় হল কী করে স্যার?"

"হঠাৎ করেই পরিচয়। একদিন নন্দিতার হস্টেলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখি নন্দিতার সঙ্গে সমুদা হস্টেল থেকে বেরোচ্ছে। নন্দিতা আমাকে এক্সপেক্ট করেনি। যাই হোক, তখনই পরিচয় হল।"

"ঠিক আছে স্যার, আপনার ফোন নম্বরটা তো দিয়েছেন, এরমধ্যে দরকার পড়লে যোগাযোগ করব।"

শুভেন্দু নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিল।

।। ৩।।

এরমধ্যে মা-কে নিয়ে দিন কয়েকের জন্যে এক বিয়ে উপলক্ষে ধানবাদ যেতে হল। ফিরে এসে প্রমথর কাছে শুনলাম একেনবাবু পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। এই খুনের ব্যাপারে পুলিশ নাকি খুব একটা এগোতে পারেনি। একেনবাবু নন্দিতার কেসটা হাতে নিয়েছেন দেখে অধীরবাবু নাকি খুবই খুশি। একেনবাবুর সঙ্গে সব রকম সহযোগিতা করছেন। এই হত্যাকাণ্ডের খুনি ধরা পড়লে ওঁর মাথা থেকে একটা মস্ত বোঝা নামবে। বিস্তারিত খবর আজ বিকেলেই জানা যাবে, ‘মিলনী কাফে’তে একেনবাবু আমাদের মোগলাই পরোটা খাওয়াচ্ছেন!

মানতেই হবে ধন্য প্রমথর অধ্যবসায়! ‘কী যে বলেন স্যার, আপনাদের একদিন খাওয়াতে পারব না’ বলে ঘোষণা করলেও এ নিয়ে অনেক টালবাহানা চলছিল।

কিন্তু প্রমথ হাল ছাড়েনি। ফ্যামিলির শরীরটা ভালো যাচ্ছে না বলে ব্যাপারটা স্থগিত রাখার শেষ চেষ্টাও ধোপে ঠিক টেকেনি।

‘বাড়িতে লুচি পরোটা রান্না করলে কি বউদির শরীর ভালো হয়ে যাবে? পয়সা খসাতে চান না সোজাসুজি বলুন, এরকম ফালতু এক্সকিউজ দিচ্ছেন কেন!’ প্রমথর এই বাক্যবাণের সঙ্গে যখন যোগ হয়েছে একেনবউদির প্রশ্ন, ‘আমার আবার শরীর খারাপ কোথায় দেখলে?’ একেনবাবুকে তখন রণেভঙ্গ দিতে হয়েছে। সুতরাং মোগলাই আজ হবেই।

মিলনী কাফে-টা বাইরে থেকে দেখে প্রথমে চিনতে পারিনি। পুরোনো বিশাল সবুজ সাইন বোর্ডটা আর নেই, সেখানে লাল রঙের একটা বোর্ডে লেখা ‘আইডিয়াল স্পোকেন ইংলিশ ইনস্টিটিউশন’। দোতলায় জানলার ফাঁক দিয়ে বেশ কয়েকটা ছেলেমেয়ের মুখ চোখে পড়ল। বুঝলাম ভাড়াটেদের তুলে দিয়ে ওখানে স্কুল হয়েছে। মিলনী কাফেটা স্ব-স্থানেই আছে। দরজার ওপরে মেটাল প্লেটে খোদাই করে নামটা রয়েছে, কিন্তু রাস্তা থেকে চট করে চোখে পড়বে না। উলটোদিকে গানের যে স্কুলটা ছিল সেটাও নেই। সেখানে এখন একটা কোচিং সেন্টার। সেখানে খুব ভিড়, সম্ভবত অ্যাডমিশন চলছে। কাছাকাছি কোনো পার্কিং-এর জায়গা পাওয়া গেল না। দূরে গাড়ি রেখে অনেকটা হাঁটতে হল।

বড়ো সাইন বোর্ডটা অদৃশ্য হলেও মিলনী কাফের পপুলারিটি দেখলাম কমেনি। মাত্র একটা টেবিলই ফাঁকা পড়েছিল। সেটা দখল করে আমিই মোগলাই পরোটা অর্ডার করলাম। সেই সঙ্গে মাংস আর একেনবউদির জন্য আলুর দম। ক্যাশিয়ার কাউন্টারে দেখলাম মৃত্যুঞ্জয়বাবু বসে আছেন। এই আট বছরে বেশ খানিকটা বুড়িয়েছেন! চুলে পাক ধরেছে, একটু যেন কুঁজোও হয়ে গেছেন। একজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে নানান দিকে তাকাচ্ছেন। দেখে যেন মনে হয় কাউকে খুঁজছেন। হঠাৎ আমাদের দিকে চোখ পড়ল। লোকটির সঙ্গে কথা বলা শেষ করে আমাদের টেবিলে এসে দাঁড়ালেন।

“কবে এলেন?” একেনবাবুকে প্রশ্নটা করলেন বটে, কিন্তু গলার স্বরে আন্তরিকতার অভাব, যেন করার জন্যই প্রশ্নটা করা।

“এই তো ক’দিন আগে। আপনি কেমন আছেন স্যার?”

“চলছে, আমাদের আর থাকা না থাকা।”

“কেন স্যার, আবার কোনো ঝামেলা হয়েছে নাকি?”

“ঝামেলা, কেন বলুন তো!” কেমন একটা শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকালেন মৃত্যুঞ্জয়বাবু।

“সেই যে ড্রাগ-ডিলার চক্র?”

"না না, ওরকম আর কিছু হয়নি।" এর পর কিছু একটা বলতে গিয়ে কেমন জানি চুপ করে গেলেন। তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনাদেরও তো অনেক দিন দেখিনি।"

প্রমথ বলল, "আমরাও তো ওঁর সঙ্গে বাইরে আছি।"

"তাই নাকি, কোথায়?"

এমন সময় অন্য প্রান্তে বসা ফুল-হাতা সোয়েটার গায়ে মাঝবয়সি গোঁফ-অলা মুষকো একটা লোক উচ্চস্বরে কাউকে বলল, "যা, তোর বাবুকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর, চা কি পাওয়া যাবে, না অনন্তকাল এখানে বসে থাকতে হবে!"

লোকটির মুখোমুখি বসা কমবয়সি একটি মেয়ে। দূর থেকে দেখছি, তাই জোর করে কিছু বলা শক্ত, কিন্তু মনে হল মেয়েটার মুখে একটা অস্বাচ্ছন্দ্যের ভাব।

যে ছেলেটি পাশের টেবিলে খাবার দিচ্ছিল, মৃত্যুঞ্জয়বাবু তাকে বললেন, "দ্যাখ তো রতন, চা দিতে দেরি হচ্ছে কেন!"

রতন বলল, "দেরি কেন হবে! উনি তো এইমাত্র হরিদাকে অর্ডার দিলেন, আমি নিজে শুনেছি!"

মৃত্যুঞ্জয়বাবু নিচুস্বরে বললেন, "এই এক জ্বালা হয়েছে এঁকে নিয়ে।"

"ইনি কে স্যার?"

"ওই ওপরে স্পোকেন ইংলিশের মালিক।"

"আগে তো স্কুলটা ছিল না, তাই না?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"না, এই বছর চারেক হল হয়েছে। তার পরেই এই উৎপাত! শনির দশা!"

কেন শনির দশা, সেটা আর জিজ্ঞেস করা হল না। কিছু না বলে অ্যাব্রাপ্টলি মৃত্যুঞ্জয়বাবু চলে গেলেন। খানিকক্ষণ বাদে দেখলাম নিজেই ঘুরে ঘুরে কাস্টমারদের অর্ডার নিচ্ছেন, রতন বা রতনের হরিদার ওপর ভরসা না রেখে।

আমাদের খাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে গেল। এনে দিল সেই রতন। রতনকে এবার আমি চিনতে পারলাম। বছর সাতেক আগেও এখানে কাজ করত। বড়ো জোর বছর দশ কি বারো বয়স ছিল তখন। শিশুশ্রম আইন-টাইনগুলো কেউ মানত না। এখনও তেমন মানে কি?

খাবার দিতে দিতে রতন আমাদের জিজ্ঞেস করল, "আমাকে চিনতে পারছেন দাদাবাবুরা?"

"পারব না কেন!" প্রমথ বলল, "কেমন আছিস?"

"আপনাদের আশীর্বাদে ভালোই আছি।"

"হ্যাঁরে, মৃত্যুঞ্জয়বাবু কি অসুস্থ? শরীরটা একেবারে ঝরে গেছে! আগের মতো কথাবার্তাও বলছেন না।"

"বাবুর ট্র্যাজেডি হয়েছে দাদাবাবু।"

"ট্র্যাজেডি!"

"আবিরদা সুইসাইড করলেন যে!"

"আবিরদা কে?"

"দেখেননি আপনারা? বাবুর ছেলে!"

"সুইসাইড করল কেন?"

উত্তরটা রতনের দেওয়া হল না, তার আগেই মৃত্যুঞ্জয়বাবু রতনকে এসে ধমক লাগালেন। "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছিস এখানে! দেখছিস না, কাস্টমার বসে আছে

অর্ডার দেওয়ার জন্য!”

রতন তাড়াহুড়ো করে চলে গেল। মৃত্যুঞ্জয়বাবু আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, “কিছু মনে করবেন না, দিনকে দিন ফাঁকিবাজ হচ্ছে ছেলেটা। খালি কথা আর কথা!”

মৃত্যুঞ্জয়বাবু চলে যেতেই এবার আবছা মনে পড়ল। আমাদের থেকে একটু ছোটো, মাঝেমাঝে ক্যাশবাক্স সামলাতো একটা ছেলে। হয়তো সেই আবির হবে। ট্র্যাজেডি বলে ট্র্যাজেডি! সন্তানের এভাবে মৃত্যু ঘটার থেকে আর কী দুঃখের হতে পারে! বেশ খারাপই লাগল কথাটা শুনে। কিন্তু সেটা সাময়িক। সামনে গরম গরম মোগলাইপরোটা আর মাংস। সেগুলোর সদ্ব্যবহার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। হাইলাইট অফ দ্য ডে হল একেনবাবু খাবারের বিলটা মেটালেন।

## ।। ৪ ।।

দিন কয়েক আমার আর একেনবাবুর কাছে যাওয়া হয়নি। যাদবপুরে একটা সেমিনার ছিল, সেই নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। এর মধ্যে প্রমথ এসে বলল একেনবাবু নাকি বেশ তেড়েফুঁড়ে নন্দিতার কেস নিয়ে পড়েছেন। ইতিমধ্যেই পুলিশের কাছ থেকে ক্রাইম সিনের বিস্তারিত রিপোর্ট জোগাড় করেছেন। ভাস্বতী নামে মেয়েটার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। সমুবাবুকে এখনও ধরতে পারেননি।

বিস্তারিত রিপোর্টটা কী জিজ্ঞেস করাতে প্রমথ গড়গড় করে যা বলল সেটা হল— আততায়ী মনে হয় নন্দিতার পরিচিত। ঘরের দরজা ভাঙা হয়নি, সম্ভবত নন্দিতাই তাকে ঘরে ঢুকতে দিয়েছিল বা তাকে নিয়ে ঘরে ঢুকেছিল। অর্ধনগ্ন দেহে অত্যাচারের চিহ্ন দেখে বোঝা যায় বলাৎকার করা হয়েছিল। কিন্তু ধর্ষণের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। মনে হয় নন্দিতা বাধা দেওয়ায় আততায়ী গলা টিপে ধরে। পরে গলায় দড়ির একটা ফাঁসও লাগায়। ফাঁসটা কেন লাগাতে হল, সেটা স্পষ্ট নয়। তারপরেও বুকে পেটে এলোপাথারি ছুরি চালিয়েছে, বোধহয় মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হতে। চুরি ডাকাতি করার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। ব্যাগ থেকে টাকাপয়সা কিছুই খোওয়া যায়নি। আলমারি খোলা বা ভাঙার চেষ্টা করা হয়নি। বলাৎকার করতে বাধা পেয়ে খুন করার থিওরিটাও ধোপে টেকে না। খুন করার উদ্দেশ্য প্রথম থেকে না থাকলে ছুরি, দড়ি এসব এনেছিল কেন? যাইহোক, একেনবাবুর কাছে গেলে নিশ্চয়ই আরও কিছু জানা যাবে।

দুপুরে প্রমথ আর আমি যাদবপুরের কফি হাউসে গিয়েছিলাম পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে। বন্ধুদের একজন থাকে একেনবাবুর বাড়ির কাছে। তাকে নামিয়ে দিয়ে ঠিক করলাম একেনবাবুকে সারপ্রাইজ দেব। গিয়ে দেখি একেনবাবু বেরোচ্ছেন।

“কোথায় যাচ্ছেন?”

“খুব ভালো সময়েই এসেছেন স্যার। চলুন, ম্যাডাম ভাস্বতীর সঙ্গে একটু কথা বলে আসি।”

“ব্যাপারটা কি!” প্রমথ কপট রাগ দেখাল। “আমাদের ছাড়াই আপনি ইনভেস্টিগেশন

চালিয়ে যাচ্ছেন!”

“কী যে বলেন স্যার। বাপিবাবু তো এ ক'দিন ব্যস্ত ছিলেন। আর আপনি তো সব কথাই জানেন।”

“ভাস্বতী মানে নন্দিতার সেই বন্ধু?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“হ্যাঁ স্যার, আজ হিন্দুস্থান পার্কে ওঁর মাসির কাছে বেড়াতে এসেছেন। ওখানে গেলে দেখা হবে।”

“ভাস্বতীর ঠিকানা পেলেন কোত্থেকে?”

“তুই একটা ইডিয়ট!” প্রমথ আমাকে ধমক দিল। “কার কাছ থেকে আবার, ইনস্পেক্টর অধীর মুখার্জীর কাছ থেকে!”

ভাস্বতীর মাসির বাড়ি খুঁজে পেতে অসুবিধা হল না। ওই পাড়ায় আগে বহুবার গিয়েছি।

ভাস্বতীর মাসি বাইরের ঘরে বসে উল বুনছিলেন। মাথার চুল বেশির ভাগই সাদা, চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা।

একেনবাবু নিজের পরিচয় দিতেই আমাদের বসতে বলে কাজের মেয়েটিকে চা আনতে বললেন, আপত্তি শুনলেন না।

উল বুনতে বুনতেই বললেন, “ভাস্বতী একটু বেরিয়েছে, এখনই ফিরবে। তোমাদের অপেক্ষা করতে বলে গেছে। ওই যাঃ, ‘তুমি' বলে ফেললাম, রাগ করলে না তো! তোমরা আমার ছেলের থেকেও ছোটো।”

“একেবারেই না,” প্রমথ বলল, “সবার হয়েই আমি বলছি। কী বলেন একেনবাবু?”

“কী যে বলেন স্যার, সে তো অবশ্যই।”

উনি দেখলাম একেনবাবুর পরিচয় ভালোভাবেই জানেন। নন্দিতার কেসটা যে একেনবাবু নিয়েছেন তার জন্যে সন্তোষ প্রকাশ করলেন। নন্দিতা ভাস্বতীর প্রাণের বন্ধু ছিল, ওঁর বাড়িতে অনেকবার এসেছে। মারা যাবার কয়েকদিন আগেও গল্পগুজব করে গেছে।

“মিস নন্দিতার আর কোনো বন্ধুর কথা জানেন ম্যাডাম?” একেনবাবু প্রশ্ন করলেন।

“আমাকে ম্যাডাম বোলো না, মাসিমা বলে ডেকো।”

“সরি ম্যাডাম, মানে মাসিমা। আমি জানতে চাইছিলাম, মিস নন্দিতার আর কোনো বন্ধু ছিল কি না।”

মাসিমা একটু চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, “ওর সঙ্গে একজনকে দেখেছি। বন্ধু কি না বলতে পারব না। বয়সে অনেকটাই বড়ো। ওর গাড়িতে করে বার দুয়েক আমার কাছে এসেছিল। ট্যাক্সির মালিক বা ওরকম কোনো একটা ব্যাবসা করে।”

“কী নাম ভদ্রলোকের?”

“নাম তো বলতে পারব না। লোকটাকে আমার পছন্দ হয়নি। কথাবার্তাগুলো শুনে মনে হয় না পড়াশুনো জানা ভদ্রপরিবারের বলে। আমি ভাস্বতীকে বারণও করেছিলাম লোকটার সঙ্গে মেলামেশা করতে। তবে জান তো, আজকালকার ছেলেমেয়েরা কি আমাদের কথা তেমন শুনবে! তা তোমরা দুজনে কী করো?”

আমার আর প্রমথর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন।

প্রমথই আমাদের পরিচয় দিল।

“বাঃ, দু'জনই শিক্ষার জগতে আছ! তা বিয়ে-থা করেছ?”

“না মাসিমা, আমার একটু কমপ্লিকেশন আছে।” তারপর আমাকে দেখিয়ে বলল,

"তবে বাপির জন্যে আমরা সবাই সুপাত্রী খুঁজছি!"

"তাই নাকি!" মাসিমা সোৎসাহে বললেন।

আমার ইচ্ছে হচ্ছিল প্রমথর মাথায় একটা চাঁটা মারি! ভাগ্যিস এই সময়ে ভাস্বতী ঘরে ঢুকল! ভাস্বতী বাঙালি মেয়েদের তুলনায় অনেকটাই লম্বা। পাঁচফুট আট ইঞ্চির মতো হবে। মুখের দিকে তাকালে চোখের দিকেই প্রথম নজর পড়ে। চোখদুটো যেন কথা বলছে! একটু লম্বাটে মুখ, কিন্তু অসুন্দর নয়। গায়ের রঙ মাজা। টানটান করে বাঁধা চুল। ঠোঁটে খয়েরি-লাল লিপস্টিকের ছোঁয়া। লাল-হলুদ সালোয়ার কামিজে চোখে পরার মতোই চেহারা।

নমস্কার করে বলল, "সরি, আমার একটু দেরি হয়ে গেল।"

মাসিমা বললেন, "আয় আয় বোস। এঁরা অনেক্ষণ বসে আছেন।"

"ইসস, কী খারাপ যে লাগছে। আসলে ট্যাক্সি পাচ্ছিলাম না। বালিগঞ্জ ফাঁড়িতে এসে শেষ পর্যন্ত পেলাম।"

"তাতে কী হয়েছে ম্যাডাম। আমরা তো গল্পই করছিলাম।"

ম্যাডাম শুনে ভাস্বতী লজ্জা পেল।

"প্লিজ, আমাকে ম্যাডাম বলবেন না! ভাস্বতী বলে ডাকবেন।"

"সেটা সম্ভব নয়," প্রমথ গম্ভীরভাবে বলল। "অন্তত মিস ভাস্বতীতে আপনাকে অভ্যস্ত হতে হবে।"

প্রমথর কথার কারণে ভাস্বতী হেসে ফেলল। ঝকঝকে হাসি। অতি সপ্রতিভ মেয়েটা।

"এঁরা দুজন আমেরিকায় প্রফেসরি করেন।" আমাদের দেখিয়ে মাসিমা বললেন।

"ওমা, আমাকে তাহলে ভাস্বতী তুমি বলবেন।"

"আমরা বলতে পারি, কিন্তু একেনবাবুকে দিয়ে কি সেটা বলাতে পারব!"এমনভাবে প্রমথ কথাটা বলল শুধু ভাস্বতী নয়, মাসিমাও হেসে উঠলেন।

এরকম খেজুরে আলাপ চলতে চলতেই আমাদের মধ্যে 'তুমি' সম্বোধনটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল, ব্যতিক্রম একেনবাবু। কাজের প্রসঙ্গ এল। একেনবাবু ভাস্বতীকে জিজ্ঞেস করলেন, "মিস নন্দিতা আপনার খুব বন্ধু ছিলেন শুনেছি। ওঁকে আপনি কতদিন চিনতেন?"

"তা প্রায় বছর ছয়েক।"

"কোথায় আপনাদের পরিচয় হল?"

"আমরা একসঙ্গে যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি। তারপর এক বছর স্পোকেন ইংলিশ-এর কোর্সও নিয়েছি।"

"আই সি, তারপর?"

"ও কল সেন্টারে চাকরি নিল, আমি এয়ারলাইনসের চাকরিতে ঢুকলাম। তারপর থেকে দেখা-সাক্ষাৎ কমই হতো। কিন্তু ফোনে যোগাযোগটা সবসময়েই ছিল। রবিবার সকালে মাঝেমধ্যে আমরা এই বাড়িতে মিট করতাম।"

"শেষ কবে ওঁর সঙ্গে আপনার দেখা হয়?"

"প্রায় মাস ছয়েক আগে। কোনো একটা ছুটির দিন ছিল। আমরা দু'জনেই এখানে এসে একসঙ্গে লাঞ্চ করি। তার কয়েকদিন বাদেই ও খুন হয়।"

"ওঁর এক বন্ধু ছিলেন সমুবাবু বলে, তাকে আপনি চেনেন?"

ভাস্বতী চকিতে একবার মাসিমার দিকে তাকাল।

"হ্যাঁ, বার কয়েক ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।"

"কী করেন উনি?"

"শুনেছিলাম রেন্টাল কারের বিজনেস আছে। তার বেশি কিছু জানি না।"

"উনি কি মিস নন্দিতার বয়ফ্রেন্ড ছিলেন?"

উত্তরটা দিতে ভাস্বতী একটু ইতস্তত করল, "ঠিক বলতে পারব না।"

"আর কারও সঙ্গে কি মিস নন্দিতার ঘনিষ্ঠতা ছিল?"

"কল সেন্টারের একজনের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব ছিল শুনেছি, কিন্তু তাকে আমি চিনি না।"

বুঝতে পারছিলাম মাসিমার সামনে অকপটে সবকিছু বলতে ভাস্বতী অসুবিধা বোধ করছে।

সেটা বুঝতে পেরেই বোধহয় একেনবাবু বললেন, "আজকে আমাদের একটু তাড়া আছে। আরেকদিন কি আপনি আমাদের একটু সময় দিতে পারবেন?"

ভাস্বতী কিছু বলার আগেই মাসিমা বললেন, "চলে এসো না তোমরা একদিন এখানে। ভাস্বতীও আসবে, বিকেলে সবাই মিলে ভালো করে চা জলখাবার খাবে। কবে আসবে বলো?"

"তা তো করাই যায় ম্যাডাম, সরি... মাসিমা। ফোন করে পরে না হয় সময়টা ঠিক করে নেব।" একেনবাবু বললেন।

"তোমাদের নম্বরটাও ভাস্বতীকে দিয়ে দাও," মাসিমা আমাদের বললেন।

প্রমথ বলল, "হ্যাঁ, বাপি, তোর নম্বরটা ভাস্বতীকে দে।"

প্রমথটাকে ঠ্যাঙাতে হয়!

পরের দিন সকালে অচেনা মোবাইল থেকে একটা ফোন পেলাম,

"বাপিদা, আমি ভাস্বতী।"

ফোনটা একেবারেই এক্সপেক্ট করিনি, তাই উত্তর দিতে একটু সময় লাগল।

"ও হ্যাঁ হ্যাঁ, একেনবাবুর তো তোমাকে ফোন করার কথা। করেননি?"

"না, কিন্তু কালকে পিসি থাকায় অনেক কিছুই তোমাদের বলতে পারিনি।"

"সেটাই মনে হচ্ছিল। তা কবে আমাদের মিট করতে চাও?"

"আজকে আমার ডে-অফ। একটু আগে আমাকে জানাল যে কাল সকালে আমাকে দু-সপ্তাহ ট্রেনিংয়ের জন্য মুম্বাই যেতে হবে। তাই আজকে ছুটি দিয়েছে।"

"ঠিক আছে, আমি একেনবাবুকে ফোন করি। দেখি ধরতে পারি নাকি। তারপর তোমাকে ফোন ব্যাক করছি।"

একেনবাবুকে পেলাম না। একেনবউদি বললেন, ফিরতে রাত হবে। লাঞ্চ ডিনার সব নাকি বাইরে খাবেন। হঠাৎ কি এত কাজ বুঝলাম না, আমাদেরও কিছু জানাননি! এ তো একটা সমস্যা হল! প্রমথকে ধরার চেষ্টা করলাম। ও গেছে কোন্নগরে মামাবাড়িতে, সন্ধেবেলা ফিরবে।

ভাস্বতীকে কথাটা জানালাম। বললাম, "আমাকে যা বলার বলতে পার। আমি একেনবাবুকে জানিয়ে দেব।"

"ফোনে এগুলো বলতে চাই না।"

"ঠিক আছে। কোথায় কথা বলতে চাও?"

"খুব শর্ট নোটিস দিচ্ছি, তুমি এখন ব্যস্ত?"

"তেমন না।"

"আমি বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে এক বন্ধুর বাড়িতে আছি। তুমি কোয়ালিটি রেস্টুরেন্টের

কাছাকাছি এসে আমাকে ফোন করলেই সেখানে তোমাকে মিট করতে পারি।”

সত্যিকথা বলতে কি, একা একা এভাবে একজন অত্যন্ত স্বল্প পরিচিত মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। অনেক রকমের সমস্যা কলকাতায় আজকাল হয় শুনেছি। একটাই বাঁচোয়া ওর মাসির সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে, মেয়েটিকেও পুলিশ ইতিমধ্যে জেরা করেছে। তেমন কোনো সমস্যা হয়তো হবে না। একটা জিনিস ভাবছিলাম, কোথায় বসে কথাবার্তা বলব? রেস্টুরেন্টে নিশ্চয় বলা যাবে না।

কোয়ালিটি রেস্টুরেন্টের সামনেই ভাস্বতী দাঁড়িয়েছিল। আজকে দেখলাম একটা মেরুন রঙের শাড়ি পরেছে। মুখে প্রসাধনের ছাপ সুস্পষ্ট, অফিসে গিয়েছিল বলেই বোধ হয়। সাইড করে গাড়িটা দাঁড় করাতেই ও দরজা খুলে উঠে বলল, “আমার বন্ধুর বাড়িতে বসে কথা বলতে পারব। খুব কাছেই।”

বন্ধুর বাড়িতে বুঝলাম ভাস্বতীর অবারিত দ্বার। বন্ধু কাজে গেছে। বন্ধুর বৃদ্ধা মা দোতলায় শয্যাশায়ী। বন্ধুর দাদা ডাক্তার, পাশেই তাঁর চেম্বার। বাড়িতে কমলা নামে একটি কাজের মেয়ে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলাম না।

আমরা বসলাম।

“চা খাবে? কমলাকে বললেই করে দেবে।”

“না, আগে কাজের কথাটা শোনা যাক।”

ভাস্বতী একটু চুপ করে থেকে বলল, “নন্দিতার জীবন খুব কমপ্লিকেটেড ছিল। বিধবা মায়ের একমাত্র মেয়ে — অনেক স্ট্রাগল করেছে, অনেকে আবার তার অ্যাডভান্টেজ নিয়েছে।”

“কী রকম?”

ভাস্বতীর মুখটা এবার লাল হল। “কলকাতায় অভিভাবকহীন অবিবাহিত মেয়েদের পদে পদে বিপদ। রক্ষক এখানে ভক্ষক হয়।”

ধরে নিলাম এটা ভূমিকা, আরও কিছু বলবে, তাই চুপ করে রইলাম।

“তোমাকে আমি প্রায় চিনিই না বাপিদা, কিন্তু এগুলো তোমাকে বললে যদি ভাস্বতীর খুনের কোনো কিনারা হয়, তাই লজ্জা না করেই বলব।”

“লজ্জা পাবার কোনো কারণ নেই, তুমি বলো।”

“স্পোকেন ইংলিশ ইনস্টিটিউডের মালিক ধ্রুব দত্ত ওকে সেক্সুয়ালি হ্যারাস করত। একটু আধটু সবার সঙ্গেই লোকটা অসভ্যতা করার চেষ্টা করত। নন্দিতা ছিল খুব সফট, ওকেই বেশি করত। নন্দিতাকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিল সমুদা। পরে জানলাম সে আরও জঘন্য চরিত্রের লোক। নন্দিতাকে ব্ল্যাকমেল করে... ওর সঙ্গে... ওর সঙ্গে শুত!”

এ ধরণের ঘটনা আগেও শুনেছি। তাও জিজ্ঞেস করলাম, “কী করে ব্ল্যাকমেল করত?”

“নন্দিতার ড্রিঙ্কে কিছু মিশিয়ে ওকে বেহুঁস করে অনেক নোংরা ছবি তুলেছিল, সেগুলো ওর বিধবা মাকে দেখিয়ে দেবে বলে ভয় দেখাত।”

“পুলিশকে নন্দিতা জানায়নি কেন?”

“তুমি এদেশের পুলিশকে কতটা জানো জানি না, এগুলো জানালে ওর ভালো থেকে মন্দ হতো!”

“তুমি জানালে না কেন?”

“আমি পুলিশের কোনো ঝামেলায় জড়াতে চাইনি। যখন একেনবাবুর ফোন পেলাম,

তখন ঠিক করলাম ওঁকে এটা জানাব। শুধু পুলিশ মহল নয়, বাইরের অনেকেও ওঁর সততা আর রহস্য উদ্‌ঘাটন করার ক্ষমতার কথা জানে। ওঁকে নিয়ে তোমার লেখাও পড়েছি। কিন্তু বড্ড কম লেখো।”

“আমি তো লেখক নই, বাট থ্যাঙ্ক ইউ। আর কী বলবে বলো।”

“হ্যাঁ আরও আছে, বলছি। এইবার সমুদার হাত থেকে মুক্তি পেতে নন্দিতা রাজা বলে একটি ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ করে। রাজার কথা ও শুনেছিল স্পোকেন ইংলিশ ক্লাসে কারও কাছ থেকে। সে নাকি গুন্ডামি ছাড়াও উপকার করে বেড়ায় রবিনহুডের মতো। সেই রাজা নাকি সমুদাকে বেশ কড়কে দিয়েছিল! কিন্তু তার জন্যে রাজাকেও পারিশ্রমিক দিতে হয়েছিল। পারিশ্রমিকটা টাকা নয় এটা জানি।”

“এটা কোন সময়ের ঘটনা?”

“আমার সঙ্গে শেষ দেখা হওয়ার দিন দশেক আগের।”

এবার আমি বুঝলাম শুভেন্দু যখন সমুদাকে নন্দিতার কথা জিজ্ঞেস করছিল সমুদা কেন থতমত খেয়ে গিয়েছিল। রাজার কাছে কড়কানি খেয়ে নন্দিতার সঙ্গে সমুদা যোগাযোগ রাখতে সাহস পায়নি। কেন যোগাযোগ রাখেনি, সেই সত্যটা বলতে পারেনি, আর শুভেন্দু ভাবছিল সমুদা কিছু একটা গোপন করার চেষ্টা করছে!

আমি চুপ করে আছি দেখে ভাস্বতী বলল, “কী ভাবছ?”

“কিছু না, বলো।”

“বাড়িতে সে সময়ে নন্দিতার জন্য পাত্র খোঁজা হচ্ছিল। আমি ওকে ভরসা দিচ্ছিলাম, বিয়ের পর এইসব ঝুট-ঝামেলা থেকে মুক্তি পাবি। নন্দিতা শুধু বলেছিল— ভার্জিনিটি নেই, কোন মুখে বিয়ের পিঁড়িতে বসবে, তার আগে সুইসাইড করবে।”

“দ্যাট্‌স ননসেন্স!” আমি বললাম। “প্রি-ম্যারিটাল সেক্স ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত হোক, কোনো অপরাধ নয়।”

“আমিও তাই বলি, কিন্তু এদেশের সব ছেলেরা তো তোমার মতো নয়, বিয়ের সময় সবাই খোঁজে পবিত্র মেয়ে!”

“স্পোকেন ইংলিশ ক্লাসের মালিককে আমি দেখেছি।” আমি বললাম,

“দেখলেই মনে হয় বাজে ক্যারেক্টার!”

“বাজে বলে বাজে, আমরা সবাই ওকে হাড়ে হাড়ে চিনি!”

“আর এই রাজা লোকটা, সে কোথায় থাকে?”

“শুনেছি তিলজলায় বাড়ি। ঠিক কার কাছ থেকে নন্দিতা ওর খোঁজ পেয়েছিল সেটা আমাকে বলেনি। তবে আমি ধরে নিচ্ছি পুলিশের খাতায় ওর নাম আছে।”

“আর কিছু?”

“না, এটাই। তোমরা কবে ফিরে যাচ্ছ?”

“জানুয়ারির ১২ তারিখে।”

“তাহলে তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না।” ভাস্বতীর মুখটা যেন বিষণ্ণ।

পকেট থেকে আমার একটা কার্ড এগিয়ে দিয়ে বললাম, “এখানে আমার ইমেল আছে। যোগাযোগটা থাকবে।”

“আরেকটা কার্ড দাও।”

আমি একটু অবাক হয়ে আরেকটা কার্ড দিলাম। কার্ডের উলটোদিকে কিছু লিখে কার্ডটা ফেরৎ দিল। হাতের লেখাটা সুন্দর — ভাস্বতী মিত্র, নীচে ওর ইমেল অ্যাড্রেস।

“আমি কিন্তু প্রথমে ইমেল করব না, তুমি করবে।”

আমি ওর কথার ধরণে হেসে ফেললাম।

"ফেসবুকে আছ?" জিজ্ঞেস করল ভাস্বতী।

"না, কলেজে পড়াই, তাই একটু লুকিয়ে থাকি।"

"আমিও আমার ছবি ফেসবুকে রাখি না, তার বদলে একটা কুকুরের ছবি।" তারপর একটু মুখ টিপে হেসে বলল, "আচ্ছা, আমি পবিত্র কি না জিজ্ঞেস করলে না তো?"

তাজ্জব! এই সাত বছরে কলকাতা কি পালটে গেছে? এই মেয়ের সঙ্গে নিউ ইয়র্কের হিপ মেয়েদের তো কোনো তফাতই নেই!

আমিও তালে তাল রাখলাম, "ঠিক কথা, সত্যি করে বলো তো, তুমি কি পবিত্র?"

দুজনেই হাসলাম।

"আমাকে মাসির বাড়িতে নামিয়ে দিতে পারবে?"

"নিশ্চয়, চলো।"

গাড়িতে আর কোনো কথা হল না। ও কি ভাবছে আমি জানি না, আমি কিন্তু ওর কথাই ভাবছিলাম। সত্যি, এরকম সপ্রতিভ মেয়ে বেশি দেখিনি। হঠাৎ প্রমথর একটা কথা মনে পড়ায় হাসি পেয়ে গেল। আমার সব লেখাতেই নাকি একটা ব্যর্থ প্রেমের কাহিনি থাকে!

"হাসছ কেন?"

"কিছু না।"

ভাস্বতী ভুরু কুঁচকে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল, কিছু বলল না।

নামার সময় আমার কাঁধটা আলতো করে ছুঁয়ে বলল, "ভালো থেকো।"

"তুমিও। আবার নিশ্চয় দেখা হবে। "

ওর চোখটা যেন বলে উঠল, 'সত্যি বলছ?'

এর উত্তর কথায় হয় না।

## ।। ৫।।

পরের দিন সকালে একেনবাবুর ফোন, "কী করছেন স্যার, চলে আসুন।"

আমি তো এক পায়েই খাড়া। গিয়ে দেখি প্রমথও এসে হাজির।

"আপনাদের প্রোগ্রেস রিপোর্ট দিই", বলে ভাস্বতীর সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার কথা বললাম।

একেনবাবু মন দিয়ে ভাস্বতী যা যা বলেছে শুনলেন। ব্যক্তিগত অপ্রয়োজনীয় অংশটুকু বাদ দিলাম।

প্রমথ বলল, "কিছু তো লুকোচ্ছিস বুঝতে পারছি। যাক, সব কিছু বলতে হবে না। তোর প্রাইভেট ব্যাপারে আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই।"

"গো টু হেল!"

একেনবাবুর ফোকাস অন্যদিকে। "বুঝলেন স্যার, এই সমুবাবুকে একটা শাস্তি দেওয়া দরকার। কিন্তু যাকে ব্ল্যাকমেল করে এই দৈহিক অত্যাচারটা করতেন তিনিই তো বেঁচে

নেই যে কমপ্লেন করবেন! আর খুনের দায়েও ওঁকে ধরা যাবে না।”

“সেটা কেন বলছেন?”

“পুলিশের সাসপেক্ট লিস্টে উনি ছিলেন, কিন্তু ব্লাড টেস্ট করে ম্যাচ পাওয়া যায়নি।”

“তার মানে?”

“মিস নন্দিতাকে খুনি যখন ছুরি মেরেছিল, তখন ধ্বস্তাধ্বস্তিতে খুনিও জখম হয়। আইডেন্টিফিকেশনের প্রথম স্টেপ হল ব্লাড টাইপ ম্যাচ করা। তারপর পজিটিভ হবার জন্যে ডিএনএ টেস্ট।”

“এবার বুঝেছি। তাহলে তো ওই রাজা নামের লোকটাকে খুঁজে বার করা দরকার।”

“ঠিক কথা স্যার। আমি এখুনি ফোন করছি”, বলে অধীরবাবুকে ফোন করতে গেলেন।

একেনবাবু যখন ফোন করছেন তখন প্রমথ বলল, “ভাস্বতী না হয় ব্যাপারটা চেপে গিয়েছিল, কিন্তু এই সমু ক্যারেক্টারকে পুলিশ যখন জেরা করছিল, তখন সে রাজার কথা বলেনি কেন?”

“বললে তো নিজের কীর্তি ফাঁস হয়ে যেত!”

ইতিমধ্যে চা নিমকি ভাজা এসে গেছে। একেনবউদিও এসে বসেছেন।

একেনবাবু ফোন সেরে এসে দুটো নিমকি মুখে দিয়ে বললেন, “বুঝলেন স্যার, চায়ের সঙ্গে নিমকির কোনো বিকল্প নেই।”

“বিকল্প! কী ব্যাপার মশাই, বেশ কঠিন কঠিন শব্দ ব্যবহার করছেন!” প্রমথ বলল।

“কেন স্যার, ‘বিকল্প’ শব্দটা তো বেশ ভালো। আমাদের উচিত ভালো ভালো বাংলা শব্দ বেশি করে ব্যবহার করা।”

“আমার কী মনে হচ্ছে জানেন? আপনার এই বাঙলা-প্রীতির মূল কারণ হল স্পোকেন ইংলিশ মার্ডার মিস্ট্রির হাতে আপনার ল্যাজে-গোবরে হওয়া।”

“এটা ভালো বলেছেন স্যার। তবে কী জানেন, ইংরেজি বলতে শেখাটা ভালো, কিন্তু তা বলে বাংলায় যখন-তখন ইংলিশ ব্যবহার সাপোর্ট করা যায় না।”

“বলতে চাইছেন ‘সমর্থন’ করা যায় না। কিন্তু আগে তো সেটাই করতেন! ঠিক আছে, তাহলে এখন ‘স্যার’ ছেড়ে ‘মহাশয়’ বলা শুরু করুন।”

“শুনছেন স্যার, প্রমথবাবুর কথা,” এবার একেনবাবু আমাকে সাক্ষী মানলেন। “মহাশয়, মহাশয় বলে কথা বলা যায় নাকি!”

“আপনি ছাড়ুন ওর কথা। এখন বলুন তো কালকে সারাদিন আপনি কোথায় ডুব মেরেছিলেন?”

“ডুব মারব কেন স্যার, অধীরের এক কলিগের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলাম।”

“কী ব্যাপারে?”

“মিস নন্দিতার আগে স্যার আর একটি মেয়ে প্রায় একইভাবে খুন হয়েছিল। কাল তারই খবরাখবর নিচ্ছিলাম।”

“কী জানলেন?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“বিশেষ কিছু জানতে পারলাম না। ইনভেস্টিগেটিং অফিসার ছুটিতে আছেন। ফাইলগুলো তালাবন্দি। যেটুকু জানতে পারলাম, তা হল মেয়েটির নাম ছিল মিস শর্মিলা দত্ত। ট্র্যাভেল এজেন্সিতে কাজ করতেন।”

“দাঁড়ান দাঁড়ান, এর কথাই তো সেদিন মনোজবাবু বললেন!”

“হ্যাঁ, স্যার। শর্মিলা থাকতেন গোলপার্কে একটা মেয়েদের হস্টেলে। হস্টেলটা মিস

নন্দিতার হস্টেল থেকে খুব দূরেও নয়। একইভাবে গলা টিপে ধরে গলায় দড়ির ফাঁস দেওয়া। তবে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়নি। আততায়ী আধমরা অবস্থায় ফেলে রেখে গিয়েছিল। কিন্তু জ্ঞান আর ফেরানো যায়নি। আর একটা মিল, মিস শর্মিলাকেও মলেস্ট করা হয়েছিল, কিন্তু রেপ নয়।"

আমি বললাম, "আপনি কি দুটো খুনের মধ্যে লিঙ্ক খুঁজছেন? মোডাস অপারেন্ডি তো এক নয়, নন্দিতাকে তো ছুরিও মারা হয়েছিল!"

"হয়তো খুনি দ্বিতীয়বার চান্স নিতে চায়নি।" প্রমথ বলল।

"এটা ভালো বলেছেন স্যার। তবে যেটা মোস্ট ইনটারেস্টিং সেটা হল এই মেয়েটিও আইডিয়াল স্পোকেন ইংলিশ ইনস্টিটিউশনে পড়েছিল।"

"ওয়েট এ মিনিট, আপনি কী বলতে চাচ্ছেন? একজন খুনি শুধু একটা বিশেষ স্কুলের মেয়েদের খুন করছে!"

"সম্ভাবনাটাকে তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না স্যার।"

"কিন্তু কেন?"এবার প্রমথ প্রশ্নটা করল।

"আই হ্যাভ নো ক্লু স্যার।"

"তাহলে কাল সারা দিন ধরে করলেনটা কী?"

একেনবাবু উত্তর না দিয়ে পা নাচাতে লাগলেন। উনি কিছু একটা ভাবছেন, কিন্তু সেটা ঠিক কী— জানাতে এখনও রাজি নন!

আমি মনে মনে ভাবছিলাম, এই দু'টো খুনের সঙ্গে স্পোকেন ইংলিশ স্কুলেরই কোনো একটা লোকের যোগাযোগ থাকতে হবে। সেদিন যে অভদ্র লোকটা মিলনী কাফেতে চা পাচ্ছি না বলে চ্যাঁচামেঁচি করছিল, সে যদি হয় আশ্চর্য হব না। লোকটা যে বদ সে তো জানিই, চেহারাটাও ক্রিমিন্যাল টাইপের। জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা, ওদিন মিলনী কাফেতে স্কুলের যে মালিককে দেখলাম, তার সম্পর্কে কোনো খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে?"

"অধীর তো বলল হয়েছে। লোকটার অ্যালিবাইও আছে।"

"ওখানকার ছাত্রদের জেরা করেছে?"

"সন্দেহের তালিকায় যে ক'টা ছেলে ছিল সবাইকেই করা হয়েছে। কিন্তু আমি ভাবছি স্যার,খুনি তো পুরুষ মানুষ নাও হতে পারে।"

"এটা কেন বলছেন?"

"মলেস্ট করা হয়েছে, কিন্তু রেপ করা হয়নি।" একটু অন্যমনস্ক ভাবে একেনবাবু বললেন।

"ভেরি ইনটারেস্টিং," প্রমথ বলল। "খুনি মেয়ে হলে হস্টেলের দারোয়ানদের চোখ এড়িয়ে যাওয়াটাও সহজ।"

"কিন্তু মোটিভটা কী?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"কি স্টুপিডের মতো কথা বলছিস! লাভ ট্রায়াঙ্গেল। প্রেমের প্রত্যাখ্যানও হতে পারে।"

"প্রেমের প্রত্যাখ্যান বলতে কী বলতে চাইছিস, লেসবিয়ান কোনো সমস্যা?"

"সেটা হতে অসুবিধা কি!" প্রমথ সবজান্তার ভাব করল।

"তাহলে নেক্সট স্টেপটা কি?" আমি একেনবাবুকে প্রশ্নটা করলাম।

"সেটাই ভাবছি স্যার। মুশকিল হচ্ছে হাতে আমাদের সময় বেশি নেই। আমাকে একবার অধীরের কাছে যেতে হবে। আপনারা আসতে চান?"

"নিশ্চয়," আমি প্রমথ দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠলাম।

"অধীর স্পোকেন ইংলিশ স্কুলের স্টুডেন্ট অ্যাডমিশন রেকর্ডগুলো কোর্ট অর্ডার দিয়ে আনিয়েছে। আজকের রাতটা পুলিশের হেফাজতে ওগুলো থাকবে। আমরা এখন গেলে দেখতে পারব।"

"ওগুলো দেখে কী লাভ হবে? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"জানি না স্যার। তবে শুক্তির মধ্যে থেকেই তো হঠাৎ করে মুক্তো বেরিয়ে পড়ে।"

বুঝলাম, একেনবাবু কিছু একটা খুঁজছেন।

পুলিশ থানায় অধীরবাবু আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। একেনবাবু আমাদের পরিচয় একটু বাড়িয়ে বাড়িয়েই করলেন, যেমন সাধারণত করেন।

"আসুন স্যার, এই ঘরেই ফাইলগুলো আছে।" ওঁর অফিসের পাশে ছোট্ট একটা ঘরে আমাদের নিয়ে গেলেন। "যা দেখার আজকেই দেখতে হবে, কাল সকালে সব ফেরত চলে যাবে।"

অধীরবাবুর বোধ হয় কোথাও যাবার ব্যাপার ছিল, ওঁর এক জুনিয়র অফিসার বিজয়বাবুকে রেখে গেলেন। বিজয়বাবু মনে হল একেনবাবুকে প্রায় দেবতা জ্ঞান করেন।

প্রত্যেকটা বছরের জন্য এক একটা করে চারটে ফাইল ফোল্ডার। প্রত্যেকটা ফোল্ডারের প্রথম পাতায় নামের একটা লিস্ট। লিস্টে যাদের নাম আছে, তাদের ভর্তি হবার অ্যাপ্লিকেশনগুলো ফোল্ডারের ভেতর আছে। প্রতিটি ফোল্ডারে প্রায় একশোটার মতো অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম। ছাত্রছাত্রীর ছবি, ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, ফোন নম্বর, হাবিজাবি অনেককিছু সেখানে রয়েছে। ছাত্রীদের সংখ্যাই মনে হল বেশি।

একেনবাবু চট করে লিস্টগুলিতে চোখ বুলিয়ে একটা ফর্ম বার করলেন। তারপর প্রায় নিজের মনেই বললেন, "ছবিটা তো দেখছি মিসিং!"

"কার ছবি?" প্রমথ জিজ্ঞেস করল।

উত্তরে কাগজটা আমাদের দিকে এগিয়ে দিলেন একেনবাবু। শর্মিলা দত্তর অ্যাপ্লিকেশন। তারপর ফোল্ডার থেকে আরেকটা ফর্ম বার করে বিজয়বাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "এ দুটো ফর্ম কি কপি করা যাবে?"

বিজয়বাবু একটু কাচুমাচু মুখে বললেন, "কপি মেশিনটা স্যার খারাপ হয়ে বসে আছে। কালকে মিস্ত্রি আসবে।"

"ঠিক আছে, তাহলে হাতেই টুকতে হবে।" বিজয়বাবুকে কথাটা বলে প্রমথের হাতে দ্বিতীয় ফর্মটা দিলেন। ফর্মটা নন্দিতার। আমাকে ধরিয়ে দিলেন শর্মিলার ফর্মটা।

"এ দুটো থেকে নাম ঠিকানা কোথায় পড়াশুনো করেছেন—যা যা আছে সেগুলো একটু টুকে নেবেন স্যার?"

বিজয়বাবুর কাছ থেকে দুটো সাদা কাগজ নিয়ে আমরা আমাদের কাজে লাগলাম।

একেনবাবু দেখলাম ঝড়ের বেগে অন্য ফর্মগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে যাচ্ছেন। কী দেখছেন, ভগবান জানেন। আমাদের কাজ শেষ। ওঁর জন্য অপেক্ষা করছি।

"আপনাদের কাজ শেষ স্যার?" ফর্মগুলোর ওপর চোখ বোলাতে বোলাতেই জিজ্ঞেস করলেন।

"আমাদের কাজ তো শেষ। কী দেখছেন এত?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"এখনও জানি না স্যার। মনে হচ্ছে অন্ধকারে হাতড়াচ্ছি!" ফর্মগুলো ফোল্ডারে পুরতে পুরতে বললেন। গলার স্বর শুনে মনে হল একটু যেন নিরাশ।

"আচ্ছা মিস শর্মিলার পার্মানেন্ট অ্যাড্রেসটা কি?"

প্রমথ উত্তর দিল, "বারুইপুর। পুরো ঠিকানাটা জানতে চান?"

"তার দরকার নেই স্যার, বারুইপুর তো কাছেই।" তারপর একটু মাথা চুলকে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "কালকে কি ওখানে একবার যাওয়া যায় স্যার?"

এখানে গাড়িধারী বলতে আমি। বারো বছরের পুরোনো গাড়ি। বাবা কিনেছিলেন, কিন্তু এখনও মোটামুটি চলছে।

"তা নিশ্চয় যাওয়া যায়, কিন্তু কারণটা কী?"

"দেখি স্যার, একটু কথা বলে আসি।"

রাত্রে বাড়ি ফিরে কী হল জানি না ফেসবুক খুলে বসলাম। ভাস্বতী যখন ফেসবুকে আছি কিনা জিজ্ঞেস করেছিল, তখন পুরো সত্যি কথা আমি বলিনি। ফেসবুকে আমার একটা অ্যাকাউন্ট আছে 'দে দে' নামে, কিন্তু সেটা নামে মাত্র। কালেভদ্রে সেখানে ঢুকি, বন্ধুবান্ধব সেখানে বিশেষ নেই। ফেসবুকে ঢুকে আমি ভাস্বতীর খোঁজ করলাম। কার্ডে ওর নাম ইমেল দুটোই ছিল। অনেকগুলো ভাস্বতী মিত্র আছে, তারমধ্যে একটাতে কোনো মুখই নেই, আরেকটাতে একটা কুকুরের ছবি। সেটাকেই খুললাম। দেখলাম বেশ কিছু বন্ধুর ছবি, বেশির ভাগই ওর বয়সি মেয়েদের। নন্দিতার কোনো ছবি দেখলাম না। হয়তো ও ফেসবুকে ছিল না। কয়েকটা মাত্র ছেলের ছবি। ফেসবুক একজনের বন্ধু-বান্ধব কারা, নিজের ওয়ালে সে কী লেখে, অন্যের লেখায় কী কমেন্ট করে — এসব থেকে তার চরিত্রের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। কাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ভাস্বতী? একটা ছেলের ছবি ক্লিক করে মনে হল এয়ারলাইনের কোনো বন্ধু। আরেকটা ছেলে আর্টিস্ট। আরেকটা ছেলে কী করে বুঝলাম না, কিন্তু তার ফেসবুক পাতায় একটা ছবি দেখে চমকে উঠলাম! শান্তিনিকেতনের বিখ্যাত বইয়ের দোকান 'সুবর্ণরেখা'-র সামনে তোলা ছবি। ভাস্বতীর ফেসবুকের বন্ধুর পাশে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে, তাকে দেখতে অনেকটা নন্দিতার মতো! ছবির কোয়লিটিটা ভালো নয়। জোর করে কিছু বলা অসম্ভব। ছেলেটির নাম বীর, বীর রায়। মুখটা চেনা চেনা, কিন্তু প্লেস করতে পারলাম না।

দেখামাত্র একটা অশুভ চিন্তা আমাকে গ্রাস করল। একেনবাবু বলেছিলেন, খুনি পুরুষমানুষ নাও হতে পারে। বীর রায় কি আগে ভাস্বতীর প্রেমিক ছিল? ভাস্বতীকে ডাম্প করে সে নন্দিতার কাছে যাওয়ার জন্য ভাস্বতী নন্দিতাকে খুন করেছিল? কিন্তু ভাস্বতীকে দেখে তো... ও মাই গড!

রাত্রি হয়ে গেছে পরের দিন সকালেই একেনবাবুকে ফোন করলাম। সব শুনে একেনবাবু বললেন, "ভেরি ইন্টারেস্টিং স্যার। আমি একবার ছবিটা দেখতে চাই, কিন্তু আমার এখানে তো ইন্টারনেট নেই।"

"নো প্রব্লেম, আমি আজ মোবাইলে ছবিটা আপনাকে দেখাব। অন্য পসিবিলিটি হল, এই বীর রায়ও নন্দিতাকে খুন করতে পারে।"

"এটা কেন বলছেন স্যার?"

"নন্দিতার সঙ্গে শোবার পর ও বুঝতে পারে নন্দিতা ভার্জিন ছিল না। তখনই একটা তীব্র ঘৃণা জন্মায়। সেই ঘৃণাবশত পরে এসে খুন করে! আরও সম্ভবনা আছে। ধরুন, একাধিক যৌন-সঙ্গী থাকার ফলে নন্দিতার যৌনরোগ হয়েছিল। সেটা বীর রায়ের মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছিল। ঘৃণা হবার তো নানা কারণ থাকতে পারে!"

"সবই সম্ভব স্যার, সবই সম্ভব। বারুইপুর যেতে যেতে এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে।"

বারুইপুর যাবার সময়ে আমি আমার আই-ফোনে ফেসবুক খুলে একেনবাবুকে বীর রায় আর নন্দিতার ছবি দেখালাম। একেনবাবু ভালো করে ছবিটা দেখে জিজ্ঞেস করলেন “ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, মিস নন্দিতা কি না, তবে মিল আছে ঠিকই। আর কোনো ছবি আছে এঁদের দুজনের?”

আনফর্চুনেটলি ফেসবুক ফোল্ডারে বীর রায়ের বেশ কিছু সেলফি ছিল, কিন্তু নন্দিতার ছবি ছিল না। বীর রায়ের ছবিগুলো মন দিয়ে দেখলেন একেনবাবু।

“কী বুঝলেন?”

“আমি একটু কনফিউজড স্যার।”

“তার মানে?”

“তার মানে আপনি যা বলছেন, তা হতে পারে— আবার নাও হতে পারে।”

প্রমথ বিরক্ত হয়ে বলল, “প্রোফাউন্ড স্টেটমেন্ট – হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে!” বলে পেছনের সিটে বসে একটা বই পড়ছিল তাতে মন দিল।

## ।। ৬।।

বারুইপুরে পৌঁছে একটু ঘোরাঘুরির পর গন্তব্যস্থল খুঁজে পেলাম। একটা নিম্ন মধ্যবিত্ত কলোনির ছোট্ট বাড়ি। বয়স্ক এক ভদ্রলোক বারান্দায় বসে পত্রিকা পড়ছিলেন।

আমাদের দেখে পত্রিকাটা নামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “আপনারা?”

একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “স্যার, আপনাদের একটু বিরক্ত করতে এসেছি। এটাই কি মিস শর্মিলার বাড়ি?”

শর্মিলার নামটা শুনে ভদ্রলোকের মুখটা কী রকম জানি হয়ে গেল। বললেন, “ছিল, কিন্তু সে তো আর বেঁচে নেই।”

“জানি স্যার। তাঁর খুনিকে ধরবার জন্যেই আমরা চেষ্টা করছি।”

“আপনারা কি পুলিশ?”

“না স্যার।”

“পত্রিকার লোক?”

“তাও না স্যার।”

“তাহলে!” ভদ্রলোকের চোখে বিস্ময় ও বিরক্তি।

আমি তখন এগিয়ে গিয়ে একেনবাবুর পরিচয় দিলাম। একটু ফলাও করেই দিলাম।

ভদ্রলোক চুপ করে শুনলেন।

“আমি শর্মিলার দাদু।”

একেনবাবু বললেন, “আমাদের দুয়েকটা প্রশ্ন ছিল স্যার, মিস শর্মিলা সম্পর্কে।”

“দেখুন, প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে আমরা ক্লান্ত হয়ে গেছি। কাজের কাজ কিছু হয়নি। আমার মেয়ে এ নিয়ে আর কারোর সঙ্গে কথা বলছে না।”

“বুঝতে পারছি স্যার আপনাদের বেদনার কথা। কিন্তু শুধু দু-একটা প্রশ্নই করব।”

ভদ্রলোক পত্রিকাটা পাশে সরিয়ে রাখলেন। “বেশ, করুন।”

"থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। আচ্ছা এই খুনের ব্যাপারে আপনাদের কাউকে সন্দেহ হয়?"

"না। আমার দিদিভাইয়ের কোনো শত্রু থাকতে পারে আমি কল্পনাও করতে পারি না।"

"কলকাতার মিস শর্মিলার বন্ধুবান্ধবদের কাউকে চেনেন?"

"না, তেমন কারও কথা তো আমরা শুনিনি।"

"মিস নন্দিতার কথা?"

"নন্দিতা, নন্দিতা..." একটু ভাবলেন ভদ্রলোক। "একজন নন্দিতা তো খুন হয়েছে কিছুদিন আগে, তার কথা বলছেন?"

"হ্যাঁ, স্যার।"

"না, তার কথা দিদিভাইয়ের কাছ থেকে শুনিনি। আপনি কি ভাবছেন ওদের মৃত্যুর মধ্যে কোনো যোগ আছে?"

"জানি না স্যার। তবে আর একটা অনুরোধ করছি, মিস শর্মিলার কোনো ফোটো আছে কি আপনাদের কাছে?"

"আছে। কিন্তু দিতে পারব না।"

"আমাদের দিতে হবে না স্যার, শুধু ছবিটা একটু দেখতে চাই।"

"বাইরের ঘরেই আছে। দরজা দিয়েই দেখতে পারবেন।" ভদ্রলোক দরজার দিকে আঙুল দেখালেন।

দরজা খোলাই ছিল। দরজার উলটোদিকের দেওয়ালে ঝুলছে মালা দেওয়া একটা ফোটো। কী আশ্চর্য এরকম ফোটো তো আগেও দেখেছি!

"অনেকটা নন্দিতার মতো চেহারা না?"প্রমথ চাপাস্বরে একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করল।

"অথবা ফেসবুকে বীর রায়ের সঙ্গে যে মেয়েটা, তার ছবি!" আমিও গলা নীচু করে বেশ উত্তেজিত হয়েই কথাটা বললাম।

একেনবাবু দেখছি মাথা চুলকাচ্ছেন। "ভেরি ইন্টারেস্টিং স্যার।"

তারপর বৃদ্ধ ভদ্রলোককে বললেন, "আর বিরক্ত করব না স্যার, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।"

ভদ্রলোক কিছু বললেন না। মুখের ভাবটা যেন আরেকটা আপদ বিদায় হল!

গাড়িতে উঠতে উঠতে প্রমথ বলল, "মনে হচ্ছে উই আর ফেসিং এ ডেঞ্জারাস সিরিয়াল কিলার! আপনার কী মনে হয় একেনবাবু?"

"সেই কিলার কি বীর রায় হতে পারে?" আমি প্রশ্ন তুললাম।

যাকে প্রশ্নটা করা সারাটা পথ তিনি একটা কথা বললেন না।

"দুত্তোর" বলে আমরা অন্য গল্প করতে লাগলাম।

গল্প করতে করতে যখন গোলপার্কে এসে পৌঁছেছি, একেনবাবু হঠাৎ বললেন, "চলুন স্যার, মিলনী কাফেতে মোগলাই খাই।"

"খাই মানে কি? খাবেন না খাওয়াবেন?" প্রমথ প্রশ্ন করল।

"দুটোই স্যার।"

"কী ব্যাপার বলুন তো? এই তো সেদিন খাওয়ালেন!"

"কেন স্যার, আমি কি আপনাদের দু'দিন খাওয়াতে পারি না?"

"তা অবশ্যই পারেন, কিন্তু সেটা আপনার ক্যারেক্টারের সঙ্গে খাপ খায় না।"

"তুই চুপ কর তো!" আমি প্রমথকে ধমক লাগালাম। তারপর একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম। "কবে যেতে চান?"

"এখনি।"

"এখনি মানে! বউদি?"

"ফ্যামিলি গেছে দিদির বাড়িতে, খেয়েদেয়ে রাত্রে ফিরবে।"

"বুঝতে পারছি আপনার বাড়িতে খাবার নেই, কিন্তু একা গেলে তো খরচা কম পড়বে!" প্রমথ টিপ্পনি কাটল।

"একসঙ্গে খাবার আনন্দ তো পাব না স্যার!"

এইরকম উতোর-চাপান চলতে চলতে আমরা মিলনী কাফেতে পৌঁছে গেলাম।

আমাদের দেখে মৃত্যুঞ্জয়বাবু কাউন্টার থেকে উঠে এসে বললেন, "আমার সৌভাগ্য আবার আপনারা এলেন!"

"কী যে বলেন স্যার, মোগলাইয়ের স্বাদ যা পেলাম, ওটা কি একবার খেয়ে মন ভরে!"

"বেশ, আর কী খাবেন বলুন?"

"স্রেফ চা আর মোগলাই।"প্রমথই আগ বাড়িয়ে অর্ডার দিল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "বেশি খসাতে চাই না একেনবাবুকে।"

"কী মুশকিল স্যার, আরেকটা কিছু নিন!"

"আমি নেব না, বাপি তুই?"

"আমিও না।"

"তাহলে সবার জন্যে তাই হোক স্যার। ভালো কথা স্যার, আপনার ভাই মনোজবাবুর একটু সাহায্য লাগবে। ওঁর নম্বরটা আছে আপনার কাছে?"

"নিশ্চয়, দাঁড়ান আমি লিখে দিচ্ছি।"

একটা কাগজে নম্বরটা লিখে আমাদের চা আর মোগলাই পরোটার অর্ডার নিয়ে মত্যুঞ্জয়বাবু চলে গেলেন।

একেনবাবু দেখলাম চারিদিকে তাকাচ্ছেন।

"কাকে খুঁজছেন?"

"আপনার সেই রতনকে তো স্যার দেখছি না।"

"ছুটিতে নিশ্চয়।"

"তাই হবে।"

খানিকবাদে যে ছেলেটি আমাদের খাবার দিতে এল, সেই বোধ হয় হরি।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "রতন কোথায়?"

চারিদিকে তাকিয়ে একটু চাপা গলায় বলল, "রতনকে বাবু তাড়িয়ে দিয়েছেন?"

"সে কী! কাজে ফাঁকি দিচ্ছিল?"

ছেলেটি কোনো উত্তর দিল না।

"ও কী করছে এখন জানো?"

"না। তবে ফটিকদা বলতে পারবে, ওর দোকানে আসে।"

ফটিকের দোকান আমি চিনি। পাশের রাস্তায় একটু দূরে একটা পানের দোকান ছিল ফটিকের। এখনও যে দোকানটা আছে জানতাম না।

খেয়ে দেয়ে একেনবাবু বললেন, "চলুন স্যার, একবার ওই ফটিকবাবুর দোকানে যাওয়া যাক।"

"কী ব্যাপার! রতনের এত খোঁজ কেন?"

একেনবাবু উত্তর দিলেন না।

আমাদের ভাগ্য বলতে হবে। ফটিকের দোকানে গিয়ে দেখি রতন বাইরের টুলে বসে আছে।

"কী রে তোকে নাকি মৃত্যুঞ্জয়বাবু তাড়িয়ে দিয়েছেন! কী করেছিলি?" প্রমথ জিজ্ঞেস করল।

আমাদের বিশেষ করে একেনবাবুকে দেখে রতনের মুখ সাদা হয়ে গেছে। ভীতভাবে একেনবাবুকে বলল, "বাবু আপনাকে কী বলেছেন জানি না, আমি কিন্তু চুরি করিনি বাবু।"

একেনবাবু সে কথার উত্তর না দিয়ে বললেন, "একটা কাজ করতে পারবে?"

"পারব বাবু, যা করতে বলবেন তা-ই করব।"

"ছেলেটা ভালো," ফটিক রতনের হয়ে ওকালতি করল।"কেউ ওকে ফাঁসিয়েছে!"

"তাহলে এসো," বলে একটু দূরে গিয়ে রতনকে কিছু একটা দেখালেন, একেনবাবু।

আমরাও যাচ্ছিলাম কী বলছেন শুনতে, কিন্তু ফটিক আটকাল, "আপনাদের জন্যে একটা ইস্পেশাল পান বানাচ্ছি। দারুন মশলা, খেয়ে দেখুন।"

ফটিকের পান এমনিতেই দুর্ধর্ষ। তার ওপর ইস্পেশাল মশলা! আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম।

সেখান থেকেই একেনবাবু কথা অস্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।

"এরকম চেহারা?"

রতন দেখলাম মাথা নাড়ছে।

"কোথায় থাকে?"

মাথা নাড়া দেখে মনে হল জানে না।

আরও কিছু প্রশ্ন করলেন একেনবাবু। প্রশ্নগুলো শুনতে পেলাম না। মাথা নাড়া দেখে মনে হল দুয়েকবার 'হ্যাঁ' বলছে, কিন্তু বেশির ভাগ উত্তরই মনে হল রতনের জানা নেই।

ফেরার পথে একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, "কী দেখালেন রতনকে?"

"মিস নন্দিতার ছবি।"

"কী বলল?"

"বলল, আরও একটা মেয়েকে দেখেছে, ওই ধরণের চেহারার।"

"হয়তো শর্মিলার কথা বলছে।" প্রমথ বলল।

"অথবা অন্য কোনো মেয়ে," একেনবাবু বললেন। "আজকাল স্যার সাজাগোজের জন্যে অনেকের মধ্যেই মিল খুঁজে পাওয়া যায়।"

"বীর রায়ের সেই মেয়েটা হতে পারে কি?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"কিছুই অসম্ভব নয় স্যার।"

"কী করে হয়? আমরা তো সবার ছবিই দেখলাম কালকে।"

"হয়তো সবার ছবি দেখিনি স্যার।"

"ভেরি ইন্টারেস্টিং। মিস শর্মিলার ছবি অ্যাপ্লিকেশন থেকে খুলে নেওয়া হয়েছিল সেটা তো দেখেছি। আপনি কি মনে করেন, এই মেয়েটির অ্যাপ্লিকেশনের পুরো ফর্মটাই ফোল্ডার থেকে কেউ সরিয়ে রেখেছিল!"

প্রমথ সোজাসুজি বলল, "কোচিং ক্লাসের মালিক ওই ধ্রুব দত্তকে আমার মোটেই পছন্দ নয়। ওর মধ্যে কিছু গোলমাল আছে। আই থিঙ্ক এ ব্যাপারে হি ইজ ইনভলভড।"

একেনবাবু শুধু বললেন, "এ মেয়ে যদি অন্য কেউ হয়, তাহলে আমাদের মেয়েটিকে

খুঁজে বার করতে হবে স্যার।”

আমি বললাম, “সিরিয়াল কিলার যদি এই চেহারার মেয়েদের ধরে ধরে খুন করে, তাহলে তো শি ইজ ইন ডেঞ্জার!”

“সেটাই ঠেকাতে হবে স্যার।”

“কী করে?”

“ভাবার চেষ্টা করছি স্যার।”

“আপনি ভাবুন, আমি চললাম,” প্রমথ বলল। “সেই সকাল থেকে দৌড়দৌড়ি! নিউ ইয়র্ক যাবার আগে এক গন্ডা জিনিস কিনতে হবে, ফালতু সময় নষ্ট হচ্ছে!” প্রমথ কখন ক্ষেপে যায় প্রেডিক্ট করা কঠিন।

আমার অপেক্ষা না করেই একটা ট্যাক্সি ধরে প্রমথ অদৃশ্য হল।

“আপনি কোথায় যাবেন, বাড়ি?” একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম।

“না স্যার, ফ্যামিলির ফিরতে এখনও দেরি। অধীর তো কাছেই থাকে, ওকে এই ব্যাপারটা জানিয়ে আসি। যদি মেয়েটার কোনো হদিশ করতে পারে।”

“চলুন, পৌঁছে দিই।”

“আরে না স্যার, এই তো কাছেই — হেঁটেই যাব।”

## ।। ৭ ।।

প্রমথর মতো আমারও বেশ কিছু কেনাকাটা ছিল। দু’টো দিন সেইসব জিনিস খুঁজে খুঁজে কিনতেই কাটল। এরমধ্যে একেনবাবু বা প্রমথ কারোর সঙ্গেই কথা হয়নি। একেনবাবুকে কয়েকবার ধরার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সব সময়েই ওঁর ফোন বিজি। শেষমেশ ধরতে পারলাম।

“কী ব্যাপার, আপনাকে তো ধরতেই পারা যায় না আজকাল!”

“কী যে বলেন স্যার! আপনাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম।”

“কেন বলুন তো?”

“বিকেলে কয়েকজনকে আসতে বলেছি মিস নন্দিতার ব্যাপারে। আপনি প্রমথবাবুকে নিয়ে আসুন স্যার কেসটা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাবে।”

“আলোচনা মানে? রহস্যের কিনারা করে ফেলেছেন না কি?”

“একটু প্রোগ্রেস তো হয়েছে। কিন্তু কনফিউশনও কিছু আছে। সবার সাহায্য নিয়ে যদি ব্যাপারটা ক্লিয়ার করে ফেলা যায়।”

“ঠিক আছে আসব। দেখি, প্রমথকে ধরতে পারি কি না।”

“কোথায় আসবেন, সেটা তো বলিনি স্যার।”

“কোথায়?”

“মিলনী কাফের ওপরে স্পোকেন ইংলিশ স্কুলে স্যার।”

“স্পোকেন ইংলিশ স্কুল!”

“হ্যাঁ স্যার, ওখানে অনেককে ডেকেছি। অধীরবাবুও থাকবেন।”

আমরা যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন দেখি, একেনবাবু আর অধীরবাবু মিলনী কাফের সামনে দাঁড়িয়ে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে কী জানি আলোচনা করছেন। সামনে আসতেই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে চিনতে পারলাম শর্মিলার সেই দাদু! আমাদের দেখে একেনবাবু কথাবার্তা থামিয়ে বললেন, "চলুন স্যার, ওপরে যাওয়া যাক।"

ওপরে যাবার সিঁড়ি মিলনী কাফের পাশ দিয়ে। উঠে ল্যান্ডিং-এর ডানদিকে একটা মিটিং রুম। ইতিমধ্যেই সেখানে শুভেন্দু, মনোজবাবু, মৃত্যুঞ্জয়বাবু, ধ্রুব দত্ত এবং একজন অপরিচিত ভদ্রলোক বসে আছেন। রতনকেও দেখলাম বসে আছে একটা টুলের ওপর।

অধীরবাবু সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "মিস নন্দিতার মৃত্যুর খুনের ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত গোয়েন্দা একেনবাবুকে আমি অনুরোধ করেছি। তিনি এ ব্যাপারে কতগুলো প্রশ্ন আপনাদের করতে চান। সেইজন্যেই আপনাদের এখানে ডাকা হয়েছে।"

একেনবাবু কোনো ভনিতা না করেই শুরু করলেন,

"দিন দশেক আগে মনোজবাবুর কাছে খবর পেয়ে শুভেন্দুবাবু আমার কাছে এসেছিলেন তাঁর বোন মিস নন্দিতার খুনিকে খুঁজে বার করতে।" এইটুকু বলে শুভেন্দুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ঠিক কি না স্যার?"

শুভেন্দু সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

"শুভেন্দুবাবু আমাকে বলেছিলেন, মিস নন্দিতার খোঁজ করতে উনি প্রথমে মিস নন্দিতার বিশেষ পরিচিত সমুদা মানে সমুবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। শুভেন্দুবাবু কি আমাকে ঠিক বলেছিলেন স্যার?"

অপরিচিত মাঝবয়সি যে ভদ্রলোক বসে ছিলেন তাঁকে উদ্দেশ্য করে একেনবাবু প্রশ্নটা করলেন। বুঝলাম উনিই হচ্ছেন সমুবাবু।

সমুবাবু মনে হল প্রশ্নটা শুনে একটু অস্বস্তি বোধ করছেন, কিন্তু 'হ্যাঁ' বলে মাথা নাড়লেন।

"তারপর আপনি আর শুভেন্দুবাবু মিস নন্দিতার ঘরে ঢুকে ওঁর মৃতদেহ আবিষ্কার করলেন। অর্থাৎ এর আগে স্যার আপনি জানতেন না যে মিস নন্দিতা মারা গেছেন। এটা কি ঠিক?"

সমুবাবু মাথা নাড়লেন।

"মনে হয় আপনি ঠিকই বলছেন স্যার, কারণ কোনো একটা কারণে মারা যাবার কয়েকদিন আগে থেকে মিস নন্দিতার সঙ্গে আপনার যোগাযোগ ছিল না। কারণটা একটু বলবেন স্যার?"

সমুবাবুর মুখটা দেখলাম ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। চেয়ারের হাতলের ওপর রাখা হাতটা নার্ভাসনেসে একটু একটু কাঁপছে।

"ঠিক আছে স্যার, সে নিয়ে পরে আলোচনা হবে— অধীরবাবুই সেটা করবেন।"

এই কথায় সমুবাবু দেখলাম হাতলটা চেপে ধরে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছেন। একেনবাবু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে স্পোকেন ইংলিশ অ্যাকাডেমির মালিক ধ্রুব দত্তকে নিয়ে পড়লেন, "মিস নন্দিতা তো আপনাদের এখানে পড়তেন ধ্রুববাবু, তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"আপনি কি ওঁকে ভালো করে চিনতেন স্যার?"

"হ্যাঁ, এখানে যারা পড়ে তাদের যেমন করে চিনি, সেরকমভাবেই চিনতাম।"

"আই সি। এখানে যাঁরা পড়েন স্যার, তাঁদের সবাইকে কি আপনি নিয়মিত রেস্টুরেন্টে

নিয়ে যান?”

“দূর দূর থেকে অনেকে এখানে পড়তে আসে। তাদের অনেকেই পড়ার পর নীচে মিলনী কাফে বা কাছাকাছি রেস্টুরেন্টে খেতে যায়। মাঝেমধ্যে আমিও তাদের সঙ্গে খাই।”

“সে তো অবশ্যই স্যার, তবে বিশেষ কারও কারও সঙ্গে কি ঘন ঘন খান?”

“কী বলতে চান আপনি?” ধ্রুববাবু আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে বললেন।

প্রশ্নটা উপেক্ষা করে একেনবাবু মৃত্যুঞ্জয়বাবুকে বললেন, “আপনি পুরো রেস্টুরেন্ট সামলাতে ব্যস্ত থাকেন সবার দিকে তাকানোর সময় আপনার থাকে না, তাই রতনকেই জিজ্ঞেস করি।”

একেনবাবু রতনকে কাছে ডাকলেন। তারপর নন্দিতার ছবিটা দেখিয়ে বললেন, “রতন, এঁকে তুমি আগে দেখেছ?”

“হ্যাঁ বাবু, নন্দিতাদি।”

“এঁর সঙ্গে কি ধ্রুববাবু মিলনী কাফেতে খেতে আসতেন?”

“হ্যাঁ বাবু।”

“মাঝেমধ্যে আসতেন, না প্রায়ই আসতেন?”

“প্রায় প্রতিদিনই আসতেন বাবু।”

“যতদিন এখানে মিস নন্দিতা পড়তেন ততদিন আসতেন?”

“না বাবু, শেষের দিকে আর আসতেন না।”

“আই সি। ঠিক আছে, তুমি যাও।”

একেনবাবু মাথাটা একটু চুলকোলেন। “আচ্ছা, আমাকে একটু বলুন তো স্যার, মিস নন্দিতার সঙ্গে কি আপনার ঝগড়া হয়েছিল?”

“এগুলো আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনাকে আমি উত্তর দিতে বাধ্য নই।” ধ্রুববাবু বিরক্ত মুখে বললেন।

“স্যার, মিস নন্দিতা খুন হয়েছেন। আপনার সঙ্গে যদি ওঁর ঝগড়া হয়ে থাকে, তাহলে আপনি তো রাগবশত ওঁকে খুনও করতে পারেন, পারেন না?”

“কী উন্মাদের মতো কথা বলছেন আপনি, কারোর সঙ্গে খাচ্ছি না বলে তাকে আমি খুন করব!” ধ্রুব দত্ত রেগে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন। “আর আমি তো পুলিশকে আগেই জানিয়েছি সেই রাত্রে আমি কোথায় ছিলাম!”

“ও হ্যাঁ স্যার, আমি তো সেটা ভুলেই গিয়েছিলাম। তাছাড়া আরও একজন খুন হয়েছেন যাঁর নাম মিস শর্মিলা। তিনিও আপনার এই স্কুলে পড়তেন। তাঁর সঙ্গে তো আপনি বেশি খেতেনও না, তাই না?”

ধ্রুব দত্ত উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলেন। কিন্তু বুঝলাম রাগে ফুঁসছেন।

“ঘাবড়াবেন না স্যার, মিস নন্দিতার খুনের সঙ্গে আপনি জড়িত বলে মনে হয় না। আসলে স্যার, আপনার আর সমুবাবুর ব্যাপারটা একটু আলাদা। আপনারা খুনি নন ঠিকই, কিন্তু আপনাদের আচরণের মধ্যে যে সব রহস্য জড়িত সেগুলোও ক্লিয়ার হওয়া দরকার। অধীরবাবু সেগুলো নিয়ে পরে মাথা ঘামাবেন, আমাকে সেই কাজের ভার দেওয়া হয়নি। আমাকে বলা হয়েছেমিস নন্দিতার খুনিকে ধরতে সাহায্য করতে। আমি স্যার অন্যদিকে যাবই না, বরং এই খুনটা নিয়েই একটু ভাবি। মিস নন্দিতাকে খুন করা হয়েছে গলা টিপে শ্বাসরুদ্ধ করে। তারপর খুনি ছুরিও চালিয়েছে। এতে কোনো সমস্যা নেই স্যার, কিন্তু মিস নন্দিতার গলায় দড়ির ফাঁসও লাগানো ছিল। সেটা কেন? দিস ট্রাবলড মি

স্যার, ট্রাবলড মি এ লট!”

“তারপর জানলাম আরও একজন প্রায় একইভাবে খুন হয়েছিলেন। তিনি হলেন মিস শর্মিলা। তাঁকেও শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়। পরে গলায় একটা দড়ির ফাঁস লাগানো হয়। শর্মিলা কিন্তু শ্বাসরোধের সঙ্গে সঙ্গে মরেননি। মারা গিয়েছিলেন হাসপাতাল যাবার পথে। দ্বিতীয়বার মনে হয় খুনি সেই চান্সটা নিতে চায়নি, মৃত্যু নিশ্চিত করতে সেই সঙ্গে ছুরিও চালিয়েছে। দুটি ক্ষেত্রেই খুনি ভিকটিমের পরিচিত, নইলে দরজা না ভেঙে ঘরে ঢুকে গলা টিপে হত্যা করা সম্ভব হতো না। দুটো ক্ষেত্রেই শরীরের অনাবৃত অংশে অত্যাচারের চিহ্ন, দুজনের ওপরেই খুনির একটা তীব্র রাগ ও ঘৃণা যেন প্রকাশ পেয়েছে। যাঁরা খুন হয়েছেন তাঁদের কল্পনাতেও আসেনি খুনির এই মনোভাবের কথা।

আরেকটা দিক স্যার খুবই ইন্টারেস্টিং — মিস শর্মিলা আর মিস নন্দিতার চেহারা অনেকটা একই ধরণের, একজনকে দেখলে আরেকজনের কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক। তখনই আমি বুঝলাম স্যার, আমরা এখানে একজন খুনির খোঁজ করছি যে হল ‘মিশন ওরিয়েন্টেড কিলার’। এ ধরণের খুনিরা মনে করে, এক ধরণের চেহারার মানুষের পৃথিবীতে বাঁচার অধিকার নেই! কেন সেটা মনে করে, তার নানান রকমের সাইকোলজিক্যাল ব্যাখ্যা থাকতে পারে। এ ক্ষেত্রে মিস নন্দিতা বা মিস শর্মিলার চেহারা দেখে তাদের প্রতি খুনির একটা তীব্র বিদ্বেষ নিঃসন্দেহে জেগে উঠেছিল। কিন্তু কেন, সেটাই আমি বোঝার চেষ্টা করছিলাম, তখন আমার মনে পড়ল, বাপিবাবুই তো চোখে আঙুল দিয়ে আমাকে সেটা দেখিয়েছিলেন!”

কথাটা শুনে আমি অবাক হয়ে একেনবাবুর দিকে তাকালাম!

“হ্যাঁ স্যার, আপনি। আপনি ফেসবুক থেকে বীর রায়ের পাতাটা দেখালেন,

যেখানে বীর রায় তাঁর বান্ধবীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেই বান্ধবীর চেহারা দেখে আপনি ভেবেছিলেন মিস নন্দিতা। না তিনি মিস নন্দিতা ছিলেন না। কিন্তু কে এই বীর রায়? মনোজবাবুকে ফোন করে জানলাম আবীর রায়ের ডাক নাম ছিল বীর। আবীর রায় গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন যখন তাঁর বান্ধবী তাঁকে ছেড়ে দিয়ে চলে যান।”

এবার একেনবাবু মৃত্যুঞ্জয়বাবুর দিকে তাকালেন।

“স্যার, একমাত্র সন্তানের মৃত্যুশোক এমনিতেই বিষম শোক, আরও অসহনীয় হয় যখন সে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। আপনি শুধু ভেঙে পড়েননি স্যার, আপনি মানসিকভাবে অসুস্থ। আপনার সন্তানের মৃত্যুর জন্যে দায়ী করছেন শুধু সেই বান্ধবীকে নয়, তার মতো চেহারার প্রত্যেকটি মেয়েকে। সন্তানের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়ে চলেছেন তাদের হত্যা করে, গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে, অত্যাচার করে! কোন অছিলায় আপনি ঢুকেছিলেন জানি না, কিন্তু দুটি মেয়েই আপনাকে স্নেহশীল কাকা বা জ্যাঠা ভেবে ঘরে ঢুকতে দিয়েছিল...।”

মৃত্যুঞ্জয়বাবু দেখলাম উঠে দাঁড়িয়েছেন। ওঁর নির্লিপ্ত মুখটা দেখে বোঝার উপায় নেই যে কী নৃশংস কাজ উনি করেছেন! বিচিত্র এই পৃথিবী, বিচিত্র এই মানুষের মন!

## ।। পরিশিষ্ট।।

আমি একেনবাবুকে বললাম, "আমি তো বুঝতেই পারিনি কেন সেদিন আপনি মৃত্যুঞ্জয়বাবুর কাছে মনোজবাবুর ফোন নম্বর চাইছিলেন? কিন্তু শিওর হলেন কী করে যে মৃত্যুঞ্জয়বাবুই খুনি?"

"স্যার, আবীরবাবু আর মনোজবাবুর মুখের মধ্যে একটা আদল আছে। তারপর যখন জানলাম ওঁর ডাকনাম বীর। তখন অধীরকে দিয়ে খুঁজে বার করলাম মৃত্যুঞ্জয়বাবুর ব্লাডগ্রুপ।"

"খুঁজে বার করলেন মানে?"

"সে কী স্যার, মনে নেই রেস্টুরেন্টে ডাকাতির সময় ওঁর গুলি লাগে! গুলি বার করতে যখন ওঁর সার্জারি হয়, হাসপাতালে রুটিন ব্লাড টেস্ট করা হয়েছিল। ব্লাড গ্রুপটা মিস নন্দিতার বিছানায় পাওয়া রক্তের সঙ্গে ম্যাচ করল। এখন ডিএনএ-র রেজাল্ট পেতে হবে কেসটা ফুল-প্রুফ করার জন্যে।"

# মেলাবেন তিনি মেলাবেন

বইয়ের গ্রুপ ॥ বইয়ের চ্যানেল

(প্রমথর মতে এটা গোয়েন্দা গল্প নয়, প্রেমকাহিনিও নয়— জগাখিচুরি। অবশ্য প্রমথর অ্যাপ্রুভাল নিয়ে কিছু ছাপতে হলে, আমি একটা গল্পও ছাপতে পারতাম না। তবু খাঁটি রহস্য-সন্ধানী পাঠকদের আগেভাগেই সতর্ক করছি।)

।। ১।।

একেনবাবু অ্যালাস্কা ক্রুজে যাবার তিনটে টিকিট পেয়েছেন। পারফেক্ট টাইমিং, ফল সেমিষ্টার শুরু হবার একটু আগে। কী করে টিকিটগুলো পেয়েছেন সে নিয়ে বেশি আলোচনা না করাই ভালো। এটা হল ওঁর একটি আন-অফিসিয়াল কর্মের পুরস্কার। আন-অফিসিয়াল, কারণ নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির ক্রিমিনোলজি ডিপার্টমেন্টের ফেলোশিপের শর্ত অনুসারে ওঁর বাইরের কোনো কাজ করার অনুমতি নেই। কিন্তু একেনবাবুর সুনাম নিউ ইয়র্কের পুলিশমহলে ও নানান প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সিতে বেশ ভালোই ছড়িয়েছে। না চাইলেও এদিক-ওদিক থেকে বছরে কয়েকবার ওঁর ডাক পড়ে। উনি অবশ্য বিনা পারিশ্রমিকেই কাজগুলি করেন। করেন স্রেফ নিজের মগজ খেলানোর তাগিদে।

প্রমথ এই নিয়ে প্রায়ই খোঁচায়। "এইসব ফালতু সার্ভিস না দিয়ে ঘরদোরগুলো তো একটু পরিষ্কার করতে পারেন। আপনার নিজের বেডরুমের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, ওটা তো একটা আস্তাকুঁড়। কিন্তু বাইরের ঘর আর রান্নাঘরটাও তো গোবর বানিয়ে রেখেছেন।"

"আসলে স্যার আমি একটু অগোছালো।" একটু মাথা চুলকে এটাই হল একেনবাবুর স্ট্যান্ডার্ড উত্তর।

"ওসব ছেঁদো এক্সকিউজ আপনি বাপিকে (অর্থাৎ আমাকে) দেবেন। ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়।"

ঠিক এই সময়ে একেনবাবু তাঁর মোক্ষম অস্ত্রটি ছাড়েন। "ঠিক আছে স্যার, আপনারা বসুন, আমি কফি বানাই।"

"থাক, ওটি করে আর কফিতে অরুচি ধরাবেন না। " বলে প্রমথ রান্নাঘরে যায়।

এই ব্যাপারটার পুনরাবৃত্তি মাসে অন্ততঃ একবার করে হয়। এইবারও যখন হচ্ছিল, তখন একেনবাবু হাসি হাসি মুখে প্রমথর হাতে টিকিটগুলো ধরিয়ে দিলেন।

"এটা আবার কি?"

"অ্যালাস্কা ক্রুজের টিকিট স্যার।"

প্রমথ ভুরু কুঁচকে একেনবাবুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কোত্থেকে পেলেন?"

"এই পেলাম স্যার। আপনি একদিন ক্রুজে যাবার কথা বলেছিলেন, তাই ভাবলাম—।"

একেনবাবু ওঁর বক্তব্য শেষ করতে পারলেন না। তার আগেই প্রমথ বলল, "নিজের গাঁটের পয়সা নিশ্চয় খরচা করেননি। করেছেন বললে, এক্ষুনি আপনাকে বেলভিউয়ে (নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত মেন্টাল হসপিট্যাল) পাঠানোর বন্দোবস্ত করব।"

"কী যে বলেন স্যার, পয়সার কথা আসছে কোত্থেকে, এটা একেবারেই

কমপ্লিমেন্টারি।”

প্রমথ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল আমি থামিয়ে দিয়ে বললাম, “চুপ কর, হু কেয়ার্স ফর দোজ ডিটেইলস। টিকিট পেয়েছিস, চল।”

অ্যালাস্কা ক্রুজের এক একটা টিকিটের দাম হাজার ডলারের বেশি। বোঝাই যায় ভালোবেসে কেউ এই তিনটে টিকিট একেনবাবুকে দান করেননি। কিন্তু সে নিয়ে আমার আর প্রমথের মাথাব্যথা কেন হবে! প্রমথ অনেক দিন ধরেই অ্যালাস্কা ক্রুজের কথা বলছে। গ্লোবাল ওয়ার্মিন-এর ফলে ওখানকার গ্লেশিয়ারগুলো গলতে শুরু করেছে। বছর কুড়ি বাদে হিমবাহের কিছুই নাকি আর অবশিষ্ট থাকবে না! শেষের কথাটা অবশ্য প্রমথর নিজস্ব অভিমত। তবে বরফগুলো যে দ্রুত গতিতে জল হয়ে যাচ্ছে, সেটা তো পত্রপত্রিকায় সবসময়েই পড়ছি। আমার নিজেরও অ্যালাস্কা যাবার ইচ্ছে অনেকদিন ধরেই ছিল। বইয়ে অ্যালাস্কা সম্পর্কে এত পড়েছি। ওখানকার ন্যাচারাল বিউটি নাকি একেবারে ভার্জিন কন্ডিশনে আছে, সভ্যতায় কলুষিত হয়নি। দেখলে ভুলতে পারা যায় না!

আমাদের টিকিট হল প্রিন্সেস ক্রুজ লাইনের। যে জাহাজে আমরা উঠব, সেটার নাম আইল্যান্ড প্রিন্সেস। ক্রুজ শিপ ছাড়বে ক্যানাডার পশ্চিমপ্রান্তে ভ্যানক্যুভার শহর থেকে। থামবে মোট চার জায়গায়— কেচিকান, স্ক্যাগওয়ে, জুনো আর উইটিয়ার। তারপর উইটিয়ার থেকে বাসে চড়ে অ্যাঙ্কারেজ এয়ারপোর্ট। প্লেনে ব্যাক টু নিউইয়র্ক— মোট পাঁচ দিন। হুইটিয়ার ছাড়া বাকি জায়গাগুলোতে ট্যুর-এর বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু তার দামের বহর দেখে একেনবাবু আগেভাগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জাহাজে বসে থাকবেন।

প্রমথ ধমক লাগিয়েছে, “আপনি তো আচ্ছা লোক মশাই, এতদূর গিয়ে বেড়াবেন না? তাহলে যাচ্ছেন কেন?”

কিন্তু একেনবাবু অনড়। তখন ঠিক হল, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হবে। পোর্টে নেমে দেখব সস্তায় কোথাও যাওয়া যায় কিনা। তেমন হলে আমি আর প্রমথ ঘুরে আসব, একেনবাবু না হয় জাহাজেই থাকবেন।

## ।। ২।।

আর সাতদিন বাদে ক্রুজ শুরু হচ্ছে। সামার ভেকেশন চলছে বলে পড়ানোর দায়িত্ব নেই, দেরি করেই ঘুম থেকে উঠেছি। বাইরের ঘরে দেখি একেনবাবু সোফায় বসে পা নাচাচ্ছেন। আমাকে দেখে বললেন, “বুঝলেন স্যার, প্রমথবাবু বলছিলেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বাংলাদেশ নাকি আমাদের পশ্চিমবঙ্গকে হার মানায়।”

বিশ্বনিন্দুক প্রমথর এটা বলার একমাত্র কারণ আমাকে উত্ত্যক্ত করা। প্রমথ জানে দুই বাংলা নিয়ে নীচের অ্যাপার্টমেন্টের তারেক আলীর সঙ্গে আমার নিয়মিত যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধটা মূলত কালচারাল সাইড — নাটক, গান, সাহিত্য ইত্যাদি নিয়ে। প্রমথ মাঝে মাঝে তাতে ইন্ধন জোগায়। একেনবাবুকে কিছু বলা মানে উনি সেটা আমাকে রিপিট করবেন। চেষ্টা হচ্ছে যুদ্ধের নতুন একটা ফ্রন্ট খুলতে।

আমি প্রমথর ফাঁদে পা দিলাম না। বললাম, "হতেই পারে, এ ব্যাপারে তো মানুষের হাত নেই। কিন্তু সে ব্যাটা গেছে কোথায়?"

"ল্যাবে। কী জানি একটা জরুরী কাজ আছে স্যার।" বলে একেনবাবু নিজের ঘরে অদৃশ্য হলেন।

আমি স্টোভ জ্বালাবার চেষ্টা করতে করতে ভাবছিলাম এবার এই প্রাগৈতিহাসিক স্টোভটাকে সার্ভিস করাতে হবে অথবা নতুন স্টোভ কিনতে হবে। আমি বা একেনবাবু কেউই ওটা জ্বালাতে পারি না। পাইলট কাজ করে না, বার্নারগুলোর অর্ধেক প্রায় বুজে গেছে। প্রমথ কিছু একটা করে, যার ফলে ওটা চালু হয়। কিন্তু ঠিক কী করে, সেটা ট্রেড-সিক্রেট করে রেখে দিয়েছে! লাইটার দিয়ে ক্লিক ক্লিক করছি আর গ্যাস নবটা ঘোরাচ্ছি। হঠাৎ স্টোভটা দপ করে জ্বলে নিভে গেল! চমকে এক পা পিছিয়ে গেলাম, "হোয়াট দ্য হেল!" এমন সময় শুনি তারেকের গলা, "বাপিদাদা, কোনো সমস্যা?"

বাইরের দরজা প্রমথ নিশ্চয় খোলা রেখে চলে গিয়েছিল, তারেক কখন ঢুকেছে খেয়ালও করিনি। ক'দিন আগে তারেক আমাকে এক চোট নিয়েছে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করা নিয়ে, যার কনক্লুশন— বাংলাভাষাকে বাংলাদেশই বাঁচিয়ে রাখবে, পশ্চিমবঙ্গ নয়। সেই থেকে আমি তক্কে তক্কে রয়েছি। 'কোনও সমস্যা' ইংরেজি নয় ঠিকই, কিন্তু এটি ইংরেজি any problem-এর একেবারে আক্ষরিক অনুবাদ। কলকাতায় কেউ ওভাবে কথা বলে না। আমি তারেককে চেপে ধরতেই বলল, "এটা ইংরেজি নয়, এটা বাংলাদেশের বাক্-রীতি। আমরা এরকম করেই কথা বলি 'সমস্যা নাই', 'অসুবিধা নাই', 'অবশ্যই'। আপনি যদি এর মধ্যে 'no problem', 'certainly' এসব খোঁজেন তাহলে তো মুশকিল!"

আমি অন্য লাইন ধরলাম। "শোনো তারেক, তুমি তো সেদিন লেকচার ঝেড়ে গেলে আমরা পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা বাংলাদেশের বই পড়ি না, সিনেমা দেখি না, ইত্যাদি। গত সপ্তাহে আমি সাতটা বাংলাদেশের নাটক দেখেছি ইউটিউবে, সেখানে তো ইংরেজির ছড়াছড়ি! 'ফ্রেশ হয়ে নেওয়া', 'টেনশন নিও না, 'ফান করা', 'লাভ করি' 'ওকে ডান'— এগুলো ইংরেজি নয়? না এগুলোও তোমাদের বাক-রীতি! এই করেই তোমরা বাংলাকে বাঁচিয়ে রাখছ?"

"কী মুশকিল দাদা, আমি কি বলেছি বাংলাদেশে সবাই বাংলায় কথা বলে? ও কথা থাক, আরেকটা কথাও আমি বলেছিলাম, আমাদের দেশের নায়িকারা খুব সুন্দর দেখতে। সেটা কি এখন মানেন? আপনি তো আগে কাউকে দেখার যোগ্য মনে করেননি!"

"বাজে কথা বলছ, কখনোই সেটা বলিনি। দেখিনি এটুকুই বলেছি।"

"এখন তো প্রমথদাদার কাছে শুনলাম, আপনি নাকি বাংলাদেশের নায়িকাদের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন!"

"প্রমথর কোনো কথা তুমি বিশ্বাস কর? তবে এটা ঠিক তোমাদের অনেক সুন্দরী নায়িকা আছে। সে কথা থাক, এই সাত সকালে আমার কাছে নিশ্চয় নায়িকা-সংবাদ নিতে আসনি?"

"তা আসিনি, নাস্তা হয়েছে আপনাদের?"

"দুয়েকটা ইংরেজি শব্দ আমার অনারে ব্যবহার কোরো, ব্রেকফাস্ট বললে বুঝতে সুবিধা হয়।"

"ঠিক আছে দাদা, ব্রেকফাস্ট হয়েছে?"

"না দেখছ তো, স্টোভটাই জ্বালাতে পারছি না। প্রমথটা সকালবেলা অদৃশ্য হয়েছে!"

"তাহলে নীচে চলুন। আমাদের ওখানে খাবেন। একেনবাবু কোথায়, ওঁকেও দরকার।"

একেনবাবু বোধহয় স্টোভ জ্বালানোর ঝামেলা এড়াতে ঘাপটি মেরে শোবার ঘরে বসেছিলেন! নাম শোনামাত্র বেড়িয়ে এসে বললেন, "কেমন আছেন স্যার?"

"ভালো আছি। আপনাদের ডাকতে এলাম, নীচে আসুন একসঙ্গে চা কফি খাওয়া যাবে।"

একেনবাবুকে সতর্ক করলাম আমি, "এটা কিন্তু নিঃশর্ত খাবার অফার নয়, আপনাকে ওর দরকার বলেছে। খাবার পর কিছু অনুরোধ করলে ফেলতে পারবেন না।"

"কী যে বলেন স্যার, আপনিও দেখছি প্রমথবাবুর মতো কথা বলছেন। এই স্যারের সঙ্গে কি আমার সেরকম সম্পর্ক!"

।। ৩।।

তারেকের অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে দেখি ওর বন্ধু মামুদ কিচেনে ব্রেকফাস্ট বানাতে ব্যস্ত। একজন শুভ্রকেশ অচেনা বয়স্ক ভদ্রলোক ড্রয়িং রুমে সোফায় বসে ফোনে কথা বলছেন। বেশভূষা আর চেহারায় বেশ আভিজাত্যের ছাপ। ভদ্রলোককে ডিস্টার্ব না করে সোজা কিচেনে গিয়ে হাজির হলাম। ওদের অ্যাপার্টমেন্টটা খানিকটা আমাদের মতো, তবে টু-বেডরুমের। সদর দরজা দিয়ে ঢুকলেই ডানদিকে কোট-ক্লজেট আর হাফ-বাথ। উলটোদিকে ড্রইং-রুম প্লাস ডাইনিং এরিয়া। ঢোকার হলওয়েটা শেষ হয়েছে কিচেনের সামনে। ডাইনিং এরিয়াতে কিচেনে থেকে যাওয়া যায়। জায়গাটা পুরো খোলা, কোনো দরজা নেই। হলওয়ে দিয়ে কিচেনে পৌছবার আগে ডান দিক দিয়ে আড়াআড়ি একটা প্যাসেজ। প্যাসেজে ঢুকলে প্রথমে পড়বে বেডরুমের দরজাগুলো আর শেষ প্রান্তে বড়ো বাথরুমটা।

মামুদ তারেকের সঙ্গে অ্যাপার্টমেন্ট শেয়ার করে। আমাদের যেরকম প্রমথ, তারেকের সেরকম মামুদ — রান্নায় ওস্তাদ। তবে একটু মুখচোরা, কথাবার্তা বিশেষ বলে না।

পেঁয়াজ, লঙ্কা টম্যাটো দিয়ে বেশ কয়েকটা ফোলা ফোলা অমলেট একটা বড় ট্রে-তে রাখা। রুটি টোস্ট হচ্ছে। আপাতত মামুদ ব্যস্ত খুব সরু করে কাটা আলু আর পেঁয়াজ ভাজতে। এই বস্তুটি আবার একেনবাবুর অত্যন্ত প্রিয়। সুতরাং ঘুষটা একেবারে মুখে মুখে ধরিয়ে দেবার বন্দোবস্ত হচ্ছে!

আমি মামুদকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ব্যাপার কি মামুদ, হঠাৎ এভাবে খাবার নেমন্তন্ন!"

মামুদ একটু লজ্জা পেল। বলল, "খালু এসেছেন... তাই ভাবলাম...।"

তারেক বিশদ করল, "মামুদের খালু ফরেন সার্ভিসে আছেন। ইউ এন-এ মাঝে মাঝে ডেলিগেট হয়ে আসেন। এবার হোটেলে না থেকে দিন দুই আমাদের সঙ্গে থাকবেন।"

উত্তরটা পেলাম, কিন্তু মাথায় তখন অন্য প্রশ্ন, খালু মেসোমশাই না পিসেমশাই? জিজ্ঞেস করতে গেলে খোঁটা খাব, বাংলাদেশের মুসলিম সমাজ সম্পর্কে খবর রাখি না বলে! এর মধ্যে মামুদের খালু ফোন শেষ করে কিচেনে এসে গেছেন। আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন, "আদাব, আমি আব্দুল রহমান।"

আমি ওঁকে নমস্কার জানিয়ে বললাম, "আমি বাপি।"

তারেক আবার আমার নামের আগে ডক্টর জুড়ে দিয়ে বলল, "বাপিদা ইউনিভার্সিটিতে ফিজিক্স পড়ান। আর ইনি হচ্ছেন একেনবাবু, আপনাকে তো এঁর কথা আগেই বলেছি। একজন বিখ্যাত গোয়েন্দা।"

"কী যে বলেন স্যার!" একেনবাবু অনুযোগ ভরা দৃষ্টি নিয়ে তারেকের দিকে তাকালেন। তারপর হাত জোড় করে ঘাড়টাকে একেবারে নুইয়ে রহমান সাহেবকে বললেন। "আদাব স্যার, আদাব। তারেক সাহেব বড্ড বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলছেন। বিখ্যাত-টিখ্যাত কিছু নই স্যার, তবে পেটের দায়ে একটু-আধটু গোয়েন্দাগিরি করি, এইটুকুই।"

একেনবাবুর ভাবভঙ্গি দেখে রহমান সাহেবের চোখে কৌতুক। এগিয়ে এসে একেনবাবুর হাতটা দু'হাতে ধরে বললেন, "তা তো বুঝলাম, কিন্তু আপনাকে যে আমার একটু দরকার। কাল আপনার কথা শোনামাত্র আমি ওদের বলেছি আপনার সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিতে।"

রহমান সাহেবকে মামুদ বলল, "তোমরা টেবিলে গিয়ে বসো, ব্রেকফাস্ট প্রায় রেডি। আমি আর তারেক এক্ষুণি নিয়ে আসছি।"

যেহেতু দরকারটা আমাকে নয়, আমি কিচেনেই দাঁড়িয়ে থাকার প্ল্যান করছিলাম। কিন্তু একেনবাবু আমার হাত ধরে টান দিলেন, "চলুন স্যার।" তারপর রহমান সাহেবকে বললেন, "বাপিবাবু আর প্রমথবাবু, আমরা সবাই এক টিম।"

রহমান সাহেব সপ্রশ্নে তাকালেন, "প্রমথবাবু!"

"প্রমথ কেমিস্ট্রিতে পোস্ট ডক করছে।" আমি উত্তর দিলাম। "এই মুহূর্তে ও কলেজে।"

"আই সি।"

কিচেন থেকে বেরোনোর মুখে একেনবাবুকে আপাদমস্তক আরেকবার দেখে রহমান সাহেব বললেন, "আপনি যে এতবড়ো ডিটেকটিভ, সেটা কিন্তু দেখলে বোঝা যায় না।" বলেই বোধহয় একটু লজ্জা পেলেন।

রহমান সাহেবের কথাটাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। একেনবাবুর চেহারা, বেশভূষা বা কথাবার্তা কোনোটাই গোয়েন্দাসুলভ নয়। আমি একটু মজা করেই রহমান সাহেবকে বললাম, "এই সিম্‌পল্টন চেহারাটা হল ওঁর একটা মুখোশ।"

"না না সেটা নয়, আসলে আমি ভেবেছিলাম উনি..." কি ভেবেছিলেন সেটা আর বিশদ না করে মামুদকে চেঁচিয়ে বললেন, "আমার কফিতে কিন্তু চিনি দিস না।" তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আসলে আমার বর্ডারলাইন ডায়েবিটিস, একটু সতর্ক থাকি।"

বোঝা যায়, পাক্কা ডিপ্লোম্যাট, কথা ঘোরানোতে খুবই পটু।

ডাইনিং টেবিলে বসে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রহমান সাহেব শুরু করলেন। "ঠিক কোত্থেকে শুরু করব ভাবছি... মাস দুয়েক আগে একটা চিঠি আমাদের গ্রামের বাড়িতে আসে। চিঠিটা নিউ ইয়র্ক থেকে লেখা। লিখেছেন এড ফাউলার নামে একজন। আমরা জয়েন্ট ফ্যামিলি, গ্রামের বাড়িটা সরিকি বাড়ি। বাড়িটা টিকে আছে, কিন্তু কেউই ওখানে থাকে না। চিঠিটা ওখানে পড়েছিল বেশ কিছুদিন।"

"কার নামে চিঠিটা এসেছিল স্যার?"

"কারোর নামে নয়, বাড়ির ঠিকানায়।"

"ভারি ইন্টারেস্টিং স্যার, তারপর?"

"আমি চিঠিটার কথা জানতামও না। বড়োচাচার চোখে চিঠিটা প্রথমে পড়ে। চাচার অনেক বয়স হয়েছে। এমনিতেই নার্ভাস প্রকৃতির লোক, এখন মাথাও ঠিক মতো কাজ করে না। নিজে ভালো ইংরেজি জানেন না, চিঠিটা ইংরেজিতে দেখে বাড়ির আর কাউকে কিছু না জানিয়েই পোস্ট অফিসে গিয়ে পোস্টমাস্টারকে দিয়ে চিঠিটা পড়ান।

আমি নিজে চিঠিটা দেখিনি, বড়োচাচা এরমধ্যেই সেটা হারিয়ে ফেলেছেন! তবে পোস্টমাস্টারের কাছে যা শুনলাম, সাহেবটি জানতে চেয়েছিলেন আমাদের বাড়িতে মকবুল রহমান নামে কেউ থাকতেন কিনা। এ ব্যাপারে কোনো তথ্য থাকলে সঙ্গে সঙ্গে ওঁকে জানাতে। বিষয়টা আর্জেন্ট এবং অফ আটমোস্ট ইম্পর্টেন্স— এই কথাগুলোই নাকি চিঠিতে ছিল।

মকবুল রহমান আমাদের দেশে একটা কমন নাম, আমাদের আত্মীয়স্বজনের মধ্যেও বেশ কয়েকজন আছে। ইনফ্যাক্ট, আমার দাদার ছোটোচাচার নামও মকবুল রহমান ছিল।"

"দাদার ছোটো চাচা? আমি সম্পর্কটা ঠিক ধরতে পারলাম না।"

"মানে ঠাকুরদার ছোটো কাকা," তারেক বিশদ করে দিল।

"এক্স্যাক্টলি। তা আমার এই গ্রেট গ্র্যান্ড আঙ্কল মকবুল রহমান বাড়ির সঙ্গে ভীষণ ঝগড়াঝাটি করে ইউরোপে চলে গিয়েছিলেন।"

"বলেন কি, অতদিন আগে! কী নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল স্যার?"

"ডিটেলস কিচ্ছু জানি না। তবে সেকালে আর কি নিয়ে ঝগড়া হত, নিশ্চয় পড়াশুনো বা বিয়ে করা নিয়ে। মোটকথা, কাউকে না জানিয়ে জাহাজে চাকরি নিয়ে উনি অদৃশ্য হন। তারপর কোনো যোগাযোগ রাখেননি। শুনেছি সেখানেই তিনি মারা যান, সম্ভবত খুন হন। এগুলো সবই আবছা আবছা খবর, কারণ মুরুব্বিদের হুকুমে ওঁকে নিয়ে বাড়ির কোনো আলোচনাই হত না। যাইহোক, একজন সাহেব মকবুল রহমানের খোঁজ করছেন জেনে, বড়োচাচা উত্তেজিত হয়ে পোস্টমাস্টারকে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে একটা উত্তর লিখিয়ে সাহেবকে পাঠান।"

রহমান সাহেবের গল্পে ছেদ পড়ল। মামুদ আর তারেক ব্রেকফাস্ট নিয়ে এসেছে।

"আসুন আগে খেয়ে নেওয়া যাক," বলে রহমান সাহেব কফির কাপ আমাদের দিকে এগিয়ে দিলেন। তারেক আর মামুদও আমাদের সঙ্গে বসল।

মামুদের বানানো অমলেট মুখে দিলেই গলে যায়। কাঁচা লঙ্কার কুচোগুলো একটু কড়া করে ভেজে অমলেটে দেওয়ায় তাতে চমৎকার একটা কিক্ যোগ হয়েছে। আলু-পেঁয়াজ ভাজাও আজ ফাটাফাটি! আরেকটা প্লেটে সসেজ আর বেকন রয়েছে দেখলাম। হিন্দুদের যেরকম বিফ মুসলমানদের সেরকম পর্ক। ভেবেছিলাম রহমান সাহেবের অনারে ওগুলো হয়তো আজ থাকবে না।

মুখে কিছু বলিনি, ওদিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে রহমান সাহেব একটু হেসে বললেন, "তুমি বোধহয় সসেজ আর বেকন দেখে অবাক হচ্ছ। তাহলে শোনো, আমাদের চোদ্দপুরুষও এসব মানেনি। একঘরে কথাটা শুনেছ তো, আমরা একগ্রামে হয়েছিলাম বহুবছর। আমাদের গ্রামে কেউ বিয়েও দিত না।"

একেনবাবু তাঁর প্রিয় আলু-পেঁয়াজ ভাজা প্রায় ধ্যানমগ্ন হয়ে কিছুক্ষণ খাবার পর বললেন, "ভেরি ইন্টারেস্টিং।"সেটা ঠিক কোন প্রসঙ্গে বুঝলাম না, বোধ হয় সেই চিঠির প্রসঙ্গেই। কারণ রহমান সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তারপর বলুন, স্যার, কী জানি বলছিলেন।"

"ও হ্যাঁ," রহমান সাহেব শুরু করলেন, "এর মধ্যে আমার নিউ ইয়র্কে আসার প্ল্যান

ঠিক হয়ে গেছে। ফাউলার সাহেবের চিঠিটা বড়োচাচা হারিয়ে ফেলেছিলেন ঠিকই, কিন্তু খামটা ছিল। ঢাকা ছাড়ার ঠিক আগের দিন বড়োচাচা আমার বাড়িতে সেই খামটা দিয়ে বললেন, ফাউলার সাহেবের কাছ খোঁজ নিতে সেই আর্জেন্ট ব্যাপারটা মিটে গেছে কিনা! 'হ্যাঁ, হ্যাঁ' বলে তো বড়োচাচাকে কাটালাম। মুশকিল হল বড়োচাচার মাথায় কিছু চাপলে সেটা যায় না। এখানে এসে পৌঁছনোর দু'দিন বাদেই চাচার ফোন। এই অবস্থায় লোকটার খোঁজ না করে আমার উপায় নেই। সেইজন্যেই আপনাদের খোঁজ করছিলাম।"

আমি রহমান সাহেবের কথাটা বুঝলাম না। নিউ ইয়র্কের ঠিকানা জানা আছে, ধরে নিচ্ছি বাংলাদেশ কনসুলেটে লোকেরও অভাব নেই। এটা এমন কী একটা কঠিন কাজ যার জন্যে একেনবাবুকে লাগবে! ভাগ্যিস প্রমথ সঙ্গে নেই। থাকলে বলত, 'আপনি একেনবাবুর বদলে একটা পোস্টম্যানের সাহায্য নিন।'

আমার চোখ একটু বিস্ময় লক্ষ্য করে রহমান সাহেব বললেন, "এড ফাউলারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে আমাদের ইউ.এন অফিসের একটি ছেলেকে পাঠিয়েছিলাম। ঘন্টা চারেক বাদে ছেলেটা ফিরল। ঠিকানা খুঁজে পেতে নাকি অনেক সমস্যা হয়েছিল। শেষপর্যন্ত পেয়েছিল, কিন্তু ফ্রুটলেস ট্রিপ। ঐ ঠিকানায় এড ফাউলার নামে কোনো লোকই থাকে না।"

এইবার সমস্যাটা বুঝলাম।

একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ইন্টারেস্টিং, ঠিকানাতে কোনো ভুলচুক হয়নি তো স্যার?"

"না, এই তো ফাউলারের পাঠানো খামটা আমি নিয়ে এসেছি,"বলে পকেট থেকে একটা খাম বার করলেন।

খামটা নানান হাত ঘুরে মলিন হয়ে গেছে। ঠিকানায় লেখা Rahman Residence, Gaibasa, Bangladesh, আর খামের ওপরে বাঁদিকে লেখা Ed Fowler, তার নীচে 38-47 103rd St, Corona, NY 11368।

আমি ঠিকানাটা দেখে বললাম, "করোনা। জায়গাটা তো কুইন্সে।"

"হ্যাঁ, সেটাই ছেলেটার কাছে শুনলাম। বলল, কুইন্সে নাকি ঠিকানা খুঁজে পাওয়া কঠিন।"

"ঠিক কথাই বলেছে," মামুদ সমর্থন করল। "ম্যানহাটনে নম্বর দিয়ে স্ট্রিট আর অ্যাভেনিউ। কিন্তু কুইন্সে নম্বর দিয়ে স্ট্রিট, রোড, ড্রাইভ, লেন... সবকিছুই হতে পারে।"

মামুদের এই কথার অর্থ আমি বুঝলাম না।

একেনবাবুও বললেন, "কিন্তু স্যার, এখানে লেখা তো আছে স্ট্রিট।"

"তা আছে। কিন্তু ৩৮-৪৭-এর অর্থ কি? ১০৩ স্ট্রিট তো লম্বা রাস্তা।"

"আচ্ছা, এটা কি হতে পারে স্যার, আপনার অফিসের লোকটি ঠিক ঠিকানায় পৌঁছননি?"একেনবাবু রহমান সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন।

"অসম্ভব নয়, এমনিতে অবশ্য ও খুব এফিশিয়েন্ট।"

"আপনি কি চান স্যার আমরা এই ফাউলার সাহেবের খোঁজ করি?"

"সত্যি কথা বলতে কি, যখন আমি মামুদের কাছে শুনলাম আপনার কথা, তখন ভাবলাম যদি ফাউলারকে খুঁজে বার করতে পারেন মন্দ হয় না। কিন্তু এখন আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মনে হচ্ছে, এটা সত্যিই তো এমন কোনো দরকারি ব্যাপার নয়... না জানলেও ক্ষতি নেই।"

"কোনো কিছুই তো জীবনে দরকারি নয় স্যার!"একেনবাবু একেবারে দার্শনিকের বাণী

ছাড়লেন। "তবে আপনি চান তো একবার খোঁজ করে দেখতে পারি।"

"দেখবেন! আসলে আপনার সময়ের দাম দেবার ক্ষমতা...। বুঝতেই তো পারছেন বাংলাদেশের সরকারী কর্মচারী...।"

"কী যে বলেন স্যার, আপনি হলেন মামুদ সাহেবের খালু, এটুকু আপনার জন্যে আমরা করব না! এখানে সময়ের দাম দেবার প্রশ্ন উঠছে কেন?"

ভাগ্যিস প্রমথ এখানে নেই। থাকলে একেনবাবুকে ঝাড়ত। বলত, 'আপনি নিজে ভালেমানুষি দেখান ফাইন, কিন্তু উঠবেন তো বাপির গাড়িতে... ওর তেলের খরচ আছে না? আর আমাদের সময়ের দাম নেই!' তবে একেনবাবু সেটা গায়ে মাখতেন না। আমার দিকে শুধু তাকিয়ে বলতেন, 'প্রমথবাবু না, সত্যি!' আর প্রমথ তখন গজগজ করত 'আমি এর মধ্যে নেই।' কিন্তু শেষমেষ ঠিকই আসত।

## ।। ৪।।

পরের দিন ইউনিভার্সিটিতে কোনো কাজই ছিল না। একেনবাবুও ফ্রি। আমাকে বললেন, "চলুন স্যার, মুরুব্বিজনের সেবাটা করে ফেলি।"

"তারমানে?"

"মানে মামুদ সাহেবের খালুর কাজটা করে ফেলা যাক।"

"আপনি আবার গুরুজনদের মুরুব্বি বলতে শুরু করলেন কবে থেকে?"

"তারেক সাহেব তো সবসময় তাই বলেন।"

"তারেক তো অনেক কিছুই বলে! সে কথা থাক, কিন্তু এই সক্কালবেলায় কুইন্সে ছুটবেন! তার ওপর ঠিকানাটাই তো মনে হচ্ছে ভুল।"

"ভুল হলে তো চুকেই গেল স্যার, একটু হাওয়া খেয়ে আসা যাবে।" তারপর প্রমথকে বললেন, "আপনিও চলুন না স্যার, তিনজনে বেশ গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।"

প্রমথ ব্রেকফাস্ট করে দ্বিতীয় কফিটা শেষ করছে। মামুদের খালুর গল্পটা কালকেই ওকে করেছিলাম। কিন্তু ও কোনো উৎসাহই দেখাল না। বলল, "ছ'দিন বাদে ক্রুজে যাব, কী ঝুট-ঝামেলার মধ্যে ঢুকছেন! একজনকে চেনেন না, কী টাইপের লোক জানেন না, হঠাৎ গিয়ে হাজির হবেন? হয়তো ড্রাগ ডিলার, দরজায় অচেনা বাদামি চামড়া দেখলে গুলি চালিয়ে দেবে!"

প্রমথটা আমার চেয়ে অনেক প্র্যাকটিক্যাল। আমি এতসব ভাবিনি।

একেনবাবু বললেন, "না, না, স্যার, রিস্ক নেব কেন, একটু খোঁজখবর করা আর কি। সেই ফাঁকে কুইন্সও একটু ঘোরা হয়ে যাবে... আর যেতে যেতে একটু গল্পও করা যাবে।

"গল্প তো এখানেই হতে পারে, আর হাওয়া খেতে চান তো সেন্ট্রাল পার্কে চলুন, আমি রাজি। কুইন্সে নয়।" বলে প্রমথ কফির কাপ ধুতে গেল।

প্রমথর মতো আমিও দুয়েকবার কাটাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু প্রমথর ক্যারেক্টারের ডিজিটালিটি আমার মধ্যে নেই। প্রমথ হয় 'হ্যাঁ' অথবা 'না', নো কম্প্রোমাইজ। আমি অত জোর দিয়ে কিছু বলতে পারি না। একেনবাবুর ঘ্যানঘ্যানানি সহ্য করতে না পেরে শেষে

বেরোলাম।

রহমান সাহেবের অফিসের লোকটি খুব একটা ভুল বলেনি। ঠিকানাটা খুঁজে পেতে আমাকেও কয়েকবার চক্কর খেতে হল। খুঁজতে খুঁজতে শেষে একটা ইলেকট্রনিক স্টোরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। দোকানের মালিক ছাড়া এই ঠিকানায় কাউকে পাওয়া সম্ভব নয়। তাও একেনবাবুকে গাড়িতে বসিয়ে আমি নামলাম। পার্কিং নেই, গাড়িতে কেউ না থাকলে টিকিট দেবে।

ছোট্ট দোকান, মালপত্রে ঠাসা! সেলস কাউন্টারে একজনই। লোকটাকে দেখে মনে হল হিস্পানিক। এড ফাউলারের নাম শুনে বেশ বিরক্ত হল। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে বলল, "কালকেও একজন এসেছিল তোমাদের দেশ থেকে, একই প্রশ্ন করেছিল। উত্তরটা কি এক দিনের মধ্যে পালটে যাবে?"

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, "আমি খুব লজ্জিত, খবরটা জানতাম না।"

মোস্ট আনফ্রেন্ডলি লোকটা। বলল, "এখন তো জানলে, গুড বাই।"

"ওকে।" বলে আমি বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠলাম।

"রং অ্যাড্রেস! খামোকা আসা হল।"

"আই অ্যাম কনফিউজড স্যার, একটা ভুল ঠিকানা ভদ্রলোক কেন দিলেন?"

আমি গাড়িটা স্টার্ট দিতে দিতে বললাম, "গুড কোয়েশ্চেন, কিন্তু উত্তরটা কে দেবে!"

"এই ঠিকানায় অন্য কোনো অ্যাপার্টমেন্ট নেই, বাড়িটা তো তিনতলা।"

একেনবাবুর কথায় খেয়াল হল। নামার সময় অত খেয়াল করিনি। স্টার্ট বন্ধ করে আবার ঢুকলাম দোকানে। "আচ্ছা, ওপরের তলা দুটোর ঠিকানা কি এক?"

লোকটা দেখলাম এবার বেশ চটেছে। "তুমি কি এদেশে নতুন এসেছ? জানো না, এক ঠিকানা দুটো জায়গার হতে পারে না!"

আমি চুপ আছি দেখে বোধহয় একটু করুণা হল। বলল, "উপরের ঠিকানা ৩৮ আর ৩৯। আর কিছু জানতে চাও?"

"না, না থ্যাঙ্ক ইউ, সরি।"

ফিরে এসে একেনবাবুকে বললাম, আপনার প্রশ্নের উত্তর হল। ৩৮ আর ৩৯।"

"হ্যাঁ, সেটাই বুঝতে পারলাম।"

"তার মানে!"

"ওই যে দেখুন, সামনের দোতলা বাড়িতে লেখা ৪৮; আর তার পাশে একটা তিনতলা বাড়ি, সেখানে অবশ্য ঠিকানা কোনো লেখা নেই। কিন্তু ওগুলোর নম্বর নিশ্চয় ৫০, ৫১ আর ৫২। কারণ পাশের লন্ড্রোম্যাটে নম্বর হচ্ছে ৫৩।"

আমি একটু বিরক্ত হয়েই বললাম, "এই ক্যালকুলেশনটা একটু আগে করলেই পারতেন, আমাকে দোকানের লোকটার ধ্যাঁতানি খেতে হত না। আর খুঁজছেন তো ৪৭!"

"তা ঠিক, কিন্তু আরেকটা জিনিসও বার করেছি স্যার।"

"কী?"

"আমার মনে হয় এড ফাউলার লিখতে চেয়েছিলেন ৪৯। দেখুন, ৭-এর সামনেটা একটা শুঁড়ের মতো, ওটাকে ইংরেজি ৯-ও মনে করা যায়।"

"সব কিছুই মনে করা যায়, কিন্তু আমি আর গাড়ি থেকে নামছি না। আপনি চান তো নেমে সন্দেহ নিরসন করুন।"

"নিশ্চয় স্যার, আপনি বসুন।"

একেনবাবু এলেন মিনিট কয়েকের মধ্যে। মুখ দেখেই বুঝলাম একটা কিছু ঘটেছে। কাউকে ফোন করতে করতে আসছিলেন। গাড়িতে উঠতেই স্টার্ট দিলাম।

"না, স্যার এখন যাওয়া যাবে না, একটু দাঁড়াতে হবে।"

"তার মানে?"

"আমার ধারণা এড ফাউলার খুন হয়েছেন। ধরে নিচ্ছি স্যার, ঘরে উনিই ছিলেন।"

"হোয়াট! কী বলছেন যা-তা!"

"ঠিকই বলছি স্যার। উপরে যাবার সিঁড়ির নীচে দেখলাম দুটো মেলবক্স। ৪৯ নম্বরের মেলবক্স-এ এড ফাউলার লেখা। ৪৮ নম্বরের মেলবক্সে কোনো নাম নেই। দোতলায় উঠে দেখি দরজাটা অল্প একটু খোলা। তার ফাঁক দিয়েই দেখলাম একটা লোক চিৎ হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে। পুরো বুকটা রক্তে ভেজা। ভেতরে ঢুকলাম না, সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টকে ফোন করলাম।"

"ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট তো ম্যানহাটনের — এটা তো ওঁর জুরিসডিকশন নয়! 911 ডায়াল করলেই পারতেন!"

"জানি স্যার, কিন্তু এখানকার পুলিশকে ফোন করলে আমাদের নিয়ে ঝামেলা করত। ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টই কুইন্সের পুলিশকে খবর দিচ্ছেন। আমাদের পরিচয়ও দিয়ে দেবেন। তাই পুলিশ না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করি।"

"আচ্ছা বিপদ হল তো!"

কয়েক মিনিটের মধ্যে দু'টো পুলিশের পেট্রল গাড়ি লালাবাতি ঘোরাতে ঘোরাতে এসে হাজির হল। গাড়িতে দুজন করে অফিসার। একজন পুলিশ গাড়ি থেকে নেমে আমাদের গাড়ির সামনে এসে জিজ্ঞেস করল, "হু ইজ মিস্টার সেন?"

অন্য গাড়ি থেকে নেমে দু'জন গটগট করে দরজা খুলে উপরে গেল।

"দ্যাট্‌স মি স্যার, দ্যাট্‌স মি!" তড়িঘড়ি করে একেনবাবু গাড়ি থেকে নেমে হাতটা এগিয়ে দিলেন।

অফিসার হ্যান্ডশেক করল না। বরং সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞেস করল, "আপনি একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর?"

"নট এ গুড ওয়ান স্যার, বাট ইয়েস।"

একেনবাবুর সাজপোষাক, ভাবভঙ্গি আর কথা বলার ধরণ দেখে অফিসারের ভুরুটা কোঁচকাল। "ডোন্ট অ্যাক্ট স্মার্ট, যা জিজ্ঞেস করছি তার উত্তর দিন। আপনি এই মৃত্যুর কথাটা রিপোর্ট করেছিলেন?"

"ইয়েস স্যার।"

"এখানে না করে ম্যানহাটনে কেন?"

"আমি ওখানে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টকে চিনি, আমি জানি উনি খবরটা ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবেন।"

"নেক্সট টাইম কল ৯১১। দিস ইস আওয়ার এরিয়া।"

"হ্যাঁ, স্যার।"

"আপনি এখানে কেন এসেছিলেন?"

"বাংলাদেশের একজন ডিপ্লোম্যাট আমাকে পাঠিয়েছিলেন স্যার, এড ফাউলারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে।"

"এড ফাউলার কে?"

"আমার ধারণা যিনি মারা গেছেন স্যার।"

"তিনি যে মারা গেছেন কি করে জানলেন?"

"দেখে তো তাই মনে হল স্যার।"

"দেখে মনে হল! আপনি অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকেছিলেন?"

"দরজাটা খোলা ছিল স্যার, ভেতরে ঢুকিনি। দরজার বাইরের থেকেই দেখেছি।"

"যিনি এড ফাউলারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পাঠিয়েছিলেন, তাঁর নাম কি?"

"পুরো নামটা তো জানি না স্যার," তারপর আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "রহমান সাহেবের পুরো নাম কি স্যার?"

আমি মাথা নাড়লাম, "ঠিক জানি না।"

"কেন যোগাযোগ করতে চেয়েছিলেন?"

"এড ফাউলার বলে একজন ওঁকে একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন, সেই ব্যাপারে।"

"চিঠি! কি ধরণের চিঠি?"

"ওঁর এক আত্মীয়ের খবর চেয়ে..."

"হোয়াট! ইউ আর মেকিং নো সেন্স!"

এভাবে প্রশ্ন আর উত্তর চললে পরিস্থিতিটা আরও গোলমেলে হয়ে যাবে। আমি তাই সংক্ষেপে ব্যাপারটা অফিসারকে বললাম।

অফিসার সেটা শোনার পর আমাকে প্রশ্ন করল। "আপনি কে?"

"আমি নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে পড়াই।"

"কী পড়ান?"

"ফিজিক্স?"

"আপনি এখানে এলেন কেন?"

"আমি মিস্টার সেনকে রাইড দিচ্ছি।"

"উনি আমাকে নানা ভাবে সাহায্যও করেন," এটা বলার কোনো দরকার ছিল না একেনবাবুর। শুধু শুধু কথা বাড়ালেন।

"কী রকম সাহায্য?"

"নট রিয়েলি। আমরা অ্যাপার্টমেন্ট শেয়ার করি। আমরা বন্ধু। ওঁর গাড়ি নেই, তাই ওঁকে অনেক সময় রাইড দিই।"

অফিসার একটু চুপ করে ঘড়িটা দেখলেন। তারপর একটু সরে গিয়ে সেলফোনে কার সাথে কথা বলতে শুরু করলেন।

আমি একেনবাবুকে বললাম, "আর মেলা আত্মীয়তা করবেন না, চলুন ওঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি যাওয়া যাক।"

অফিসার ফিরে এসে বললেন, "কখন এসেছিলেন আপনারা?"

"মিনিট দশেক আগে।"

"আপনাদের কোনো কার্ড আছে, যদি যোগাযোগ করতে হয়।"

আমি পকেট থেকে আমার একটা ভিসিটিং কার্ড দিলাম। আমাদের একই ফোন নম্বর। পেছনে একেনবাবুর নামটা লিখে দিলাম।

"ইউ মে গো নাউ।"

আর দেরি না করে গাড়ি চালালাম।

"হঠাৎ, এভাবে ছেড়ে দিল! আমি ভেবেছিলাম আরও জেরা করবে।" আমি বললাম।

"আমার মনে হয় স্যার, বুঝতে পেরেছে আমরা জড়িত নই। মৃত্যুটা আমাদের আসার অনেক আগেই হয়েছে। মুখে যাই বলুক, ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট নিশ্চয় এদের বসকে ভালো

করেই জানিয়েছেন আমরা কারা। তবে আমার মনে হয় স্যার রহমান সাহেবকে এরা জেরা করবে।”

আমরা বাড়ি ফিরে এড ফাউলারের খুনের খবরটা রহমান সাহেবকে জানালাম।

তিনি তো শুনে অবাক। বললাম, “পুলিশ হয়তো আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।”

“আমার সঙ্গে!”

“আমাদের কাছে শুনেছে, আপনি খোঁজ করছিলেন বলেই আমরা গিয়েছিলাম।” কথাটা শুনে রহমান সাহেব উৎফুল্ল হলেন না। বললেন, “লোকটা মরার আর সময় পেল না। শুধু শুধু একটা ঝুট-ঝামেলা!”

খুব একটা ঝুট-ঝামেলা অবশ্য নয়। পরে শুনলাম পুলিশ ইউএন-এর বাংলাদেশ মিশনে শুধু একটা ফোন করেছিল। রহমান সাহেবের ডিপ্লোম্যাটিক ইম্যুনিটি আছে। এসব ব্যাপারে ওঁকে ঘাঁটাবার কোনো এক্তিয়ারই পুলিশের নেই।

রহমান সাহেব পরের দিন সকালেই চলে গেলেন। পার্ফেক্ট জেন্টলম্যান। যাবার আগে আমাদের ‘বাই’ বলে গেলেন—যার কোনো দরকার ছিল না। বার বার ধন্যবাদ দিলেন। বললেন, ঢাকায় কোনো দিন এলে, আমরা ওঁর সঙ্গে যেন অবশ্যই যোগাযোগ করি। নিজের একটা কার্ডও দিলেন। আমার একটু লজ্জাই লাগছিল। যে কাজটা আমরা করার চেষ্টা করছিলাম, সেটা যে কেউই করতে পারত। তাছাড়া এড ফাউলার ডেড, সুতরাং ওঁর বড়োচাচার প্রশ্নের উত্তরটাও পেলেন না।

## ।। ৫ ।।

ক্রুজে যাবার দিন এগিয়ে আসছে। তার আগে বেশ কিছু কাজ সারতে হবে। ঘুম থেকে উঠে ভাবছিলাম আজ দুপুরে বেরিয়ে একটা মোটা সোয়েটার আর মাফলারের খোঁজ করব। ও দুটো থাকলে আলাস্কায় একটা একস্ট্রা প্রোটেকশন থাকবে। কিন্তু কোথায় মিলবে সেটাই প্রশ্ন। এই সময়ে দোকান থেকে ওগুলো সব হাওয়া হয়ে যায়, আবার উদয় হয় শীত যখন আসব আসব করছে। মেসি-র বেসমেন্টে যদি পাওয়া যায়! আর কী কী সম্ভাব্য দোকান আছে ভাবছি। এড ফাউলারের ব্যাপারটাও মাথা থেকে যায়নি। তবে ফাউলার মারা যাওয়ায় একদিক থেকে আমরা বেঁচেছি। ওই রহস্যে একবার ঢুকলে সেই জল গড়াতে গড়াতে কোথায় গিয়ে দাঁড়াত তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে আমি এক পট কফি চাপিয়ে নিউ ইয়র্ক টাইমস নিয়ে বসলাম। ভেবেছিলাম ফাউলারের মৃত্যুর খবরটা নিউ ইয়র্ক টাইমসে নিশ্চয় পাওয়া যাবে। খুন সম্পর্কে কিছু না কিছু ইনফর্মেশন সেখানে অন্তত থাকবে। না, কোনো খবরই নেই।

একেনবাবু পাশেই বসেছিলেন। বললাম, “দেখলেন, কালকে একটা মার্ডার দেখে এলেন, কিন্তু তার কোনো উল্লেখ নেই আজকের পেপারে।”

“মার্ডার তো দেখিনি স্যার, মার্ডার ভিক্টিমকে দেখেছি।”

“ওই হল। কিন্তু কোথাও তো কিছু দেখছি না পেপারে। হয়তো লোকটা মরেনি।”

“না স্যার, অনলাইনে আছে খবরটা।”

"সেকি! নিউ ইয়র্ক টাইমসের অনলাইনে? কাগজে তো নেই।"

"নিউ ইয়র্ক টাইমস নয় স্যার, কুইনস ট্রিবিউনের অনলাইনে।"

যে কথাটা আগে কোথাও লিখিনি, একেনবাবু এখন নেট স্পেশালিস্ট হয়ে গেছেন। প্রথম যখন ম্যানহাটানে এসেছিলেন, তখন কম্পিউটারের কী-বোর্ডে হাত দিতেও ভয় পেতেন। প্রমথই অসামান্য ধৈর্য সহকারে একেনবাবুকে কম্পিউটার ব্যবহার আর নেট সার্ফ করা শিখিয়েছে। এমন কি ওঁকে দিয়ে একটা ল্যাপটপও কিনিয়েছে! শেষেরটাই সবচেয়ে বড়ো অ্যাচিভমেন্ট। একেনবাবু বারবার আপত্তি জানিয়েছিলেন, "কী দরকার স্যার, আপনাদের দুটো তো আছেই!"

"সেইজন্যেই তো কেনাচ্ছি, আমাদের কম্পিউটারে যাতে ভাইরাস না ঢোকান।"

"কী যে বলেন স্যার, আপনার এত ট্রেনিং-এর পরে কি আর সেই ভুল করব!"

যাক সে কথা। আমি একেনবাবুকে বললাম, "কুইনস ট্রিবিউন বলে যে একটা পত্রিকা আছে, সেটাই তো জানতাম না।"

"আমিও জানতাম না স্যার। উইকলি পেপার, তবে অনলাইনটা মনে হয় আপডেটেড হয়। নেট সার্ফ করতে করতে পেয়ে গেলাম।"

"কী লিখেছে সেখানে?"

"খুবই ছোট্ট করে স্যার। বৃহস্পতিবার দুপুর এগারোটা নাগাদ করোনা-র এক অ্যাপার্টমেন্টে একজন লোক খুন হয়েছে। লোকটির বয়স চল্লিশের কোঠায়। খুনি পলাতক।"

"ভিকটিমের নাম দেয়নি?"

"না স্যার।"

"তার মানে লোকটা তো এড ফাউলার নাও হতে পারে।"

"আমিও সেটা ভাবছিলাম স্যার।"

"থাক গে, আর ভাবাভাবি না করে একটা সাহায্য করুন। নেট-এ দেখুন তো সোয়েটার আর মাফলার কাছাকাছি কোন দোকানে পাওয়া যাচ্ছে?"

একেমবাবু পরম উৎসাহে কাজে লাগলেন।

## ।। ৬।।

পাঠকদের কেউ কেউ হয়তো ক্রুজে গেছেন। এসব জাহাজে কী থাকে আর না থাকে বিলক্ষণ জানেন। আমাদের কাছে পুরো ব্যাপারটাই একটা নতুন অভিজ্ঞতা। বইপত্রে পড়েছি, সিনেমাতেও ক্রুজ শিপের কিছু কিছু দৃশ্য দেখেছি। কিন্তু চাক্ষুস দেখা অন্য জিনিস! আমি তো একেবারে থ। অথচ আইল্যান্ড প্রিন্সেস জাহাজ হিসেবে খুব একটা বড়ো নয়। কিন্তু খেলাধূলোর জায়গা, সুইমিং পুল, সিনেমা হল, শপিং মল, এন্টারটেনমেন্ট সেন্টার, এক্সসারসাইজরুম, লাউঞ্জ, বার, বিউটি পার্লার, ওয়েডইং চ্যাপেল, কী নেই! ক্যাফেটেরিয়াতে অঢেল ফ্রি খাবার। এছাড়া রয়েছে আরও গোটা পাঁচেক রেস্টুরেন্ট। বলতে গেলে একটা ছোটোখাটো শহর জলে ভেসে বেড়াচ্ছে!

বিকেল পাঁচটায় জাহাজ ছাড়ল। তার আগে লাইফ-বোট কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তার একটা মহড়া হল। জাহাজ ছাড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা সবাই আলাদা হয়ে গেলাম। প্রমথ সাঁতার কাটবে প্ল্যান করে এসেছিল। একেনবাবু ওঁর অগাধ অনুসন্ধিৎসা নিয়ে জাহাজ পর্যবেক্ষণে বেরোলেন। আমি উপরে অবসার্ভেশন ডেকে দাঁড়িয়ে চারদিকের জল, ধীরে ধীরে দূরে সরে যাওয়া ভ্যানকুভার শহরের উঁচু উঁচু বাড়িগুলো দেখতে লাগলাম। ডেকে যাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন বেশীরভাগই সাহেব। একজন ছাড়া কোনো ভারতীয়ই চোখে পড়ল না। ভারতীয় ভদ্রলোকটি একটু বয়স্ক, কিন্তু বেশ মিশুকে — ঘুরে ঘুরে অনেকের সঙ্গেই কথা বলছেন। খানিক বাদে আমার পাশে এসে আলাপ করলেন। হার্লেমে থাকেন, নাম টিম ব্যাসারাথ। বয়স দূর থেকে যা ভেবেছিলাম, তার থেকে একটু বেশিই। গল্প করতে ভালোবাসেন। প্রশ্নও তেমন করতে হল না। নিজের থেকেই অনেক কথা বললেন। বাপঠাকুরদার একটা মনিহারি দোকান ছিল। কিন্তু উনি ব্যবসায়ে না ঢুকে হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়েছিলেন। কয়েকটা হোটেলে চাকরি করার পর ঢুকেছিলেন এই প্রিন্সেস ক্রুজ লাইনে। ক'দিন আগেও এই জাহাজেই ক্রুজ ডিরেক্টর ছিলেন। অফিশিয়ালি রিটায়ার করেছেন এই ট্রিপ আরম্ভ হবার ঠিক আগে। ওঁর রিপ্লেসমেন্টেও এসে গেছে। প্রথম আলাপেই এতগুলো কথা বলে ফেলে বোধ হয় একটু লজ্জা পেলেন। বললেন, "কিছু মনে করলেন না তো এত কথা বলে ফেললাম!"

"এতটুকু নয়, খুব ভালো হল আপনার সাথে আলাপ হয়ে। আগে আমরা কোনোদিন ক্রুজে আসিনি। জাহাজের সাইজ দেখে তো আমরা হতভম্ব! কি আছে কি নেই বুঝতে বুঝতেই ট্রিপটা শেষ হয়ে যাবে।"

"কিছু প্রশ্ন থাকলে ক্রুজ ডিরেক্টরের অফিসে চলে যাবেন। যাত্রীদের দেখভাল করার কাজ ঐ অফিসারের।"

"তার আর দরকার কি, আপনার সঙ্গেই তো আলাপ হয়ে গেল।"

হেসে ফেললেন টিম। "আমার কাজ তো শেষ। ভালোকথা, মেইন ডাইনিং রুমটা কালকের জন্যে এখনই গিয়ে বুক করে নিন, দেরি করলে জায়গা পাবেন না। ওখানকার অ্যাম্বিয়েন্স চমৎকার আর ক্যাফেটেরিয়ার থেকে বেটার খাবার।"

আমার কতগুলো প্রশ্ন ছিল, কিন্তু সেগুলো আর করা হল না। জাহাজের একজন স্টাফ ব্যস্ত হয়ে টিমকে ডাকতে এল। 'এক্সকিউজ মি' বলে উনি চলে গেলেন।

এরমধ্যে জাহাজ সমুদ্রের অনেকটা ভেতরে চলে এসেছে। চরিদিকে শুধু জল ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। আমি অবসার্ভেশন ডেক থেকে মেইন ডেকে নেমে এলাম। আগে খেয়াল করিনি, ছোটো একটা লাইব্রেরিও জাহাজে আছে। সেখানে আর কেউ নেই, একা একেনবাবু সোফায় বসে ল্যাপটপে কিছু দেখছেন।

আমাকে দেখে বললেন, "অ্যামেজিং স্যার, ট্রুলি অ্যামেজিং।"

"কি অ্যামেজিং?"

"এই যে মাঝ-সমুদ্রে নেট কানেকশন। স্লো ঠিকই, কিন্তু আসছে।"

"আপনি এখানেও ইন্টারনেট দেখছেন, কত চার্জ জানেন?"

"সেকি স্যার, ফ্রি নয়!"

"জাহাজে ফ্রি হয় কি করে, নিশ্চয় স্যাটেলাইট কানেকশন!" আমি দেখেছিলাম রেটটা, কিন্তু একটু বাড়িয়েই বললাম। "প্রতি মিনিট ৫ ডলার।"

"কী সর্বনাশ স্যার! আমি তো প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে সার্ফ করছি!"

"তারমানে একশো ডলার। যাক গে, করেই যখন ফেলেছেন তখন তো আর কিছু

করার নেই! তা কী এত হাতিঘোড়া দেখছিলেন?”

একশো ডলারের অঙ্কটা শুনে একেনবাবু এতই বিমর্ষ হয়ে পড়লেন যে আমার খারাপ লাগল। বললাম, “আঃ, ছাড়ুন তো। আপনার জন্যই তো আমরা ফোকোটে এই ক্রুজে এসেছি, এটা না হয় আমরাই দেব।”

এতে বোধহয় একটু কাজ হল। ল্যাপটপের মুখটা বন্ধ করতে করতে বললেন, “না না স্যার, আপনারা কেন দেবেন! আসলে কি জানেন স্যার, চট করে কনক্লুশানে আসাটা খুব ভুল। নেটে দেখেছিলাম ক্রুজ শিপে নেট কানেকশন আছে। তার থেকে ধরে নিয়েছিলাম ওটা টিকিটের সঙ্গে ইনক্লুডেড।”

“তা তো বুঝলাম, কিন্তু এতক্ষণ ধরে এখানে করছিলেনটা কি? শুধু নেটে তো ছিলেন না বুঝতে পারছি।”

“এই একটু বই পড়ছিলাম স্যার। কিন্তু বইয়ের কালেকশন খুব লিমিটেড।”

“তা তো হবেই, ক্রুজে আর ক'জন বই পড়তে আসে!”

“ট্রু স্যার। কিন্তু জায়গাটা সুন্দর। লোকজন নেই, বাইরের দেয়ালটা দেখুন, পুরো কাচের। সেদিকে তাকালেই স্যার অন্তহীন সমুদ্র।”

“আপনি তো কবিদের মতো কথা বলছেন? কী পড়ছিলেন, কবিতার বই?”

“না স্যার, ভাস্করদের জীবনী।”

“ভাস্কর মানে? স্কাল্পটার?”

“হ্যাঁ, স্যার।”

“আপনার যে এ ব্যাপারে এত উৎসাহ ছিল। তা তো আগে জানতাম না?”

“ছিল না স্যার। তবে সেদিন ম্যাডাম ফ্র্যান্সিস্কা যে বললেন ফণীন্দ্রনাথ বসু-র কথা... হঠাৎ ওঁর নামটা চোখে পড়ল। তাই পড়ছিলাম।”

সেদিন মানে সপ্তাহ দুয়েক আগে। প্রমথর গার্লফ্রেন্ড ফ্র্যান্সিস্কা আমাদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল মেট্রোপলিটান মিউজিয়ামে। মেয়েটা আমাদের পছন্দ করে, তাই মাঝেমাঝে গার্জেনগিরি করে। কেমিস্ট্রির ছাত্রী হলেও স্কাল্পচার, আর্ট এইসব নিয়ে পড়ে থাকে। তার ধাক্কা মাঝে মাঝেই আমাদের পোয়াতে হয়। শুধু প্রমথ নয়, আমরাও যাতে করে শিল্পজগতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জিনিসগুলো উপভোগ করতে শিখি, তার জন্য ফ্র্যান্সিস্কা সদা-সচেষ্ট। রোদাঁর একটা স্পেশাল এক্সিবিট চলছিল মিউজিয়ামে — বড়ো বড়ো তিন ডজন স্কাল্পচার আর তার সঙ্গে ওঁর আঁকা ছবি। সেই যাত্রাতেই ফ্র্যান্সিস্কা কথায় কথায় ফণীন্দ্রনাথ বসু-র প্রসঙ্গ তুলেছিল। রোদাঁ নাকি ওঁর কাজ পছন্দ করতেন। ফ্র্যাঙ্কলি আমি ভুলেই গিয়েছিলাম পুরো ব্যাপারটা। আর্ট,স্কাল্পচার ইত্যাদিতে আমার কোনও ইন্টারেস্টই নেই। একেনবাবুর সঙ্গে আমার আর প্রমথর তফাৎ হচ্ছে ওঁর জ্ঞানপিপাসা প্রবল। একটা কিছু কানে গেলেই হল, তক্কে তক্কে থাকেন কী করে সে ব্যাপারে আরেকটু জানা যায়। ওঁর কিছু জানা মানে আমাদের জ্বালাতন, বকবক করে বেশ কিছুদিন কান ঝালাপালা করবেন।

“ভেরি ইন্টারেস্টিং লাইফ স্যার। দেশের লোকেরা ওঁকে তেমন চেনেন না, কারণ ওঁর শিল্পীজীবনটা বিদেশে কেটেছে। মারাও গেছেন মাত্র ৩৮ বছর বয়সে স্কটল্যান্ডের এক শহরে জলে ডুবে।”

আমি হ্যাঁ হুঁ কিছু না বলে, আলমারিতে কি কি বই পড়ার মতো আছে দেখতে গেলাম। একেনবাবু তাতে দমলেন না।

“আরও একজন বাঙালীর কথা এখানে লেখা আছে স্যার।” বইটা তুলে দেখালেন

একেনবাবু। "ফণীন্দ্রনাথ বসুর মৃত্যু প্রসঙ্গে ফুটনোট হিসেবে। রোঁদার আরেকজন ভারতীয় ছাত্র মহম্মদ এম রহমানেরও অপঘাতে মৃত্যু হয়েছিল। মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে খুন হন।"

"তাই?" অন্যমনস্ক হয়ে শেলফের বইগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

"হ্যাঁ স্যার, ওঁর বডিটা পোড়া অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। 'হিজ বার্নট বডি ওয়াজ ফাউন্ড নিয়ার এ ডিচ। গট টু বি এ মার্ডার।'

"দাঁড়ান, দাঁড়ান, কী বলছেন?" বই খুঁজতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম! খুন শুনে সম্বিত ফিরল। "পুড়িয়ে মারা হয়েছিল! কে খুন করল?"

"আর কিছু লেখা নেই স্যার এখানে, ওইটুকুই।"

"অন্য কোনো জায়গায় নিশ্চয় কিছু আছে?"

"বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি, স্যার।" রবীন্দ্রনাথের এই ফেমাস লাইনটা একেনবাবু প্রায়ই আওড়ান। বিশেষ করে যখন উত্তরটা জানা নেই বা চেপে যেতে চান। "আপনি পড়ুন স্যার, আমি ল্যাপটপটা ঘরে রেখে আসি।"

একেনবাবু চলে যাচ্ছেন দেখে বললাম, "রুমে যাবার আগে একটা কাজ করবেন প্লিজ, ডাইনিং রুমটা কালকে ডিনারের জন্য বুক করে আসুন। শুনলাম বেশি দেরি করলে নাকি ওখানে জায়গা মিলবে না।"

"তাই নাকি স্যার, এখনই যাচ্ছি!" বলে ব্যস্তসমস্ত হয়ে একেনবাবু ছুটলেন।

আমি ইতিমধ্যে বুক শেলফ থেকে জেমস থার্বারের 'মাই লাইফ এন্ড হার্ড টাইমস' বইটা তুলে নিয়েছি। কিছু কিছু মজাদার বই আছে যা বারবার পড়া যায়, এটা তার একটা। পড়তে পড়তে কখন বইয়ের মধ্যে ডুবে গেছি খেয়াল নেই। প্রমথর ঠেলায় ঘোর কাটল।

"কি রে খাবি, না বই পড়ে খিদে মিটাবি?" প্রমথ সাঁতার কেটে স্নান টান সেরে রেডি। "একেনবাবু কোথায়?"

"উনি কালকের জন্যে ডিনার টেবিল বুক করতে গেছেন।"

"টেবিল বুক করতে!"

"হ্যাঁ, ডাইনিং রুমের টেবিল আগের দিন বুক না করলে জায়গা মিলবে না। দু'হাজার লোককে তো একসঙ্গে বসাতে পারবে না।"

"আর আজকে?"

"আজ কাফেটেরিয়ায় খেতে হবে। নো চয়েস।"

## ।। ৭ ।।

ক্যাফেটেরিয়াটা বিশাল, সবকিছুই ব্যুফে সিস্টেমে। ডেসার্টের টেবিলটা সত্যিই দেখার মতো। হরেক রকমের ফ্রুট-কেক, চীজকেক, ডেনিশ, পাই, চকোলেট চিপ্স কুকি-র পাশে আপেল, আঙুর, ব্লু-বেরি, স্ট্রবেরি, কলা ইত্যাদি ফল থরে থরে সাজিয়ে একটা চমৎকার স্ট্যাচু বানানো হয়েছে। ওটা অবশ্য শো-এর জন্য কিন্তু তারপাশে আনারস,

তরমুজ, আম, ইত্যাদি অসংখ্য চেনা-অচেনা ফল খাবার জন্য রাখা আছে। এছাড়া নানান দেশের নানান খাবার বিভিন্ন সার্ভিং টেবিলে সাজানো। ভারতীয় খাবারও দেখলাম রয়েছে একটা টেবিলে।

এ ধরণের জায়গায় এলে যা হয়, যা খাওয়া উচিত তার থেকে অনেক বেশি প্লেটে তুলে একটা টেবিল বেছে আমরা বসলাম। আমরা ঢোকার কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম ক্যাফেটেরিয়াতে আর কোনও টেবিল খালি নেই। বাইরে কিছু লোকে দাঁড়িয়ে আছে, টেবিল খালি হলে ঢুকবে।

খেতে খেতে গল্প করছি, এমন সময় দেখি টিম একটা ট্রে হাতে বসার জায়গা খুঁজছেন। আমি হাত নেড়ে ডেকে ওঁকে আমাদের টেবিলে বসালাম। টিমের সঙ্গে আলাপ হবার কথা একেনবাবু আর প্রমথকে এর মধ্যেই বলেছি। একজন ভালো রিসোর্স, ক্রুজ সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন থাকলে জেনে নেওয়া যাবে। একেনবাবু যখন সঙ্গে আছেন আমাদের তরফ থেকে প্রশ্নের কোনো অভাব হবে না।

টিম সত্যিই একজন গ্র্যান্ড লোক। এই লাইনে প্রচুর অভিজ্ঞতা। প্রমথ যে প্রমথ তার চোখমুখ দেখেও বুঝলাম ও-ও খুবই ইমপ্রেসড। ক্রুজ ডিরেক্টরদের যে কতরকম ঝামেলা পোহাতে হয়, সেটা টিমের মুখে না শুনলে বিশ্বাস করতাম না। ছোটোখাটো এমার্জেন্সি সার্জারি থেকে শুরু করে বাচ্চা ডেলিভারি, চুরি, খুন, জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা — সবরকম সমস্যার মধ্যেই ওঁকে পড়তে হয়েছে। মাঝে মাঝে সেটা ব্যক্তিগত পর্যায়েও চলে গেছে। এক মহিলা হঠাৎ ওঁর প্রেমে পড়ে গিয়ে ক্রুজের সাতটা দিন ওঁর জীবন হেল করে দিয়েছিলেন— হাসতে হাসতে সেই গল্পটা করলেন। হ্যাপিলি ম্যারেড বলেও নিষ্কৃতি পাননি। মহিলাটির ভারসাম্যের খুবই অভাব ছিল। একদিন হঠাৎ ওঁর অফিসে ঢুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে শুরু করেছিলেন! সার্ট খোলারও চেষ্টা করেছিলেন! লাকিলি এক মহিলা সহকর্মী সেখানে থাকায় ব্যাপারটা সামলানো গিয়েছিল।

'মাই গড!' আমি বললাম।

"হ্যাঁ এক আধসময়ে এরকম ঘটে। একজন বৃদ্ধা তাঁর নাতির জন্য আমার টুপিটা কিনে নিতে চেয়েছিলেন। আমি বললাম এরকম টুপি আপনি এই জাহাজের একটা দোকানেই পাবেন। বুড়ি তাতে রাজি নন। নাতির নাকি আমার টুপিটাই পছন্দ হয়েছে। তার জন্য তিনি দু'শো ডলার দিতেও রাজি!"

"ভালোই তো হত," প্রমথ বলল। "দু'শো ডলার পকেটে আসত, আর আপনি ওটা হারিয়ে গেছে বলে রিপোর্ট করতেন। জাহাজের বাইরের ডেকে যা বাতাস, একজনের ক্যাপ তো আমার সামনেই উড়ে গেল!"

"মন্দ বলেননি," টিম হাসলেন। "তবে দু'শো ডলার তো কিছুই না, মাস কয়েক আগে একজন ফ্রেঞ্চ ভদ্রলোক এসেছিলেন। উনি আবার ইংরেজি জানেন না। আমার ফ্রেঞ্চ জ্ঞান খুব ভালো নয়, তবে কাজ চালাতে পারি। অফিসে আমার টেবিলে একটা ছোট্ট পাথরের মূর্তি দেখে বললেন, ওটা কিনতে চান। আমি ওঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, জাহাজে আমি কোনো কিছু বিক্রি করতে পারি না। তাছাড়া ওটা জন্মসূত্রে পাওয়া আমার গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদারের কালেকশন, বিক্রি করার প্রশ্ন উঠছে না। ভদ্রলোক মূর্তিটা হাতে তুলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে ডেস্ক থেকে একটা কাগজ তুলে সেখানে লিখলেন 'অফার এক হাজার ডলার'। আমি মাথা নাড়লাম। ভদ্রলোক আবার কাগজটায় কী জানি লিখে এগিয়ে দিলেন। দুটো কোশ্চেন মার্ক — অ্যাড্রেস আর ফোন। আমি কোনো সিক্রেট লোকেশনে থাকি না। তাই ঠিকানা আর ফোন নম্বর লিখে দিলাম। ভদ্রলোক আর কিছু না

বলে চলে গেলেন।”

“ইন্টারেস্টিং স্যার,”একেনবাবু বললেন। “আপনার গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদারের কি অনেক কালেকশন ছিল?”

“অনেক কিনা বলতে পারব না, পাথরের কয়েকটা মূর্তি ছিল। নিজেও নাকি পাথর নিয়ে খুটখাট করতেন। সত্যিকথা বলতে কি, এসব কথা আমি জানতামও না। আমার স্ত্রী–ই বাবার কাছ থেকে শুনেছিলেন। গত বছর বাড়িটা বিক্রির জন্যে যখন মার্কেটে দেওয়া স্থির করেছি, তখন আমার স্ত্রী অ্যাটিকটা পরিষ্কার করান। পুরোনো অনেক জিনিসের মধ্যে একটা ধুলো–ধুসরিত ব্যাগের মধ্যে ওই মূর্তিটাও ছিল। আমার পছন্দ হওয়ায় ক্রুজ সিজন শুরু হবার সময় ওটা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু গল্পটার শেষ এখানে নয়, নিউ ইয়র্কে ফিরে...।”

টিম কথাটা শেষ করতে পারলেন না, এরমধ্যে একজন স্টাফ হন্তদন্ত হয়ে এসে টিমকে ডেকে কী জানি বলল। টিম উঠে পড়ে বললেন, “সরি আমাকে একটু সাহায্য করতে হবে। রিটায়ার করেও নিষ্কৃতি নেই।”

টিম চলে যাবার পর একেনবাবু বললেন, “ট্রুলি অ্যামেজিং ম্যান স্যার, একেবারে ফ্যাসিনেটিং।”

আমরা তখনই ঠিক করে ফেললাম আমাদের ডিনার টেবিলেও টিমকে বসাব। তাতে কোনো অসুবিধা নেই, কারণ টেবিলে চারজন ধরে। কিন্তু একটাই মুশকিল টিম কোন স্টেটরুমে আছেন সেটাই জানা হয়নি। স্টেটরুম? ও হ্যাঁ, ক্রুজ শিপে ক্যাবিনকে বলা হয় স্টেটরুম।

## ।। ৮ ।।

ভ্যানকুবার থেকে ক্রুজ শিপটা প্রথম যাচ্ছে কেচিক্যানে–এ। পথটা দীর্ঘ, পুরো দু–দিন লাগবে। তবে এন্টারটেনমেন্টের এত বন্দোবস্ত — শো, থিয়েটার, এক্সারসাইজ, মিনি গলফ, ক্যাসিনো —ভিন্ন ভিন্ন রুচির যাত্রীদের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন আয়োজন। কারোর পক্ষেই সময়টা দীর্ঘ বলে মনে হবে না। আর আমাদের মতো কিছু লোক, যারা বই পড়ে বা আরাম কেদারায় সমুদ্র দেখেই খুশি তারা তো আলস্য ভরে খেয়ে বসেই সময় কাটিয়ে দিতে পারবে। একটা দিন তো দেখতে দেখতে কেটে গেছে। পরের দিনের বেশির ভাগ সময়েই আমি ডেকে বসে বই পড়ে কাটালাম, মাঝে মাঝে সমুদ্রের দিকে তাকাচ্ছিলাম। ভাগ্যে থাকলে সেখানে নাকি তিমি–র দেখা মেলে। একেনবাবু কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন আমার কোনো ধারণাই নেই। প্রমথ ক্যাসিনোতে একবার ব্ল্যাক জ্যাক ট্রাই করে দেখবে বলেছিল। কিন্তু ৪০ ডলারের বেশি খরচা করবে না, আগে থেকেই স্থির করে রেখেছে। একেনবাবু সেখানে যাননি জানি, টাকা পয়সা নিয়ে কোনও রিস্ক উনি নেন না।

হঠাৎ শুনি একেনবাবুর ব্যস্তসমস্ত কন্ঠস্বর। “একি স্যার, আপনি এখনও এখানে বসে আছেন! আমরা তো ডাইনিং রুমের সামনে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি!...

"আরে সত্যিই তো, সাড়ে ছটা বেজে গেছে! চলুন, চলুন।"

ডাইনিং রুমে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট টেবিলে যখন বসেছি, তখন দেখলাম টিম ঘরে ঢুকছেন। ওঁকে দেখা মাত্র প্রমথ পাকড়াও করতে ছুটল। প্রমথ আমাদের টেবিলটি দেখাতে উনি আমাদের দিকে তাকালেন। আমরা হাত নাড়লাম। প্রমথকে কী জানি বললেন। ফিরে এসে প্রমথ বলল, "আসছেন। কয়েকজন কলিগের সঙ্গে খাবেন বলে কথা দিয়েছেন। তবে আমাদের সঙ্গে ডেসার্ট খাবেন বললেন।"

একেনবাবু হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা স্যার ব্যাসারথ কী ধরণের পদবি?"

"আমার কোনো ধারণাই নেই। নাম যখন টিম, নিশ্চয় ক্রিশ্চান। জিজ্ঞেস করুন না, আপনার যখন এতই জানার ইচ্ছে।"

"তা অবশ্য করা যায় স্যার।" মাথা নাড়ালেন একেনবাবু।

খানিকবাদে টিম এলে একেনবাবু বললেন, "আচ্ছা স্যার, আমি আর বাপিবাবু আলোচনা করছিলাম, আপনার পদবিটা খুব আন-ইউস্যুয়াল। ইন্ডিয়াতে এই নামের পদবি কোথাও শুনিনি।"

টিম একেনবাবুর প্রশ্নের উত্তরে মুচকি হেসে বললেন, "আপনি কি ভেবেছিলেন, আমি ইন্ডিয়ান?"

"আপনি ইন্ডিয়ান নন, স্যার!"

"আমরা অরিজিনালি ত্রিনিদাদের লোক, তবে তিন পুরুষ ধরে আমেরিকায় আছি।"

"ত্রিনিদাদের ইতিহাসটা আমি ভালো করে জানি না," আমি বললাম। "তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের অনেক ক্রিকেট প্লেয়ার ইন্ডিয়ান ডিসেন্টের। আমার এক ছাত্রী ছিল ত্রিনিদাদের মেয়ে — নাম ছিল ক্যারলীন গোবেরধন।"

"নিশ্চয় অরিজিনালি গোবর্ধন ছিল স্যার।"

"তা হতে পারে।"

একেনবাবু উৎসাহ পেয়ে টিমকে বললেন "আপনারা হয়তো ছিলেন বসির— সেটাই বাসারাথ হয়ে গেছে। অথবা বাশার — সেখান থেকেও হওয়া সম্ভব।"

টিম হেসে ফেললেন।

হাবিজাবি অনেক গল্প হল। টিমকে আমাদের সঙ্গে দেখে চমৎকার স্পেশাল কেক আমাদের টেবিলে এল। কেকটা যখন খাচ্ছি টিম বললেন, তিনি কালকেই কেচিক্যানে নেমে যাচ্ছেন। সেখান থেকে প্লেন ধরে বাড়ি। এ যাত্রায় আর দেখা হবে না।

আমরা সবাই বিমর্ষ হলাম। ভারি চমৎকার মানুষ। আমি আমার কার্ডটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, "নিউ ইয়র্কে তো দেখা হতে পারে।"

"হ্যাঁ স্যার," একেনবাবু বললেন, "সেই মূর্তির গল্পটা তো শেষ হল না?"

"কেন হবে না?" বলে ওঁর একটা কার্ড আমাকে দিলেন। "ফিরে গিয়ে ফোন করবেন। আমার স্ত্রীও খুব খুশি হবেন আপনাদের সঙ্গে পরিচয় হলে।"

অ্যালাস্কা বেড়ানোর কথা আর লিখলে এটা পুরো ভ্রমণ কাহিনি হয়ে যাবে। সেটাও লেখা যায় অবশ্য, কিন্তু এটা লিখছি অন্য কারণে। তাই দিন দশেক বাদে নিউ ইয়র্ক থেকেই গল্পটা আবার শুরু করি।

## ।। ৯ ।।

শুক্রবার বিকেলে একেনবাবু বললেন, "স্যার, কাল দুপুরে আপনারা কী করছেন?"

প্রমথ গম্ভীরভাবে বলল, "সেটা নির্ভর করছে আপনার কী প্ল্যান তার ওপর।"

"আমার একার কি কোনো প্ল্যান হয় স্যার আপনারা ছাড়া।"

"ভনিতা না করে বলুন না মশাই, বড্ড কথা বাড়ান।"— "মিস্টার ব্যাসারাথ ফোন করেছিলেন। কিছু না করলে ওঁর বাড়িতে যদি চা খেতে যাই।"

"শুধু চা?"

"চুপ কর তো", আমি প্রমথকে ধমক দিলাম। "নিশ্চয় যাব, ফোন করে বলে দিন।"

"আমি বলে দিয়েছি, স্যার।"

"তাহলে প্রশ্নটা করলেন কেন," প্রমথ বলল, "আচ্ছা যা হোক!"

দু'টো নাগাদ আমার টিম ব্যাসারাথের বাড়িতে পৌঁছলাম। বাড়িটা ইস্ট হার্লেম অঞ্চলে। আগে আমি এদিকটাতে বেশি আসিনি। অঞ্চলটায় জেন্ট্রিফিকেশন চলছে, যার অর্থ রিনুয়াল এবং রিবিল্ডিং। পুরোনো বাড়িগুলো ভেঙ্গে ফেলে সেখানে গড়া হচ্ছে দামি দামি হাইরাইজ, শপিং সেন্টার, মাল্টি-লেভেল পার্কিং গ্যারেজ, ইত্যাদি। অর্থাৎ গরীবরা সেখান থেকে বিদায় নিচ্ছে, মধ্যবিত্ত-উচ্চমধ্যবিত্তরা দলে দলে ঢুকছে। ধীরে ধীরে সব বাড়িই ভেঙ্গে ফেলা হবে।

টিমের বাড়ি খুবই পুরোনো, তবে ভেতরটা পুরোনো নয়। বেশ কিছু অংশ রি-মডেলিং হয়েছে। টিমের মুখেই শুনলাম, বাড়ির বয়স দেড়শো বছরেরও বেশি! টিমের ঠাকুরদার বাবা আমেরিকায় পা দিয়ে ওখানেই প্রথম ওঠেন। ওই অঞ্চলে এক সময় বহু কালো আর বাদামি চামড়ার লোক থাকত। এখন সেই সংখ্যা অনেক কমে গেছে। আদি-বাসিন্দা বলতে টিম আর কয়েকজন আছেন। আদি বাসিন্দাদের অন্য কেউই অবশ্য ত্রিনিদাদের লোক নন।

টিমের বাড়িতে একজনের সঙ্গে আলাপ হল, ভদ্রলোক কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক, নাম টোনি র‍্যামাডিন। টোনি আমাদেরই বয়সি হবেন। ডেমোগ্রাফি আর সোশ্যাল হিস্ট্রি নিয়ে গবেষণা করেন। আপাতত গবেষণা করছেন নিউ ইয়র্কের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রকৃতি কী ভাবে পালটাচ্ছে তা নিয়ে। ওঁর কাছেই জানলাম, হার্লেমে প্রথম বসবাস শুরু করে জার্মান অভিবাসী, তারপর একে একে আসতে শুরু করে আইরিশ, ইটালিয়ান আর রাশিয়া থেকে ইহুদীরা। হার্লেমের পূবদিকে, ইষ্ট হার্লেমের বহু বাসিন্দাই এসেছিল সাদার্ন ইটালি বা সিসিলি থেকে। সেই কারণেই ইষ্ট নাইনটিয়েথ স্ট্রিট থেকে ওয়ান হান্ড্রেড ফরটি ফার্স্ট স্ট্রিট-এর মধ্যে যে জায়গাটা তার নাম হয়ে গিয়েছিল ইটালিয়ান হার্লেম। আমেরিকায় পা দিয়ে ইটালিয়ানরা প্রথমে এখানেই চলে আসত। কেন তা সহজেই বোঝা যায়। নতুন দেশ, ভাষা অন্য। স্থানীয় লোকেরা নতুন ইমিগ্রান্টদের সুনজরে দেখে না, মনে করে খাবারে ভাগ বসাতে এসেছে। নতুন দেশে স্বজাতীয়দের সঙ্গে থাকাটা শুধু বুদ্ধিমানের কাজ নয়, নিশ্চিন্তে বেঁচে থাকারও উপায়। এরকমই চলেছিল বহুদিন। এর মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বেশ কিছু লোক পোর্টারিকো থেকে আসতে শুরু করল। তারা ইটালিয়ান হার্লেমের খুব ছোট্ট একটা অংশে নানান প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আস্তানা গেড়ে বসল। তাদের সংখ্যা যখন বাড়তে শুরু করল, বহু ইটালিয়ান বাড়িঘর

বিক্রি করে চলে গেল নিউ জার্সিতে। ধীরে ধীরে ইটালিয়ান হার্লেম হয়ে উঠল স্প্যানিশ হার্লেম।

একেনবাবু দেখলাম মন্ত্রমুগ্ধের শুনছেন। টোনি-র কথা শেষ হলে বললেন, "আচ্ছা স্যার, আপনি তো আমেরিকান নন?"

"কেন, আমার রঙ কালো বলে বলছেন?"টোনি মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলেন।

"আরে ছি ছি, না না স্যার... আসলে...।"

"আমার জন্ম এদেশে, জন্মসূত্রে আমেরিকান। কিন্তু আমি যখন খুব ছোটো, বাবা-মা আমাকে নিয়ে জ্যামাইকা ফিরে যান। আঠারো বছর বয়সে আবার আমি এদেশে চলে আসি পড়াশুনা করতে। জ্যামাইকাতে বড়ো হয়েছি তাই অ্যাকসেন্টটা আছে। সুতরাং আপনার প্রশ্নের মধ্যে ভুল নেই।"

একেনবাবু তখনও লজ্জা পাচ্ছেন দেখে টোনি বললেন, "আসলে কি জানেন, আমি আমেরিকান হলেও নিজেকে জ্যামাইকান বলেই ভাবি। এই যে ধরুন টিম, এঁরা তো চার পুরুষ ধরে আমেরিকায় আছেন। কিন্তু যদি প্রশ্ন করেন অরিজিনালি কোথাকার লোক, বলবেন ত্রিনিদাদ। আবার দেখুন, আমরা তো ওয়েস্ট ইন্ডিজের লোক, ইন্ডিয়ার সঙ্গেও আমাদের যোগাযোগ আছে। আমার র‍্যামাডিন নামটা তো এসেছে ভারতীয় রামাধিন থেকে, তাই না? আসলে আমরা গ্লোবাল ভিলেজে আছি।"

"অ্যামেজিং স্যার, ট্রুলি অ্যামেজিং!"

আমি বললাম, "আপনাদের সঙ্গে এদেশের যোগাযোগ তো বহুদিনের... কোথায় জানি পড়েছিলাম..."

"হ্যাঁ, আমেরিকায় এক সময়ে অনেক স্লেভের দরকার ছিল। দাসপ্রথা তো বন্ধ হয়েছে মাত্র শ-দেড়েক বছর হল। ভারতবর্ষ থেকেও কম স্লেভ ব্রিটিশরা আমদানি করেনি। স্লেভ না বলে ইন্ডেঞ্চারড ওয়ার্কার বা বন্ডেড লেবারার বলা হতো — হরে দরে প্রায় একই। তবে ভারতীয়দের পাঠানো হতো ক্যারাবিয়ান অঞ্চলে, এদেশে নয়। তাদের রক্ত আমাদের শরীরে রয়েছে।"

"এদেশে ভারতীয়রা যারা আসত তারা বোধহয় পড়াশুনো করতেই আসত। তারকনাথ দাস বলে একজন বাঙালি তো এক-শো বছর আগে নাগরিকত্ব পেয়েছিলেন শুনেছি।" আমি বললাম।

"তাই নাকি!" একটু অবাকই হলেন টোনি। "ভালো কথা, আপনারা কি বাঙালি?"

আমরা তিনজনই প্রায় একসঙ্গে বললাম, "হ্যাঁ।"

"তা হলে আমার বন্ধু বিবেক বল্ডের বইটা পড়ে দেখতে পারেন। এই যেখানে আমরা বসে আছি, সেই জায়গা নিয়েই লেখা — Bengali Harlem and the Lost Histories of South Asian America।"

"এই জায়গাটা মানে? এটা কি বেঙ্গলি হার্লেম ছিল?" আমি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম।

"না, সেভাবে এর পরিচিতি খাতায় কলমে নেই। কিন্তু বহু বাঙালি জাহাজ থেকে নেমে এখানেই এসে উঠত। এদের বলা হত চিকনদার। এমব্রয়ডারি করা সিল্কের শাল, টেবিলক্লথ, বালিশের জামা, যেগুলোকে তখন বলা হত চিকন, সেগুলো বিক্রি করার জন্য আসত। এখনও তাদের বংশধররা কেউ কেউ এখানে আছে, তবে যেভাবে জায়গাটা পালটাচ্ছে, কতদিন তারা থাকবে সন্দেহ।" এই বলে টিমের দিকে তাকালেন টোনি, "একমাত্র তোমাদের পূর্বপুরুষই এখানে হংস মধ্যে বক যথা হয়ে এসেছিল, তাই না টিম?"

"হয়তো তাই, কিন্তু আমাকে তো এঁরা ভারতীয় বলেই ভেবেছিলেন।"

"সে তো ত্রিনিদাদের অনেক লোককে দেখলেই মনে হবে। এমন কি জ্যামাইকারও।"

"বইয়ের নামটা টুকে নিয়েছেন স্যার।" একেনবাবু আমাকে জিজ্ঞেস করলেন।

আমার পকেটে একটা পেন আর ছোট্ট ডায়েরি সবসময়েই থাকে। লিখেও নিয়েছি। মনে হল বইটা ইন্টারেস্টিংই হবে।

টোনির অন্য একটা কাজ ছিল। যাবার আগে বললেন, "খুব ভালো লাগল পরিচিত হয়ে। একদিন আসুন না, গল্প করা যাবে। জ্যামাইকান রান্না খাওয়াব।"

"তার আগে ইন্ডিয়ান রান্না হোক," প্রমথ বলল। "আপনারা সবাই আসুন আমাদের অ্যাপার্টমেন্টে।

"বেশ তাই হবে" বলে টোনি চলে গেলেন।"

টোনি চলে যাবার একটু পরেই একজন বয়স্কা মহিলা ঢুকলেন। টিম পরিচয় করিয়ে দিলেন, "আমার স্ত্রী ক্যাথি।"

বেশ মাদারলি চেহারা। উনি বোধ হয় আমাদের জন্যই বেরিয়েছিলেন। সঙ্গে দেখলাম বেশ সুন্দর একটা ফ্রুট কেক নিয়ে এসেছেন। স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি চা বা কফি দাওনি ওঁদের?"

"তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি। টোনিও ছিল, কিন্তু একটা কাজ থাকায় চলে গেল।"

"বড্ড কাজ ওর!" সস্নেহেই বললেন ক্যাথি। তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনাদের কথা ও অনেকবার বলেছে। যেদিন রিটায়ার করল সেদিনই তো দেখা হল আপনাদের সঙ্গে, তাই না?"

"হ্যাঁ ম্যাডাম।" একেনবাবু সসম্ভ্রমে বললেন।

"খুব খুশি হয়েছি আপনারা এসেছেন।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই কফি, কেক, কুকি, ব্রাউনি, ইত্যাদি এল। কোত্থেকে মিসেস ব্যাসারাথ ফ্রুট কেক কিনেছেন জানি না, কিন্তু ওরকম সফট ময়েস্ট ফ্রুট – ঠাসা কেক আমি আগে কখনো খাইনি। একেনবাবুও দেখলাম খুব উপভোগ করছেন। প্রমথ কেকের ভক্ত নয়। ওদিকে গেলই না, একটুকরো ব্রাউনি নিল।

একেনবাবু ক্যাথি ব্যাসারাথকে বললেন, "ম্যাডাম, এরকম অ্যামেজিং কেক আগে কখনো খাইনি।"

ক্যাথি বললেন, "থ্যাঙ্ক ইউ। একটা নতুন কেক শপ খুলেছে। বেশ ভালো কেক করছে।"

"অনেক নতুন নতুন শপিং সেন্টার দেখছি, পুরো এরিয়াটাই মনে হচ্ছে রেনোভেট করা হচ্ছে।"

"ঠিক, আমাদের মত দুয়েকটা পুরোনো বাড়ি ছাড়া, এখানে সবকিছুই নতুন। আর আমাদেরও আসছে যাবার পালা।"

ক্যাথির গলায় একটা বিষণ্ণতার সুর পেলাম।

"ওরই বেশি খারাপ লাগছে," টিম বললেন, "আমি তো বেশির ভাগ সময় জাহাজেই কাটিয়েছি।"

"আপনারা স্যার চলে যাচ্ছেন এখান থেকে?"

"হ্যাঁ, পরশু রাত্রেই আমরা সেলস-কনট্র্যাক্ট সই করেছি। একমাস বাদে এই বাড়ি ছাড়তে হবে। সেই জন্যই আপনাদের আজ আসতে বললাম। এরপর তো ছোটাছুটি শুরু হবে।"

"আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"ফোর্ট লডারডেল। আমাদের ছেলে ওখানে থাকে, ওখানেই একটা বাড়ি কিনছি। এখানকার তুলনায় বাড়ির দাম সস্তা, শীতও নেই এদিকের মতো। আর ক্যাথিও ওখানকার মেয়ে।"

"সে তো চল্লিশ বছর আগের কথা, ভুলেও গেছি।"

প্রসঙ্গটা হঠাৎ করেই পালটাল। একেনবাবু ড্রয়িং রুমের ওপর রাখা একটা মূর্তি দেখিয়ে প্রশ্ন করলেন, "এটাই কি স্যার সেই মূর্তিটা, যেটা সেই ভদ্রলোক জাহাজে কিনতে চেয়েছিলেন?"

টিম সেদিকে তাকিয়ে বললেন, "না, এটা মেসিজ থেকে কেনা। সে গল্পটা তো সেদিন শেষ করা হয়নি।"

"না স্যার, আজকে কিন্তু বলবেন।"

" নিশ্চয়, কদ্দুর বলেছিলাম আপনাদের?"

"বলেছিলেন একজন ফ্রেঞ্চম্যান আপনার ফোন নম্বর আর ঠিকানা নিয়েছিলেন।"

"ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। সেই ক্রুজ থেকে ফিরে এসেই ক্যাথিকে বলেছিলাম ওই খ্যাপা ফ্রেঞ্চ ভদ্রলোকটির কথা। তারপর ওকে ইমপ্রেস করার জন্য বলেছিলাম, 'আমার গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার নিশ্চয় একজন বড়ো স্কাল্পটার ছিলেন, নইলে কেউ হাজার ডলার দিতে চায় ওইটুকু একটা মূর্তির জন্য!' কথাটা শেষ করে ওঁর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে টিম বললেন, "কি ক্যাথি, মনে আছে?"

"মনে থাকবে না!" ক্যাথি হাসতে হাসতে বললেন। "আর আমি তোমাকে বলেছিলাম, 'কেউ সেই প্রতিভাটা তখন বুঝতে পারলে ওঁকে আর মনিহারি দোকান খুলতে হতো না'!"

"এক্স্যাক্টলি। ওই নিয়ে আমাদের মধ্যে একটু হাসি ঠাট্টাও হয়েছিল। ক্যাথি বলেছিল — যে-ব্যাগের মধ্যে মূর্তিটা পেয়েছিল সেটা অ্যাটিকেই আছে। আরও দু'টো ছোটো মূর্তি, ছেনি, হাতুরি, ফাইল, কাগজে মোড়া পাৎলা কিছু একটা ভেতরে রয়েছে। তবে ওটাতে এত ঝুল আর ধুলো, সেটা দেখে ওদের ছেলে নাকি পুরো ব্যাগটাই ফেলে দিতে যাচ্ছিল! 'ভাগ্যিস ফেলেনি, এখন ওই ফ্রেঞ্চ ভদ্রলোককে আরও দুটো মূর্তি গছাতে পারবে!' আমি হেসেছিলাম, 'সেই আশাতেই থাকো।'

এর দিন দশেক বাদে রিক স্প্রে বলে এক ভদ্রলোকের ফোন! নিজের পরিচয় দিলেন ফ্রেঞ্চ বিজনেসম্যান দানিয়েল ডুবোয়ার আমেরিকান এজেন্ট বলে। ক্রুজ শিপে মিস্টার ডুবোয়া যে স্ট্যাচুটা দেখেছিলেন সেটা নিয়ে কথা বলতে চান।

আমি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলাম, কিন্তু বিস্ময়তা চেপে জানতে চাইলাম, "কী কথা?"

ভদ্রলোক বললেন, ফোনে বলতে চান না। আমি যদি কয়েক মিনিট সময় দিই, উনি আমার বাড়ি এসে কথাগুলো বলবেন। এদিকে একটা কাজে এসেছিলেন, আমার বাড়ির খুব কাছেই আছেন। চাইলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই চলে আসতে পারেন।

আমার আবার সেদিন ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট। বললাম, "ঠিক আছে, আসুন, কিন্তু অল্প সময়ই দিতে পারব।"

ভদ্রলোক সত্যিই কয়েক মিনিটের মধ্যেই এলেন। এসেই জিজ্ঞেস করলেন যে স্ট্যাচুটা মিস্টার ডুবোয়া দেখেছিলেন, সেটা আমার কাছে এখনও আছে কিনা।

আমি বললাম, "আছে।"

"মিস্টার ডুবোয়া ওটা কিনতে আগ্রহী। আপনি জাহাজে ছিলেন বলে বিক্রি করার অসুবিধা ছিল। এখন করবেন তো?"

আমি অনেস্ট উত্তর দিলাম, "ওটা বিক্রি করার কথা ভাবিনি। ওটা আমার গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদারের।"

রিক বললেন, "সেটা বুঝতে পারছি। কিন্তু ওটার সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু ছাড়া আর কী আছে? মিস্টার ডুবোয়া এখনও ওটার জন্যে একহাজার ডলার দিতে রাজি।"

আমি একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলাম, "একটা কথা আমায় বলতে পারেন, উনি এই ছোট্ট মূর্তিটার জন্যে এত টাকা কেন দিতে চান?"

রিক বললেন, "মিস্টার দানিয়েল অত্যন্ত বড়োলোক আর ওঁর অনেক খ্যাপা শখ আছে। মূর্তিটা ভালো লেগেছে, কিনবেন, ব্যাস! এক হাজার ডলার ওঁর কাছে নাথিং! আচ্ছা, আপনার গ্রেট গ্রান্ড ফাদারের নামটা কি ছিল বলুন তো?"

"ব্রায়ান ব্যাসারাথ।"

"লিখে রাখি, যদি মিস্টার দানিয়েল জানতে চান।" বলেই চটপট ওঁর ফোনে নামটা লিখে নিলেন। তারপর বললেন, "তাহলে বলুন, ইটস এ ডিল?"

আমি আমার স্ত্রীর দিকে তাকালাম।

রিক লোকটা বেশ ধূর্ত। ক্যাথিকে বলল, "ম্যাম, আপনি রাজি হয়ে যেতে বলুন। আমাকে মিস্টার দানিয়েল দরকার হলে পনেরো-শো ডলার পর্যন্ত দিতে অথরাইজ করেছেন।"

ক্যাথির সন্মতি ছিল, আমিই একটু কিন্তু কিন্তু করছিলাম। যদিও এই বয়েসে একটা স্ট্যাচু আঁকড়ে না ধরে রেখে দেড় হাজার ডলার নেওয়াটা অনেক বেশি বুদ্ধিমানের কাজ। তাও আমি কয়েকদিন সময় চাইলাম রিকের কাছে। রিক খুব সন্তুষ্ট হলেন না। বললেন, "আমার মনে হয় না, মিস্টার দানিয়েল অপেক্ষা করতে রাজি হবেন বলে।" তারপর আর একটা কথা বললেন, যেটা আমার বেশ রূঢ়ই লাগল। বললেন, "আপনি কি জানেন এটা আপনার গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার কোত্থেকে পেয়েছিলেন?"

আমি বললাম, "আমার কোনো ধারণাই নেই।"

রিক স্প্রে চেয়ার থেকে উঠতে উঠতে বললেন, "তাহলে বিক্রি করলে ভালোই করতেন, অ্যান্টিক থাকলেই সেটা লিগ্যাল পজেশন হয় না।"

ইঙ্গিতটা অত্যন্ত স্পষ্ট। আমি একটু রেগেই বললাম, "আপনি এবার আসতে পারেন।"

এই খবরটা আমাদের পাড়ায় জানাজানি হতে বেশি সময় লাগল না। আমরাই গল্প করতে করতে দুয়েকজনকে বলেছি। কারও কারও ধারণা হল গ্রেট গ্রান্ড ফাদার নিশ্চয় একজন বড় কালেকটর ছিলেন, নইলে ওই ছোট্ট স্ট্যাচুর জন্যে কে পনেরো-শো ডলার দেবে! কেউ কেউ বললেন, আমি একটা বুদ্ধু এরকম একটা অফার নিইনি বলে। আমাদের এখানে একটা লোকাল নিউজপেপার বেরোয়। তাদের রিপোর্টার বাড়িতে এসে স্ট্যাচুর ছবি তুলে ফলাও করে একটা আর্টিক্‌লও লিখে ফেলল। শুধু একটা নয়, আমার গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদারের একাধিক কালেকশন যে আমাদের অ্যাটিকে আছে সেটাও ছাপিয়ে দিল! যাইহোক, এর কয়েকদিন বাদে ফোর্ট লডারডেলে গিয়েছিলাম আমাদের নতুন বাড়িটার বায়না করে আসতে। ফিরে এসে দেখি বাড়িতে চুরি হয়েছে। কিন্তু চুরি গেছে শুধু ওই মূর্তিটা। আমার কী জানি খেয়াল হল, অ্যাটিকে উঠে দেখি ধুলোভর্তি ব্যাগটা খোলা। তার ভেতরে ছেনি হাতুরি আর কিছু ছেঁড়া কাগজ পড়ে আছে। ক্যাথি যে মূর্তিদুটোর কথা বলেছিল, তার কোনোটাই নেই।"

"ভেরি ইন্টারেস্টিং স্যার। এটা কতদিন আগেকার কথা স্যার?"

"তা প্রায় মাস তিনেক হবে।"

"কাউকে আপনার সন্দেহ হয় স্যার?"

"সন্দেহ করতে হলে তো পাড়ার অনেককেই করতে হয়। হয়তো কারোর ধারণা হয়েছে ওগুলোর জন্য হাজার কয়েক ডলার পাওয়া যাবে।"

"হাউ অ্যাবাউট রিক স্প্রে?"প্রমথ বলল।

"মনে হয় না," টিম বললেন। "ওটা চুরি হবার দু'দিন পরে রিক স্প্রে আমাকে ফোন করেছিলেন, আমি ওটা বিক্রি করব কিনা জানতে। চুরি হয়ে যাওয়ার কথাটা বিশ্বাসও করলেন না। ভাবটা আমি বিক্রি করব না বলে মিথ্যে কথা বলছি!"

"ভেরি ইন্টারেস্টিং! " মাথা নাড়তে নাড়তে একেনবাবু এমন ভাবে বললেন টিম আর ক্যাথি দুজনেই একেনবাবুর দিকে একটু বিস্মিতভাবে তাকালেন।

এবার প্রমথ মুখ খুলল, "পুলিশ কী করছে জানি না, কিন্তু আমাদের একেনবাবু হলেন একজন গোয়েন্দা। উনি হয়তো আপনাদের সাহায্য করতে পারেন।"

ক্যাথি বলে উঠলেন, "সত্যি! আপনি একজন ডিটেকটিভ?"

"হ্যাঁ, ম্যাডাম।"

"আপনি বার করতে পারবেন, কে চুরি করেছে?" টিম প্রশ্ন করলেন।

"কে জানে স্যার, এসব ধরতে পারা খুব কঠিন।... ওই ব্যাগটা কি আছে?"

"না, পুলিশ ওটা নিয়ে গিয়েছিল। আমার ধারণা ফিঙ্গার প্রিন্ট বা অন্য কোনো ক্লু যদি পাওয়া যায়। কিন্তু দিন পনেরো বাদে আমাদের ফেরৎ দিয়ে যায়। মনে হয় না কিছু পেয়েছিল বলে। আমি আর ক্যাথি তখন নিউ ইয়র্ক ছাড়ব বলে জিনিসপত্র গ্যারাজ সেলে দিয়ে হালকা হবার চেষ্টা করছি। ঐ ব্যাগটা ট্র্যাশক্যানে ফেলে দিই।"

"ওটা থাকলে কি আপনার সুবিধা হতো?" ক্যাথি জিজ্ঞেস করলেন।

"বলা শক্ত ম্যাডাম। তবে পুলিশ তো দেখেইছে, তারা যখন কিছু পায়নি।" তারপর একটু থেমে বললেন, "আমার মনে হচ্ছে ম্যাডাম ব্যাপারটা ভুলে যাওয়াই ভালো।"

"টিমও তাই বলে। গ্রেট গ্রান্ডফাদারের সবচেয়ে দামি জিনিসই তো আমরা পেয়েছি... এই বাড়িটা। সেটা কি কম ভাগ্যের কথা!"

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, ক্যাথি কি বলছেন। টিম অবশ্য বিশদ করলেন, "আমাদের তিন পুরুষ ধরে শুধু এক ছেলে। আমার কোনো বোন ছিল না, বাবারও নয়। ঠাকুরদার দুই বোন ছিল শুনেছি। কিন্তু তাঁদের ভাগ ভাইকে দিয়ে দিয়েছিলেন।

ফ্যামিলি লিনিয়েজটা বেশ আনইউস্যুয়াল লাগল আমার কাছে। জিজ্ঞেস করলাম, "আপনারও তো একই ছেলে?"

"না আমাদের এক মেয়ে আছে। সে তার বর আর ছেলেমেয়ে নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকে।"

আর দু–চার কথার পর আমরা উঠে পড়লাম।

টিম আর ক্যাথি দুজনেই বললেন, আমরা আসায় খুব খুশি হয়েছেন। দেখা হোক আর না হোক যোগাযোগ থাকবে।

## ।। ১০।।

টিমদের বাড়ি থেকে ফেরার দিন কয়েক বাদে শুক্রবার কলেজে যাচ্ছি। ফল সেমিস্টার শুরু হয়ে গেছে, দুপুরে একটা ক্লাস আছে। একেনবাবু বললেন, "স্যার, আজকে একজন মহিলা আপনাকে ফোন করতে পারেন। আমি থাকব না, তাই আপনার নম্বরটা দিয়েছি।"

"কী ব্যাপার? আর আপনি থাকছেন না মানেটা কী?"

"আমি স্যার ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের সঙ্গে একটা কাজ করতে ব্রুকলিনে যাব,

সেখানে ফোনটোন রিসিভ করা যাবে না। কিন্তু ফোনটা ইম্পপর্টেন্ট। প্যারিস থেকে মিস্টার ডুবোয়া বলে একজন নিউ ইয়র্ক পুলিশের কাছে কমপ্লেন করেছেন, ওঁদের ফ্যামিলির পুরোনো ট্রেজার, রোঁদার একটা স্কাল্পচার চুরি হয়েছে বলে।"

"দাঁড়ান দাঁড়ান, এটা কি টিমের সেই ছোট্ট স্ট্যাচুর কথা বলছেন?"

"হতে পারে স্যার।"

"কিন্তু আপনি এর মধ্যে জড়ালেন কি ভাবে?"

"সে আরেক কাহিনি। কথা প্রসঙ্গে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট ডুবোয়ার কথাটা বলছিলেন। নিউ ইয়র্ক পুলিশ এরকম ভেইগ কমপ্লেন নেয় না। তাছাড়া চুরি হলেও হয়েছে বহু বছর আগে। কিন্তু যেহেতু আমার মনে হল সঙ্গে আমাদের বন্ধু টিম ব্যাসারাথ জড়িত থাকতে পারেন, ভাবলাম এ নিয়ে যতটা সম্ভব জানা যায় যাক না।"

"তা তো বুঝলাম কিন্তু ফোন করেউনি কী বলবেন? আর আমি তো পুলিশ নই, আমাকে বলবেনই বা কেন। তাছাড়া এই যদি সেই মিস্টার ডুবোয়া হন, তাহলে তো তিনি ইংরেজিও জানেন না।" দায়িত্বটা কাটাবার জন্যে বেশ কিছু যুক্তি দিলাম।

"আমি পুরোটা বলিনি স্যার, ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট আমাদের কথা ওঁকে বলেছেন। আমরা প্রাইভেট গোয়েন্দা হিসেবে ওঁকে সাহায্য করার চেষ্টা করব। আর ফোন করবেন ওঁর মেয়ে। ব্রিজিট ব্যুভোয়া বা ওরকম কিছু একটা নাম। তিনি ওয়ালডর্ফ অ্যাস্টরিয়াতে আছেন।"

"সে তো বুঝতেই পারছি, রিচ উয়োম্যান।"

"হ্যাঁ স্যার, আর শুনেছি খুব সুন্দরী।"

প্রমথর সঙ্গে থেকে থেকে একেনবাবুও আজকাল বেশ রসিক হয়ে উঠেছেন।

"আপনি সে খোঁজটা পেলেন কোত্থেকে?"

"অনুমান করলাম স্যার, ফ্রেঞ্চ লেডি তো!"

আমার দেরি হয়ে যাচ্ছিল, তাই আর প্রশ্ন না করে কলেজের দিকে রওনা হলাম।

দুপুরের ক্লাস শেষ করে সবে অফিসে ঢুকে নিজের চেয়ারে বসেছি। এমন সময় একটা ফোন এল। ফ্রেঞ্চ অ্যাকসেন্টে এক মহিলা আমার নামটাকে চন্দ্রবিন্দু দিয়ে মার্ডার করে খোঁজ করছেন। এমনিতেই ফ্রেঞ্চ অ্যাকসেন্টের ইংরেজি আমি ভালো বুঝি না, তার ওপর আমার অফিসে ওয়ারলেস সিগন্যাল ভালো আসে না, বেশ কেটে কেটে যাচ্ছে। মহিলার ইংরেজি জ্ঞানও ব্যাপারটা প্রাঞ্জল হতে দিচ্ছে না। যেটুকু উদ্ধার করলাম, সেটা হল উনি রাত দশটার ফ্লাইটে প্যারিস ফিরে যাচ্ছেন। কতগুলো কথা আমাদের জানা দরকার, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। কিন্তু ফোনে কথাগুলো বোঝাতে পারবেন না। পাঁচটা নাগাদ ওঁর হোটেলে এসে যেন দেখা করি।

আমার বিরক্তি লাগল। প্রথম কথা পাঁচটা নাগাদ ভিড় ঠেঙিয়ে ব্রুম স্ট্রিট থেকে পার্ক

আর ফরটিনাইন্থ স্ট্রিটের মোড় পর্যন্ত যেতে হবে। আর সত্যি কথা বলতে কি, এইসব বড়োলোকদের জায়গায় একা একা যেতে আমার ভালোও লাগে না। তার ওপর ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজি শুনতে হবে ফ্রেঞ্চ অ্যাকসেন্টে! সেটা বুঝব কি না কে জানে! হঠাৎ মনে হল বেভকে যদি বলি? বেভ ভালো ফ্রেঞ্চ জানে। যদিও আমাদের অফিস সেক্রেটারি, কিন্তু ভালো বন্ধু। যদিও এর মধ্যে ওকে জড়াতে ভালো লাগছিল না। সঙ্কোচও হচ্ছিল কী ভাবে কথাটা তুলব ভেবে। হোপ সি ডাসন্‌ট মাইন্ড। বেভের অফিস পাশেই। ওর কাছে যাবার আগেই দেখি ও এসে হাজির।

"তোমাকে ডিটেকটিভ ফোন করেছিল। জানতে চেয়েছে ব্রিজিট ব্যুভেয়ার সঙ্গে তোমার কথা হয়েছে কি না।"

একেনবাবুকে বেভ পছন্দ করে। ডিটেকটিভ বলে ডাকে।

"হ্যাঁ, কথা হয়েছে।"

আমার মুখচোখের অবস্থা দেখে বেভ আঁচ করল একটা কিছু হয়েছে। চেয়ার টেনে বসে বলল, "সামথিং রং?"

ঠিক কি ভাবে প্রসঙ্গটা তুলব ভাবতে ভাবতে অকারণেই টেবিলের কাগজপত্রগুলো এদিক ওদিক সরালাম।

"ইউ ওয়ান্ট টু সে সামথিং, রাইট?"

"ইয়েস।"

"কী?"

"আজ সন্ধ্যায় তুমি কী করছ?"

"নট মাচ। কেন?"

"আমার সঙ্গে ডিনার খাবে?"

"ইউ আর নট ফলিং ইন লাভ উইথ মি, আর ইউ?" দুষ্টু দুষ্টু মুখে বেভ জিজ্ঞেস করল।

এতদিনে বেভকে চিনে গেছি বলে এগুলোতে তেমন লজ্জা বোধ করি না।

"নট ইয়েট, জাস্ট এ ডিনার ইনভিটেশন," বেভকে বললাম। "তবে খাবার আগে তোমাকে আমার সঙ্গে এক জায়গায় যেতে হবে।"

"কোথায়?"

"ওয়ালডর্ফ অ্যাস্টরিয়ায় ব্রিজিট ব্যুভেয়া বলে একজনের কাছে।" বেভকে ব্যাপারটা খুলে বললাম।

"নাউ আই আন্ডারস্ট্যান্ড," বেভ হাসল, কিন্তু হাসিটা যেন একটু নিস্প্রভ। "এটা ডেট নয়, ইউ নিড অ্যান ইন্টারপ্রেটার।"

কথাটা অসত্য নয়। কিন্তু সেটা স্বীকার না করে ডিফেন্সিভ পজিশন নিলাম। "দ্যাট্‌স নট ট্রু, অনেকদিন থেকেই ভাবছিলাম, উই শুড গো আউট ফর ডিনার। কিন্তু উইক এন্ডে তো তুমি সব সময়ই ব্যস্ত থাকো?"

"হাউ ডু ইউ নো, ইউ নেভার অ্যাস্কড মি আউট!"

সর্বনাশ এর কি উত্তর দিই? কিন্তু কিছু তো একটা বলতে হবে!

আমার শব্দ সঙ্কট দেখে বেভের বোধহয় একটু করুণা হল। বলল, "উত্তর দিতে হবে না, আই উড লাভ টু হ্যাভ ডিনার উইথ ইউ টু নাইট অর এনি নাইট।"

প্রমথ আমায় খ্যাপায় বেভ আমার প্রতি অনুরক্ত বলে। আমি অবশ্য হেসে উড়িয়ে দিই।

বেভ একটু ফ্লার্ট করতে ভালোবাসে। সেক্রেটারির চাকরি করে শুধু জেদের বসে। ও শুধু সুন্দরী নয়, ও হচ্ছে একজন এয়ারেস। ওর দাদু ছিলেন ফিল্‌দি রিচ। একজন সাধারণ লোককে বিয়ে করে ওর মা বাড়ি থেকে বেড়িয়ে এসেছিলেন বলে বাড়ির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়। প্রথমে বেভের বাবার মৃত্যু, তারপর মায়ের মৃত্যুর খবর শুনে বেভের মামা নিজের থেকেই এগিয়ে এসে একমাত্র ভাগ্নি বেভের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। কিছুদিন আগে যখন একটা টিভির খোঁজ করছিলাম তখনই ব্যাপারটা শুনি। বেভ এই গরীব প্রফেসরের পয়সা বাঁচাতেই ওর মামার বিশাল দোকানে নিয়ে গিয়েছিল। দেখেই বুঝেছিলাম উনি খুব স্নেহশীল লোক। বেভের সঙ্গে গেছি বলে প্রায় নামমাত্র টাকা দিয়ে টিভিটা পেয়েছিলাম। বিক্রিবাটা হয়ে যাবার পর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনেছিলাম বেভকে চাপ দিচ্ছেন ওর মায়ের নামে যে সব জমিজমা দাদু রেখে গেছেন তাড়াতাড়ি সেগুলোর দখল নিতে। আমাকে উনি ঠিক কী ভেবেছিলেন জানি না। কিন্তু আমাকেও বারবার বলেছিলেন বেভকে বোঝাতে। অনুমান করতে পেরেছিলাম, মাল্টি–মিলিয়ন ডলারের কথা হচ্ছে। সেগুলো নিলে আর সেক্রেটারির কাজ করতে হবে না, পায়ে পা তুলে বাকি জীবন কাটাতে পারবে। এ নিয়ে আগে লিখেছি। থাক সে কথা।

ম্যানহাটনে পুরো একটা ব্লক জুড়ে ওয়ালডর্ফ অ্যাস্টরিয়া হোটেলটা। কোনদিক দিয়ে ঢুকব যখন ভাবছি দেখলাম বেভ এগিয়ে গেল। হাবভাবে বুঝলাম আগে একাধিক বার এখানে এসেছে। নিজেই লীড নিয়ে আমার হয়ে ব্রিজিট ব্যুভেয়ারকে লবি থেকে ফোন করল। লবিতে আমিই একমাত্র ভারতীয়। তাই চিনিতে ব্রিজিটের অসুবিধা হল না। বেশ লম্বা ডেলিকেট চেহারার ব্রুনেট মেয়ে। মেয়ে বলছি কারণ বয়স বছর তিরিশ পঁয়তিরিশের বেশি হবে না। আমি বেভের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। বেভকে কেন সঙ্গে এনেছি জানালাম। বেভ ফ্রেঞ্চ জানে — যদি ফ্রেঞ্চে ওঁর বক্তব্য বলতে সুবিধা হয়, তাহলে বেভকে বলতে পারবেন। পাছে উনি চটেন ওঁর ইংরেজি জ্ঞানের অপমান করছি। তাই যোগ করলাম আমার নিজের ইংরেজিও একটু উইক, তাই হয়তো ওঁর সব কথা হয়তো বুঝতে পারব না। বেভ ইন্টারপ্রেটারের কাজ করবে।

ভাগ্যিস বেভ সঙ্গে ছিল। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে দুয়েকটা কথা বলেই উনি বোঁ করে ফ্রেঞ্চে চলে গেলেন। বেভই শ্রোতা। ইংরেজি থেমে থেমে বলেন, ফ্রেঞ্চ বলেন ঝড়ের বেগে। আমি চিন্তিত হচ্ছিলাম, বেভ ওঁর বয়ান কতটা বুঝতে পারছে। মধ্যে আমি শুধু বেভকে একবার জিজ্ঞেস করলাম যে সবকিছু বুঝতে পারছে কি না। বেভ বরাভয়ের একটা দৃষ্টি দিল। কথাবার্তা সব লবিতে বসেই হল। ব্রিজেটের আরেকটা কী কাজ ছিল, তাই আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। বেভ কিছু একটা ওকে বলল। তখন উনি একটা কার্ড বেভকে ধরিয়ে দিলেন। আমাকে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে বললেন, ওকে আমার কনট্যাক্ট নম্বর দিয়েছি, যদি আর কোনো প্রশ্ন থাকে। হোটেল থেকে বেরিয়ে ঘড়িতে দেখলাম সোয়া ছ'টা। একটা ট্যাক্সি নিয়ে গেলাম পেনাং রেস্টুরেন্টে। ভালো থাই আর মালয়েশিয়ান খাবার পাওয়া যায় ওখানে। আমি আগে বার দুই খেয়েছি, দু'বারই একশোয় একশো। মনে হল বেভ খুশিই হবে। লাকিলি ভিড় ছিল না। একটা কর্নারে দু'জন বসার একটা বুথ পেয়ে গেলাম। বেশ নিরিবিলি।

যে মেয়েটি আমাদের অ্যাটেন্ড করছে সে বলল, আজকে একটা স্পেশাল ড্রিঙ্ক ওরা সার্ভ করছে — টম ইয়াম সিয়াম।

আমি বললাম, "টম ইয়াম তো একটা স্যুপ!"

"হ্যাঁ স্পাইসি স্যুপ, কিন্তু তাতে ভদকা, লেমন গ্রাস, লিচি সিরাপ আর লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে এটা বানানো হয়েছে।"

"সর্বনাশ! ঝাল হবে তো!"

"খুব অল্প লঙ্কা, তোমাদের ভালো লাগবে।"

বেভ বলল, "আমি নেব।"

এক যাত্রায় পৃথক ফল হবে কেন। আমিও নিলাম। তারপর মেনু দেখে বেশ কয়েকটা ডিশ অর্ডার করলাম।

বেভ দেখলাম মিটিমিটি হাসছে।

"কী ব্যাপার?"

"আই গেট ড্রাঙ্ক ভেরি কুইকলি।"

"প্লিজ, আমাকে পুরো ব্যাপারটা বলার আগে ড্রাঙ্ক হয়ে যেও না, একেনবাবুকে আজ রাতে রিপোর্ট করতে হবে। গেলাসে চুমুক দেবার আগেই সবকিছু বলে ফেল, নইলে আবার ভুলে যাবে।"

ব্যাগ থেকে আই-ফোনটা বার করে বেভ বলল, "আই হ্যাভ রেকর্ডেড এভরিথিং, একদম ভেব না।"

ড্রিঙ্কটা সত্যিই চমৎকার। ঝাল-ঝাল মিষ্টি-মিষ্টি একটা কিক্‌ও আছে।

"সি ইজ এ রিচ এন্ড বিউটিফুল কাউন্টেস, তাই না?" বেভ গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে বলল।

"শি ইজ ওকে, আমি অত ভালো করে দেখিনি।"

"কাম! কাম!"

"সত্যি বলছি, আমি তোমার দিকেই তাকিয়ে ছিলাম।"

"ডু ইউ ওয়ান্ট মি টু বিলিভ দ্যাট!"

"নো, কিন্তু ও কথা থাক, কী বলল বলো?"

বেভ গ্লাসে আরেকটা চুমুক দিয়ে বাইরের দিকে একটু তাকাল। মনে হল ওর চোখের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য একটু নিস্প্রভ। বাইরের দিকে তাকিয়েই আমার উদ্দেশ্যে বলল, "মনে হচ্ছে তুমি মোর ইন্টারেস্টেড ইন হার স্টোরি দ্যান মি।"

এত আচ্ছা ফ্যাসাদ! হ্যাঁ বললেও ঝামেলা, না বললেও।

তারপর আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে মুখ ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আই গেট ইট, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু অ্যানসার।"

"দ্যাট্‌স নট ট্রু বেভ," আমি অন্তর থেকেই কথাটা বললাম।

"তাহলে আমাকে একটু অ্যাটেনশন দাও, তুমি ডিনারে নিয়ে এসেছ আমাকে।"

আমি ওর দিকে তাকিয়ে একটু বোকা বোকা হেসে বললাম, "আই অ্যাম অল ইয়োর্স।"

"গুড," চোখদুটো আবার চিকচিক করে উঠল বেভের। বিজয়িনী হাসি হেসে বলল, "এখন তোমায় বলব।"

বেভের কাছে যা শুনলাম, তা টিমের কাছ থেকে আগেই শুনেছি। নতুনের মধ্যে হল ব্রিজিটের বাবা ব্রিজিটকে বলেছেন টিমের ওই স্কাল্পচারটা রোদাঁ-র হাতের কাজ। এরকম একটা স্কাল্পচার ওঁর ঠাকুরদার ছিল, যেটা চুরি হয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছে এটাই সেই চুরি হওয়া জিনিস। ব্রিজিট অবশ্য বিশ্বাস করেনি। বাবা মাঝে মাঝেই স্কাল্পচার নিয়ে বেশী উত্তেজিত হয়ে যান, লজিক নিয়ে তেমন মাথা ঘামান না। এটা ঠিক, ওঁর বাবা স্কাল্পচার

নিয়ে বহু পড়াশুনো করেছেন। নামিদামি সব স্থপতির কাজ ও টেকনিকের সঙ্গে উনি পরিচিত। কিন্তু একটা কিছু দেখেই কনফিডেন্টলি সেটা কার কাজ বলে দেওয়া ব্রিজিটের মনে হয়েছে একটু বাড়াবাড়ি। তবে এটা যদি রোদাঁর হয় আর চুরি হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ক্রুজশিপের স্টাফের কাছে থাকাটা বিস্ময়কর।

যাইহোক, ক্রুজ থেকে ফিরেই ব্রিজিটের বাবা রিক স্প্রে বলে একটি লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। লোকটি কমিশন নিয়ে আর্ট কালেক্টরদের দুষ্প্রাপ্য আর্ট জোগাড় করে দিতে সাহায্য করে। ব্রিজিট একবারই লোকটিকে দেখেছে। পছন্দ হয়নি, মনে হয়েছে গোলমেলে ক্যারেক্টার। ওর একমাত্র পজিটিভ হচ্ছে, ভালো ফ্রেঞ্চ বলতে পারে। বাবার কাছে মিস্টার ব্যাসারাথের ফোন নম্বর আর ঠিকানা ছিল। রিককে সেটা দিয়ে স্কাল্পচারটা জোগাড় করে রাখতে বলেন। আরও বলেন যে এক সময়ে ওটা ওঁর ফ্যামিলিতেই ছিল, কিন্তু চুরি হয়ে যায়। তবে সেই নিয়ে ঝামেলা করার দরকার নেই। দরকার হলে টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে দু'হাজার অফার করতে পারেন, প্রয়োজনে একটু ভয় দেখানো যেতে পারে। মোট কথা স্ট্যাচুটা ওঁর চাই-ই। অফার অ্যাকসেপ্ট করলে সঙ্গে সঙ্গে টাকাটা ব্যাঙ্ক ট্র্যান্সফার করে দেবেন। ইন্সিডেন্টাল খর্চার জন্যে রিককে পাঁচশো ডলার ক্যাশও দেন। স্কাল্পচারটা পেলে আরও পাঁচ-শো ডলার কমিশন দেবেন। এটা প্রায় মাস তিনেক আগের কথা। ব্রিজিট আরও কয়েকদিন নিউ ইয়র্কে কাটিয়ে বাড়ি ফেরে।

প্যারিসে গিয়ে ব্রিজিট শোনে যে রিক স্প্রে জানিয়েছেন টাকার অঙ্ক অনেকটা না বাড়ালে ওটা পাওয়া যাবার সম্ভবনা নেই, তবে ভয় একটু দেখিয়ে এসেছেন — তাতে যদি কিছু কাজ হয়। কিন্তু তার কয়েকদিন পর রিক স্প্রে জানান যে মূর্তিটাই চুরি হয়ে গেছে! ব্রিজিটের বাবা তখন নিউ ইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তারা কোয়াইট আনহেল্পফুল। তবে তাদের একজন মিস্টার একেন সেনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। প্রাইভেট ডিটেকটিভ হিসেবে তিনি যদি স্কাল্পচারটা উদ্ধার করতে সাহায্য করতে পারেন। যদি মিস্টার সেন কাজটার ভার নিতে রাজি হন ফী নিয়ে তখন কথা হবে।

"আর ও হ্যাঁ, এইটে — এইটে হল সেই স্কাল্পচারটার ফোটো, যেটা ব্রিজিটের বাবা কিনতে চেয়েছিলেন।" ব্যাগ থেকে বার করে বেভ আমাকে দিল।

একটা স্বল্পবাস পরা মেয়ে পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে এমন কিছু আহামরি লাগল না। এর জন্যে হাজার-দুহাজার ডলার! আমি একবার ঘড়ির দিকে তাকালাম। প্রায় আটটা। এর মধ্যে খাবার এসে গেছে। বেভ আরেকটা ড্রিঙ্ক অর্ডার করল। আমি নিচ্ছি না দেখে বলল, "ইউ মাস্ট লার্ন টু রিল্যাক্স, কাল পরশু তো কলেজ নেই। হ্যাভ সাম ফান!"

টম ইয়াম সিয়াম বেশ পোটেন্ট ড্রিঙ্ক। ভাবছিলাম খাওয়াটা কি উচিত হবে! গাড়ি চালিয়ে অবশ্য আসিনি। বেভ আমার জন্যে অপেক্ষা করল না। আমার হয়ে আরেকটা ড্রিঙ্ক অর্ডার করে দিল। খেতে খেতে হাবিজাবি অনেক গল্প হল। তার বেশির ভাগই কলেজের লোকেদের নিয়ে, কিছু আমার নিজের বাড়ির কথা আর কিছু ওর নিজের জীবনের কথা, যার অধিকাংশই আমি মোটামুটি জানি। অন্যমনস্ক হয়ে জল খেতে গিয়ে আরেকটু হলেই টেবিলের ওপর রাখা ফোটোটার ওপর জল ফেলছিলাম।

বেভ তাড়াতাড়ি ফোটোটা টেবিল থেকে তুলে নিল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "কী করবে ফোটোটা নিয়ে?"

"একেনবাবুকে দেব, ওঁর ইনভেস্টিগেশনে যদি কিছু কাজে লাগে।"

"তাহলে এটা এখানে নষ্ট হবার আগে, আমি এটাকে রেখে দিই।" মুচকি হেসে ফোটোটা আবার ব্যাগে পুরল বেভ।

ভালোই হল ফোটোটার যা সাইজ, আমার পকেটে ঢুকত না। হঠাৎ আমার মনে পড়ল বেভ বলেছিল ওর দাদু আর্ট কালেক্ট করতেন। অজস্র টাকা থাকলে বোধ হয় সেগুলোই লোকে করে। কোনো কারণ ছাড়াই প্রশ্ন করলাম, "তোমার দাদুর কালেকশনে কোনও রোদাঁ রয়েছে কি?"

বেভের মুখটা হঠাৎ কেমন জানি সিরিয়াস হয়ে গেল। বলল, "জানি না। তোমাকে তো বলেছি, দাদু বেঁচে থাকতে ওই বাড়িতে শুধু একবারই গিয়েছিলাম। তবে আঙ্কল জ্যাক হচ্ছে ডাই হার্ড রোদাঁ ফ্যান। ওর সঙ্গে কথা বললে রোদাঁ সম্পর্কে যা জানার আছে সবই জেনে যাবে।"

"তাই নাকি, তাহলে তো এটা দেখাতে হচ্ছে! থ্যাঙ্ক ইউ।"

"ইন ফ্যাক্ট, উনি তোমার খোঁজ করছিলেন?"

"আমার! কেন?"

"বলব না।"

বেভের আরেকটা টম ইয়াম সিয়াম খাবার ইচ্ছে ছিল। আমি কোনোমতে নিরস্ত করলাম। বিল চুকিয়ে বেরিয়ে দেখি, বেভ আমার হাত ভীষণভাবে আঁকড়ে ধরে আছে। অস্ফুটভাবে বলল, "টোল্ড ইউ, আই গেট ড্রাঙ্ক কুইকলি।"

"দুটো খেলে কেন?"

"ও আই হ্যাড এ লাভলি টাইম!"

অ্যালকোহলের প্রভাব আমার নিজের ওপরও একটু পড়েছিল। ওকে ব্যালেন্স করে হাঁটিয়ে নিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরলাম। ট্যাক্সিতে উঠেও আমার হাত ছাড়ল না। সারাটা পথ কাঁধে মাথা দিয়ে রইল। রাস্তায় বেভকে একা না ছেড়ে ওর অ্যাপার্টমেন্ট পর্যন্ত গেলাম। ব্যাগ থেকে হাতড়ে হাতড়ে চাবি বার করে দরজা খুলে বলল, "তুমি ভেতরে আসবে না?"

এমনভাবে কথাটা বলল যে উপেক্ষা করা কঠিন। কিন্তু না, আজকে ঢুকলে হয়তো নিজেকেই সামলাতে পারব না। নিজেকে সংযত করে বললাম, "বেভ, ইট ইজ লেট।"

"টুমরো ইজ স্যাটারডে।"

"আই নো।"

আমার গলার স্বরে একটা কিছু ছিল। বেভ জোর করল না।

"ঠিক আছে এসো না।" পরমুহূর্তে আমার গলা জড়িয়ে বলল, "বাট ইউ মাস্ট কিস মি গুডবাই।"

বেভ চলে যেতেই খেয়াল হল ওর কাছ থেকে ছবিটা নেওয়া হয়নি।

বাড়িতে ফিরে দেখি একেনবাবু টিভি দেখছেন।

"আপনি আছেন ভালো," আমি অনুযোগের সুরে বললাম, "আমার ঘাড়ে ফ্রেঞ্চ মহিলাকে চাপিয়ে আপনি এখানে আরাম করে টিভি দেখছেন।"

"কী যে বলেন স্যার। আপনি তো ম্যাডাম বেভের সঙ্গে ছিলেন?"

"আপনি জানলেন কি করে?"

"কেন স্যার, আমি কি গোয়েন্দা নই?"

"তা মানি, কিন্তু আপনি তো ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের সঙ্গে মিটিং-এ ছিলেন?"

"প্রমথবাবু তো সেখানে ছিলেন না। তিনি আপনার অফিসে গিয়ে শুনলেন আপনি বেভ ম্যাডামকে ডেটে নিয়ে গেছেন।"

"ডেট! সেই রাস্কেলটা কোথায়?"

"তিনি ম্যাডাম ফ্রান্সিস্কার সঙ্গে খেতে গেছেন।"

"চুকে গেছে! এখন শুনুন, আপনার ইনফরমেশন জোগাড় করতে আমার এক-শো ডলার গচ্চা গেছে!"

টাকার অঙ্কটা শুনে একেনবাবু আঁতকে উঠলেন। "সে কি! কী করে স্যার?"

"মেয়েটা তো ইংরেজি ভালো করে জানে না। তাই বেভকে নিয়ে গেলাম।

খবরগুলো অন্তত পাওয়া গেল।"

"তা তো বুঝলাম স্যার, কিন্তু একশো ডলারের ব্যাপারটা আসছে কোত্থেকে?"

"আচ্ছা, একটা মেয়েকে শুক্রবার বিকেলে ইন্টারপ্রেটারের কাজ করিয়ে না খাইয়ে ছেড়ে দেওয়া যায়!"

"কখনোই না স্যার। তার ওপর ইন্টারপ্রেটার যদি বেভ ম্যাডাম হন। আমার কিন্তু স্যার বেভ ম্যাডামকে খুব পছন্দ।"

"বেশ তো পরের বার আপনিই ওকে নিয়ে যাবেন।"

" কী যে বলেন স্যার, আপনি থাকতে আমি কেন! আমি কফি বানাই স্যার, তারপর শুনি কী উদ্ধার করলেন ফ্রেঞ্চ লেডির কাছ থেকে।"

এইসব কথাবার্তার মধ্যেই প্রমথ এসে হাজির। এসেই আমাকে অ্যাটাক। "তোকে একেনবাবু একটা কাজের জন্যে পাঠালেন, আর তুই সেটা না করে বেভের সঙ্গে প্রেম করতে বেরোলি।"

"স্টুপিডের মতো কথা বলিস না!" আমি এক ধমক লাগালাম।

"না, না স্যার,"একেনবাবু আমার সমর্থনে এগিয়ে এলেন। "বাপিবাবু অনেক কিছু জেনে এসেছেন। বেভ ম্যাডাম না থাকলে খবরগুলো পাওয়াই যেত না।"

"আপনি আবার কিচেনে কী খুটখাট করছেন? আমি কফি বানাচ্ছি, আপনার কফি তো মুখে দেওয়া যায় না!" একেনবাবুকে সরিয়ে দিয়ে প্রমথ কফি তৈরির ভার নিল। তারপর আমাকে বলল, "শুনি অনেক কিছু কী জেনে এসেছিস?"

আমার কাছ থেকে সব শুনে একেনবাবু বললেন, "ভেরি ইন্টারেস্টিং স্যার!"

"কী ইন্টারেস্টিং পেলেন এর মধ্যে? একটা বুড়ো ফ্রেঞ্চম্যান একজনের গ্রেট গ্র্যান্ডফাদারের জিনিস নিজের ঠাকুরদার বলে দাবি করছে উইদাউট এ শ্রেড অফ প্রুফ। আর আপনার সাহায্য চাইছে সেটা কবজা করার জন্য। বলে দিন মিলিয়ন ডলার লাগবে। তার থেকে টিমকে একটা ভালো টাকা দিয়ে দিন আর বাকি জীবনটা বউদির সঙ্গে হেসে খেলে কাটান।"

"কী যে বলেন স্যার, আপনাদের ছেড়ে কোথায় যাব?"

"ও, আপনার জন্যে আমি আর বাপি বিয়ে করব না।"

"আরে না স্যার, তা বললাম কখন!"

বেভের আঙ্কল জ্যাক আমাকে দেখতে চেয়েছিলেন, কারণ উনি ইন্ডিয়া বেড়াতে যাবার প্ল্যান করছেন। ইচ্ছে সুন্দরবনেও একবার যাবেন। সুন্দরবন যেতে হলে কলকাতা হয়েই যেতে হবে। কিন্তু কলকাতা সম্পর্কে একটা ভীতি এদেশে অনেকের মধ্যেই দেখছি। আমার কাছে কলকাতার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে একটু জানতে চান। আঙ্কল আমার সাথে দেখা করতে চান বলে সেদিন বেভ এমন একটা সাসপেন্স সৃষ্টি করেছিল যে কী বলবেন ভেবে আমি একটু দুশ্চিন্তার মধ্যেই ছিলাম। কথাটা যে আমাদের দুজনের সম্পর্ক নিয়ে নয় সেটা জেনে নিশ্চিন্ত হলাম। দেখলাম কলকাতার ব্যাপারে উনি ইতিমধ্যেই যা খোঁজখবর নিয়েছেন, তা আমার জ্ঞানের থেকে বেশি ছাড়া কম নয়। লাভের মধ্যে আমাকে আর বেভকে লাঞ্চ খাওয়ালেন। লাঞ্চ খেতে খেতে বেভ রোদাঁর প্রসঙ্গ তুলল। ওঁর কাছে লুকোছাপার কিছু নেই, তাই ব্যাপারটা আমি খোলাখুলি ওঁকে বললাম। আঙ্কল জ্যাক সত্যিই রোদাঁর সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন। রোদাঁর একটা মূর্তি টিম ব্যাসারাথের কাছে থাকাটা অসম্ভব নয়, সেটা বললেন। তবে সেই মূর্তি কারোর হাজার বা পনেরো-শো ডলারে কিনতে চাওয়াটা একেবারে হাইওয়ে রবারির চেষ্টা।

আমি বললাম, "এক্ষেত্রে যিনি কিনতে চাচ্ছেন, তাঁর ধারণা ওঁর ফ্যামিলিই ওটার আসল মালিক।"

"তাহলে তো উনি রিক্লেইম করবেন, কেনার চেষ্টা করবেন কেন?"

"রিক্লেইম করা যায়?" বেভ জিজ্ঞেস করল।

"নিশ্চয়, তবে সব সময়ে যে ফেরত পাওয়া যায় তা নয়। নাৎসীরা বহু দামি দামি আর্ট ইহুদিদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে অন্যদের বিক্রি করেছিল। সেগুলো নিয়ে কোর্টে বহু লড়াই হয়েছে, এখনও হচ্ছে। বিশ্বাস করে নাৎসীদের কাছ থেকে যারা কিনেছিল তাদেরও অনেক ক্ষেত্রে কেনা জিনিস ফেরৎ দিতে হয়েছে। মুশকিল হল এ ব্যাপারে কোনো ইউনিভার্সাল আইন নেই।" তারপর আমাকে বললেন, "আসলে জানো তো, রোদাঁ'র বহু কাজের খোঁজ পাওয়া যায়নি। পরে এদিক ওদিক থেকে সেগুলো মাথা চাড়া দিয়েছে। এই তো কিছুদিন আগেই পোটোম্যাক-এর একটা বাড়ি থেকে ব্রোঞ্জ আর মার্বেল তৈরি পা ভাঁজ করা নারীমূর্তি তিন-শো হাজার ডলারেরও বেশি দিয়ে নিলামে বিক্রি হয়েছে। যাঁদের বাড়িতে ওটা এতদিন ছিল তাঁরা জানতেনও না যে ওটা রোদাঁ-র সৃষ্টি।"

"ও মাই গড। কিন্তু জানা গেল কী করে যে ওটা রোদাঁর?"

"গুড কোয়েশ্চেন। এর কোনো নির্দিষ্ট উত্তর নেই। অনেক আর্ট এদিক ওদিক ছড়িয়ে থাকে, সেগুলো ক্যাটালগড নয়, কিন্তু প্রমাণ করার নানান উপায় আছে। ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে কাজটা একটু কঠিন। হয়তো স্কাল্পটারের সই করা কোনো চিঠি বা যারা মূর্তিটির আগের মালিক ছিল, তাদের নাম-ঠিকানা, আর্টিস্টের কাছ থেকে কেনা হলে সেই বিক্রির রসিদ, সেই মূর্তিটা সম্পর্কে পত্রিকায় কোনো লেখা বা ছবি, বা এমন কারোর সংগ্রহ থেকে মূর্তিটা পাওয়া গেছে যাঁর সঙ্গে স্কাল্পটারের বন্ধুত্ব বা যোগাযোগ ছিল। অনেক সময়ে যাঁরা সেই স্কাল্পটারের কাজের বিশেষজ্ঞ, তাঁদের সার্টিফিকেটও প্রমাণ বলে ধরা যেতে পারে। পোটোম্যাকের ক্ষেত্রে ঠিক কোনটা আমি জানি না।"

"এত টাকা দিয়ে কেনে কারা?"

আমার গলার স্বরে বিস্ময়ের প্রাবল্য দেখে মনে হল একটু মজা পেলেন, আঙ্কল জ্যাক। "এ ধরণের আর্টের ক্ষেত্রে অঙ্কটা বিরাট কিছু নয়। তবে তোমার প্রশ্নের উত্তর হল, পেপারওয়ার্ক যদি ঠিক থাকে, তাহলে মিউজিয়াম, বড়োলোকেদের প্রাইভেট ট্রাস্ট,

ইন্ডিভিজুয়াল কালেক্টর। আর এখন একটা কেনার বড়ো দল হয়েছে সো কল্ড মাফিয়া। রবের্তো স্যাভিয়ানো-র গোমোরাহ বইটা পড়েছ — ইটালির মাফিয়া গ্যাং- এর কীর্তি কাহিনি?"

"না, পড়িনি।"

"পড়লে জানতে এইসব মাফিয়া গ্যাং-মেম্বারদের কাছে ক্যাশ টাকা লেনদেনের থেকে আর্ট নিয়ে কারবার করা অনেক সেফ। ব্যাঙ্কে তো এরা কালো টাকা রাখতে পারবে না, মিলিয়নস অফ ব্ল্যাক মানি জমা থাকবে এইসব দুষ্প্রাপ্য চুরি করা আর্টের মধ্যে। ঐ বইয়ের লেখক তো এখন পুলিশ প্রোটেকশনে আছে। গোপন তথ্য ফাঁস করে দেওয়ার জন্য মাফিয়া গ্যাং ওঁকে খুন করবে বলে উঠে পড়ে লেগেছে। তাছাড়া দেখো না, পৃথিবীর নানান আর্কিওলজির সাইট থেকে হরদম পুরোনো আর্টিফ্যাক্ট চুরি হচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে সেগুলো? গুন্ডা চোরের দল যারা ওগুলো চুরি করছে, কাদের কাছে তারা বিক্রি করছে? আমাদের মতো লোকের কাছে নিশ্চয় নয়। চুরির জিনিস রাখাটা তো একটা ক্রাইম।"

এসব আমার ফিজিক্সের জগৎ নয়, সম্পূর্ণ অন্য একটা পৃথিবী। ইতিমধ্যে লাঞ্চ এসে গেছে। খেতে খেতে হঠাৎ কেন ফনীন্দ্রনাথ বসুর কথা মনে হল জানি না। জিজ্ঞেস করলাম, উনি ফনীন্দ্রনাথ বোসের কথা শুনেছেন কি না।

"হ্যাঁ, নিশ্চয় শুনেছি। কাজ শিখেছিলেন স্কটল্যান্ডে, কিন্তু রোদাঁর কাছেও কিছুদিন ছিলেন। কমবয়সেই জলে ডুবে মারা যান। কিন্তু তুমি ওঁর কথা জানলে কী করে?"

সোর্সটা বললাম। "ভাস্করদের একটা বইয়ে ওঁর নামটা ছিল। আরও একজন ইন্ডিয়ানের নাম ছিল রোদাঁর ছাত্র হিসেবে, কিন্তু নামটা মনে করতে পারছি না।"

আঙ্কল জ্যাক ভুরু কুঁচকে একটু চিন্তা করলেন, তারপর বললেন, "বুঝতে পেরেছি, তুমি বোধহয় রহমানের কথা বলছ।"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, রহমান!"

"রহমানের কথা যদি বইয়ে থাকে তাহলে সেটা ওর ভাস্কর্যের জন্য নয়। হি উইল ওনলি বি রিমেমবারড বিকজ অফ এ ট্র্যাজেডি। ইয়েস, রহমান রোদাঁর স্টুডিওতে কাজ করেছে এন্ড ওয়াজ ক্লোজ টু কেমিল ক্লদেল।"

আমি ক্লু-লেস বুঝে বেভ আমাকে বলল, "কেমিল আরেকজন গ্রেট স্কাল্পটার— রোদাঁর ছাত্রী-কাম-লাভার ছিলেন।"

"ও ইয়েস, দ্যাট উড বি দ্য বেস্ট ওয়ে টু ডেসক্রাইব হার।" আঙ্কল বললেন। "আমার মতে কেমিল রোদাঁকে ছাড়িয়ে যেতে পারতেন, বাট সি ওয়াজ মেন্টালি আনস্টেব্‌ল এন্ড অলসো এ ভিকটিম অফ লাভ। ওঁর 'শকুন্তলা' আর 'এজ অফ ম্যাচিওরিটি' দুটোই আমি দেখেছি। লাভার যখন পরিত্যাগ করে চলে যায়, তখন যে একাকিত্ব... নিদারুণ ভাবে ফুটে উঠেছে দুটো স্কাল্পচারে! বাই দ্য ওয়ে, শকুন্তলা তো তোমাদের দেশের গল্প, তাই না?"

"হ্যাঁ, শকুন্তলা-দুষ্মন্তের গল্প। হিন্দু এপিক মহাভারতে আছে।" আমি বললাম।

"আমাকে পরে গল্পটা বলবে," বেভ বলল।

"শিওর।"

"কী প্রসঙ্গে কেমিলের কথা বলছিলাম বলো তো?" বুঝলাম আমার আর বেভের কথায় আঙ্কল জ্যাক হঠাৎ খেই হারিয়ে ফেলেছেন।

"আপনি রোদাঁর ভারতীয় ছাত্রের কথা বলছিলেন।"

"ও হ্যাঁ, আসলে কি জানো, রোদাঁ-কেমিলের প্রসঙ্গ এলেই আমি অন্যমনস্ক হয়ে যাই।

ওঁরা ছিলেন আমার যৌবনের নেশা। পাবলিক লাইব্রেরীতে গিয়ে পুরোনো 'লেকো দ্য প্যারি', 'লে পেতিত প্যারিসিয়েন' পত্রিকাগুলো ঘেঁটে ঘেঁটে ওঁদের কথা পড়তাম। তখনই এই রহমান নামে রোদাঁর এক অ্যাসিস্টেন্টের নাম চোখে পড়েছিল। ওকে রোদাঁরই আরেক অ্যাসিস্টেন্ট গুলি করে মারে।"

"মাই গড" বেভ বলে উঠল।

"ইয়েস, হোয়াট এ ট্রেজেডি! রোদাঁ আর কেমিলের মধ্যে তখন ঝগড়াঝাঁটি শুরু হয়েছে। কেমিল চাপ দিচ্ছেন, কিন্তু রোদাঁ কেমিলকে বিয়ে করতে রাজি নন। কেমিলকে অ্যাবরশন করতে হয়েছে, ওঁরা ছাড়াছাড়ির মুখে। কেমিল নিজে আরেকটা স্টুডিও ভাড়া নিয়ে নিজের কাজগুলো একটু একটু করে সেই স্টুডিওতে নিয়ে যাচ্ছেন। সাহায্য করছেন রোদাঁর দুই অ্যাসিস্টেন্ট, যারা ছিল সুন্দরী কেমিলের ভক্ত। তাদের একজন এই রহমান। পুলিশ সন্দেহ করেছিল খুনটা হয়েছে লাভ ট্র্যাঙ্গেল থেকে। অন্য ফ্রেঞ্চ অ্যাসিস্টেন্টটি রহমানকে প্রবলভাবে ঈর্ষা করত কেমিলকে নিয়ে। কেমিল নিজেও খুব আনব্যালেন্সড ছিলেন, কখন কার দিকে ঝুঁকতেন কে জানে! একবার তো একটা পাবে কেমিলকে নিয়ে দু'জনের মধ্যে হাতাহাতি পর্যন্ত হয়েছিল। পুলিশ স্বভাবতই ফ্রেঞ্চ অ্যাসিস্টেন্টের পক্ষ নিয়ে রহমানকে লক-আপে ঢুকিয়েছিল।"

"ওহ নো, এর জন্য ওঁর শাস্তি হয়েছিল?" বেভ জিজ্ঞেস করল।

"আরে না। রহমানের রুমমেট পরদিন পুলিশ স্টেশনে গিয়ে ওকে ছাড়িয়ে আনে। এই ঘটনার কয়েকদিন বাদেই রাত্রিবেলা একটা ডিচের ধারে রহমান খুন হয়। আইডেন্টিটি ঢাকতে পেট্রল দিয়ে বডিটা জ্বালানো হয়েছিল। খুনি ওয়াজ পার্টলি সাকসেসফুল, কারণ পুলিশ বেশ কয়েকদিন বুঝতেও পারেনি মৃতদেহটা কার। শেষরক্ষা অবশ্য হয়নি, রহমানের আংটিটার কথা খুনি ভুলে গিয়েছিল।"

"সেই রুমমেটই কি বডিটা আইডেন্টিফাই করল?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"দ্যাট্স ইন্টারেস্টিং, তুমি প্রশ্নটা করলে। সেই রুমমেটের সঙ্গে পুলিশ যোগাযোগ করতে পারেনি, কিন্তু কেমিল আংটিটা চিনতে পেরেছিলেন। অবভিয়াসলি কেমিল ওয়াজ ক্লোজড টু রহমান। রহমানের ফিউনারেলও কেমিল অ্যারেঞ্জ করেন।"

"খুনি ধরা পড়ল কী ভাবে?" বেভ প্রশ্ন করল।

"পাস্ট হিস্ট্রির জন্যে পুলিশের একটা সন্দেহ ছিল রোঁদার সেই ফ্রেঞ্চ অ্যাসিস্টেন্টের ওপরে। একজন পথচারীকে পাওয়া গেল যে সেই রাত্রে অ্যাসিস্টেন্টটিকে পিস্তল হাতে ছুটে যেতে দেখেছে। সেই পিস্তলটা উদ্ধার হল অ্যাসিস্টেন্টের বাড়ি থেকে। যে গুলিটা রহমানের পুড়ে যাওয়া শরীরে পাওয়া গিয়েছিল সেটা ওই পিস্তলেরই গুলি। রহমানকে গুলি করার কথা পুলিশি জেরায় শেষ পর্যন্ত স্বীকার করল অ্যাসিস্টেন্টটি, যদিও বলল বডিটা নাকি ও পোড়ায়নি! দ্যাট হার্ডলি ম্যাটার্স।"

"তোমার এত মনে আছে আঙ্কল জ্যাক!" বেভ সবিস্ময়ে বলল।

"কেন জানি না, কেমিল অলওয়েজ ইনট্রিগড মি। কেমিল সম্পর্কে যেখানে যা পেতাম পড়তাম। আর এই ঘটনাটা এত দাগ কেটেছিল যে প্রায় কিছুই ভুলিনি। এমন কি বছরটাও মনে আছে ১৮৯৩। দুয়েকটা ডিটেইলস হয়তো মিস করলেও করতে পারি।"

"সেগুলো তো খোঁজ করলে লাইব্রেরিতে পাওয়া যাবে।"

"তারও দরকার হবে না। লাইব্রেরির সেই কাগজগুলো কপি করে আমি একটা ফাইল ফোল্ডারে রেখে দিয়েছিলাম। এখনও হয়তো আমার অফিসেই কোথাও আছে।"

# ।। ১২।।

বাড়ি ফিরে দেখি একেনবাবু নিবষ্টমনে একটা বই পড়ছেন।

"কী পড়ছেন?"

"ওই — যে বইটার কথা টোনি র‍্যামাডিন সেদিন বললেন। কাল লাইব্রেরি থেকে নিয়ে এলাম। ভেরি ইন্টারেস্টিং স্যার। ১৮৮৫ সাল থেকেই হুগলি জেলা থেকে বাঙালি মুসলমানদের ছোটো ছোটো দল ট্রাঙ্ক ও বস্তাভর্তি এমব্রয়ডারি করা সিল্কের শাল, টেবিলক্লথ, বালিশের ওয়াড় ইত্যাদি নিয়ে নিউ ইয়র্কে আসা শুরু করেছিলেন। সত্যি স্যার, কীরকম এন্টারপ্রেনার ছিলেন ওঁরা! আর এখনকার বাঙালিদের দেখুন, ব্যাবসা করতেই ভুলে যাচ্ছে!"

"বুঝলাম, তা সারাদিন বসে বসে বই পড়ছিলেন?"

"না স্যার লাঞ্চও খেয়েছি। আসলে ইংরেজি বই তো, পড়তে একটু সময় লাগে। আপনি কি করলেন সারাদিন?"

আমি আঙ্কল জ্যাকের সঙ্গে দেখা হবার কথা বললাম। একেনবাবু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু শুনলেন। তারপর মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "ভেরি ইন্টারেস্টিং স্যার, ভেরি ইন্টারেস্টিং... তাহলে তো ঠিকই লেখা ছিল ক্রুজশিপের সেই বইটাতে!"

"হ্যাঁ, আমিও সেটা ভাবছিলাম আঙ্কল জ্যাক যখন গল্পটা করছিলেন।"

"ওই যাঃ, গল্পে গল্পে আসল কথাটাই তো ভুলে গেলাম আপনাকে বলতে!" একেনবাবু হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন। "আরেকটা ডেভালপমেন্ট হয়েছে স্যার, এড ফাউলার সাহেবের পরিচয়টা পাওয়া গেছে।"

"কে? রিক স্প্রে?"

"আরে না স্যার, লোকটা একটা জেলখাটা আর্ট-চোর। তবে ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার। উনি চুরি করে টাকা রোজগার করতেন না। টাকা পেলে চুরি করতেন।"

"সেটা আবার কী ধরনের প্রফেশন?"

"ক্লিন প্রফেশন স্যার। চোরাই মাল নিয়ে ভাবতে হয় না, সেটা পাচার করার ভার অন্য লোকের। উনি শুধু ওঁর চুরি করার ক্ষমতাটা ব্যবহার করতেন।"

"বাঃ, ডিভিশন অফ লেবার। কিন্তু ওঁর ক্লায়েন্ট কারা ছিল?"

"রেস্পেক্টেবল কেউ নয় স্যার। যতটুকু জেনেছি একটা মাফিয়া গ্যাং, তার বেশি কিছু জানতে পারিনি।"

"বেশ। তা ফাউলার সাহেবের এই পরিচয়টা পেলেন কী ভাবে?"

"ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট বললেন। এফবিআই-র ফিঙ্গার-প্রিন্ট ডেটাবেস থেকে ওঁর আসল পরিচয়টা চট করেই পুলিশ পেয়ে গিয়েছিল। এতদিন চুপচাপ ছিল, কারণ ওঁর নেটওয়ার্কে কারা আছে, সেটা বার করার চেষ্টা চলছিল।"

"ধরে নিচ্ছি এখন পাওয়া গেছে। কিন্তু একটা জিনিস আমার কাছে স্পষ্ট নয়। আপনি বললেন, উনি টাকা পেলে ক্লায়েন্টের জন্যে চুরি করতেন। সেক্ষেত্রে বাংলা দেশে ওঁর চিঠি পাঠানোর কারণটা তো স্পষ্ট হচ্ছে না।"

"একদম খাঁটি কথা বলেছেন স্যার। একদম খাঁটি কথা... এই রে চারটে বেজে গেছে!" ঘড়ির দিকে তাকিয়ে "আমাকে একটু বেরোতে হবে স্যার" বলে একেনবাবু অদৃশ্য হলেন।

টিপিক্যাল একেনবাবু, মাথায় কখন কি ঘুরছে দেবা না জানন্তি!

উনি ফিরলেন সেই সন্ধেবেলায়। হাতে একটা কাগজ। আমি আর প্রমথ তখন বসে চা খাচ্ছি আর প্রমথকে বেভের আঙ্কলের সঙ্গে আমাদের দেখা হবার কথাটা বলছি। প্রমথ অ্যাস ইউস্যুয়াল আমার লেগপুল করছে। "হঠাৎ কলকাতায় যাবার কথা ভাবছেন কেন, ভাগ্নির ভাবি শাশুড়ির সঙ্গে দেখা করতে?"

"তোর চ্যাঙড়ামি মাঝে মাঝে সীমা ছাড়িয়ে যায়। যা বলছি, সেটা বোঝার চেষ্টা কর— আর্টের এই যে বিশাল মার্কেট, সেটা শুধু শিল্পের প্রেম থেকে নয়।"

"সেটা একেনবাবু দেখুন। যদিও বলি, এই কেসটায় বেগার খাটছেন, একটা পাইসও ওই ফ্রেঞ্চবুড়ো দেবে না, আর মামুদের খালু-রহমান সাহেবের কাছ থেকেও কিছু মিলবে না।"

একেনবাবুকে ঘরে ঢুকতে দেখে প্রমথ বলল, "এই যে আপনার কথাই হচ্ছিল। Pro bono কেসটা নিয়ে কদ্দুর এগোলেন?"

'প্রো বোনো' মানে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করা। একেনবাবু মুচকি হেসে হাতের কাগজটা এগিয়ে দিলেন।

কাগজটাতে একটা ফোটো আর তার নীচে মনে হয় সেই ফোটোর উলটোপিঠের ছবি ফটোকপি করা।

"এটা কি?"প্রমথ জিজ্ঞেস করল।

"ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট দিলেন। অরিজিনাল ছবিটা কুইন্সের পুলিশের কাছে। এই ছবিটার সঙ্গে মিস্টার ব্যাসারাথের বাড়ির তিনটে স্ট্যাচুও পুলিশ স্টেশনে আছে। সবগুলোই উদ্ধার করা হয়েছে মিস্টার ফাউলারের ঘর থেকে।"

ছবিটা পুরোনো, বোঝা যাচ্ছে বেশ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। একজন মেমসাহেবের সঙ্গে একটি ভারতীয়। ছবির পিছনে হাতে লেখা। mon cher ami Maqbul Hossain de Gaibasa, Bengal নীচে একটা সই Camille Claudel।

"এর অর্থ?" আমি প্রমথকে জিজ্ঞেস করলাম। আমাদের মধ্যে প্রমথই যা একটু ফ্রেঞ্চ জানে।

প্রমথ উত্তর দিল, "আমার প্রিয় বন্ধু মকবুল হোসেন, গাইবাসা, বাংলা।" তারপর বিজ্ঞের মতো বলল, "পুরোনো ছবি, ১৯০৫-এর আগে তোলা।"

"কী করে বুঝলি?"

"কারণ বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল ১৯০৫ সালে। ছবিটা তার পরে তোলা হলে পূর্ববঙ্গ লিখত।

"এক্সলেন্ট স্যার।"

"থ্যাঙ্ক ইউ, এবার বলুন, এই ছবি থেকে আমরা আর কী কী সিদ্ধান্তে আসব?"

"তার আগে এককাপ কফি হলে সুবিধা হত স্যার। আপনাদের এই চা ঠিক জমবে না।"

"এমন ক্রিটিক্যাল সময়ে অনুরোধটা করেন যে ঠিক ফেলা যায় না।" বলে প্রমথ বিরক্ত মুখে কিচেনের দিকে এগোল। ওর পেছন পেছন আমরা সবাই কিচেনে হাজির হলাম।

গ্রাইন্ডারে কফির বিন গুঁড়ো করে, কফি মেকারে জল চাপিয়ে যখন ব্রুইং চলছে, তখন একেনবাবু শুরু করলেন, "স্যার এই ছদ্মনাম নেওয়া এড ফাউলার আসলে যে একজন আর্টচোর ছিলেন সেটা তো বলেছি। একটু আগে জানলাম ওঁর ক্লায়েন্ট ছিল শিকাগোর

একটা মাফিয়া গ্যাং। বিজনেস এক্সপ্যানশনের জন্যে উনি আরেকটা গ্যাং-এর হয়েও কাজ করা শুরু করেছিলেন। মাস তিনেক আগে একটা লোকাল নিউজ পেপারে দেখেছিলেন একজন ফ্রেঞ্চম্যান পনেরো-শো ডলার দিয়ে হার্লেমের এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে একটা মূর্তি কেনার চেষ্টা করেছেন। শুধু সেই মূর্তিটা নয়, আরও কয়েকটা মূর্তি সেই ভদ্রলোকের বাড়িতে এখনও পড়ে আছে। সবগুলো মূর্তিই বাড়ির মালিকের ঠাকুরদার বাবার সম্পত্তি, অর্থাৎ বেশ পুরোনো। বুঝতেই পারছেন স্যার কোন মূর্তিগুলোর কথা বলছি?”

“না বুঝতে পারার কথা নয়।” প্রমথ একটু বিরক্ত হয়ে বলল, “অত ভনিতা না করে একটু তাড়াতাড়ি বলুন।”

“তাড়াতাড়ি বলতে গেলে স্যার, আমার গুলিয়ে যায়।”

“আঃ, ফোড়ন কাটিস না তো, প্রমথ। আপনি নিজের মতো করে বলুন।”

“থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম, এড সাহেব বুঝতে পারলেন মূর্তিগুলো যখন এত পুরোনো, সেগুলোর একটা মূল্য থাকবে। উনি সেই বাড়িটা একবার দেখেও এলেন। ওখান থেকে কিছু চুরি করা ওঁর পক্ষে জলভাত। সুযোগও মিলল, যখন মিস্টার ব্যাসারাথরা বাইরে গেছেন। চুরি করার সময়ে স্ট্যাচুগুলো ছাড়া একটা পুরোনো ছবিও দেখলেন অ্যাটিকের ব্যাগে আছে। এই সেই ছবি যার কপি আপনারা দেখেছেন। মনে হয় এই ছবিটাই মোড়া ছিল খবরের কাগজ দিয়ে। আগেই বলেছি স্যার, এই ফাউলার যুক্ত ছিলেন শিকাগোর একটা ক্রাইম ফ্যামিলির সঙ্গে। তাদের প্রাইভেট আর্ট কলেকশনের ব্যাপারে অনেক কাজকর্ম করেছিলেন। নিজে আর্ট চোর বলে আর্ট সম্পর্কে কিছু জ্ঞানও ছিল। কেমিল ক্লদেল নামটা তাঁর কাছে নিশ্চয় অপরিচিত ছিল না। এড সাহেব হিসেব করে দেখলেন বাড়ির মালিকের ঠাকুরদার বাবা কেমিল ক্লদেলের সমসাময়িক। কিন্তু এই ছবি আর মূর্তিগুলো ওঁর কাছে এল কী করে? অ্যাস সাচ এই ছবিটা মূল্যবান, কিন্তু এর মূল্য অনেক হবে যদি প্রমাণ করা যায় যে এই মূর্তিগুলোও কেমিলের তৈরি। সেইজন্যেই তিনি একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন রহমান সাহেবের বাড়িতে।”

“এক সেকেন্ড,” আমি বললাম। “সময়ের হিসেবটা কি ঠিক ছিল?”

“তাই তো মনে হয় স্যার। লোকাল পত্রিকায় টিমের বয়স দেওয়া ছিল ৬০ বছর, তার মানে জন্ম ১৯৫৫ সালে। যদি ভাবা যায় অ্যাভারেজ ৩০ বছর বয়সে সন্তানদের জন্ম হয়েছে। তাহলে একটা রাফ এস্টিমেট করা যায়। টিমের বাবার জন্ম ১৯২৫, টিমের ঠাকুরদার জন্ম ১৮৯৫ আর ঠাকুরদার বাবার জন্ম ১৮৬৫ সালে। উইকিপেডিয়া অনুসারে কেমিলের জন্ম ১৮৬৪-তে। সুতরাং কোনো সন্দেহই নেই যে টিমের ঠাকুরদার বাবা ব্রায়ান ব্যাসারাথ কেমিলের সমবয়সি ছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন হল ব্রায়ান ব্যাসারাথের কাছে এই ছবিটা এল কী করে? সেক্ষেত্রে কি ফ্রেঞ্চ লেডি ব্রিজিট ম্যাডামের বাবা দাবিয়াল সাহেবের অভিযোগ সত্যি? ব্রায়ান ব্যাসারাথ এগুলো চুরি করেছিলেন দানিয়াল সাহেবের পূর্বপুরুষের ফ্যামিলি ট্রেজার থেকে? ব্রায়ান ব্যাসারাথ নিজে নিশ্চয় করেননি, করেছিলেন তাঁর ছেলে, যেহেতু এটা চুরি হয়েছিল দানিয়েল সাহেবের ঠাকুরদার কাছ থেকে।

অঙ্কে এগুলো মিললেও দিস ডাস নট মেক এনি সেন্স। তারপরেও একটা প্রশ্ন থাকছে হু কিলড এড ফাউলার? ফ্র্যাঙ্কলি আই ওয়াজ কনফিউজড স্যার। ভেরি ভেরি কনফিউজড। আসলে স্যার আমি সবকিছু মেলাবার চেষ্টা করছিলাম, আর সেটাই ছিল আমার প্রবলেম। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইভেন্টকে কানেক্ট করার চেষ্টা করলে অ্যাবসার্ড রেজাল্ট আসে। এড ফাউলারের মৃত্যুর সঙ্গে টিম ব্যাসারাথের মূর্তি মেলাতে গিয়েই হয়েছে যত

ঝামেলা। যদি মনে করি দুই মাফিয়া গ্যাং-এর সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে উনি দু'দলেরই বিষনজরে পড়েছিলেন। আর এদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে উনি নাম ভাঁড়িয়ে এড হয়েছিলেন এবং খুনও হয়েছিলেন এদেরেই কারোর হাতে, তাহলে একটা বড়ো কনস্ট্রেইন্ট অদৃশ্য হয়। অর্থাৎ এই স্ট্যাচুগুলো বা ছবির সঙ্গে এডের মৃত্যুর কোনো যোগ নেই। বাকি রইল স্যার তিনটে স্ট্যাচু, যার একটি মিস্টার দানিয়েলের দাবি ওঁদের ফ্যামিলির ট্রেজার থেকে চুরি করা হয়েছে। তাঁর দাবিটা জোরদার হচ্ছে, কারণ যে ছবিটা ঐ মূর্তির সঙ্গে পাওয়া গেছে, সেখানে ব্যাসারাথ নেই, আছেন এক মকবুল রহমান। আর এই মকবুল রহমানকে ধরে নেওয়া যেতে পারে রোদাঁর সেই ছাত্র যিনি পরে খুন হন। এঁর কথাই আমি ক্রুজ শিপে একটা বইয়ে পড়েছি আর বাপিবাবুও এই গল্প অনেক ডিটেইলে শুনেছেন বেভ ম্যাডামের আঙ্কল জ্যাকের কাছে।

"হঠাৎ স্যার আমার মনে হল, আমরা নাম নিয়ে বিভ্রান্ত হয়েছি। নাম দিয়ে কি আসল মানুষ চেনা যায়? হ--জ--ব--র--ল'র হিজি বিজিবিজ আর তকাই তো একই লোক?

"হোয়াট ডু ইউ মিন?"প্রমথ বলল।

"বলছি স্যার, তার আগে বলুন, একজন মানুষকে মেরে পুড়িয়ে দেবার অর্থ কি?"

"খুবই সিম্পল, যাকে খুন করা হয়েছে, তাকে যেন কেউ চিনতে না পারে। সেক্ষেত্রে সেই লোকটিকে খুন করার যাদের মোটিভ থাকবে, তারা পিকচারেই আসবে না।"

" কিন্তু যে খুন করেছে সে তো খুনের কথা অস্বীকার করেনি, শুধু পোড়ানোর কথা অস্বীকার করেছে।"

"স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে কারণ ধরা পড়ে গেছে বলে।"

"কিন্তু পোড়ানোর কথা স্বীকার করলেও তো শাস্তি বেশি হতো না।"

"কিন্তু সেই যে পুড়িয়েছে, সেটাই বা আপনি ধরছেন কেন?"

"ঠিক কথা স্যার। ইন ফ্যাক্ট, এ নিয়ে তো অজস্র গল্প আছে। একটা মৃতদেহ পুড়িয়ে নিজেকে মৃত প্রমাণ করে আত্মগোপন করা।"

"আপনার পয়েন্টটা কি?"এবার আমি বললাম।

"বলছি স্যার। আসলে আমার চোখ খুলে গেল বিবেক বন্ডের বইটা পড়তে পড়তে। ঐ বইটা পড়ে জানলাম ১৮৮৫ সাল থেকে হুগলি জেলা থেকে বাঙালি মুসলমানদের নিউ ইয়র্কে আসার কথা। এঁদের সবাই প্রথমে থাকার জায়গা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন স্প্যানিশ হার্লেম, যেখানে মিস্টার ব্যাসারাথরা আছেন। আপনাদের মনে আছে কিনা জানি না স্যার, সেদিন প্রফেসর টনি র‍্যামাডিন মিস্টার ব্যাসারাথের বাড়িতে একটা প্রফাউন্ড কথা বলেছিলেন।"

"কী কথা?"

"নতুন দেশে স্বজাতীয়দের সঙ্গে থাকাটা শুধু বুদ্ধিমানের কাজ নয়, নিশ্চিন্তে বেঁচে থাকারও উপায়। সব মুসলিম বাঙালি ওখানে গিয়ে আস্তানা গড়ার প্রসঙ্গে প্রফেসর র‍্যামাডিন একটু ঠাট্টা করেই মিস্টার ব্যাসারাথকে বলেছিলেন, আপনারা হচ্ছেন হংস মধ্যে বকযথা। কথাটা শুনে তখনই আমার একটু খটকা লেগেছিল... হোয়াই? মিস্টার ব্রায়ান ব্যাসারাথ ত্রিনিদাদের লোকেদের থাকার জায়গা লং আইল্যান্ড বা ব্রুকলিনে না গিয়ে স্প্যানিশ হার্লেমে গেলেন কেন? তিনি কি জাহাজের বাঙালি মুসলমানদের সঙ্গেই বেশি একাত্ম বোধ করেছিলেন, যদিও উনি নিজে চিকন ব্যবসায়ী ছিলেন না!

"জাহাজে করে যারা নিউ ইয়র্কে এসে নেমেছিলেন, তাদের রেকর্ড স্যার নেট-এ এখন পাওয়া যায়। ব্রায়ান ব্যাসারাথের এদেশে আসার কোনো রেকর্ড আমি নেট থেকে

বার করতে পারিনি। ১৮৯২ থেকে ১৮৯৭ সালের বেশ কিছু রেকর্ড আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ধরে নিচ্ছি ঐ সময়ের মধ্যেই উনি এসেছিলেন। প্রশ্ন হল যে ব্রায়ান ব্যাসারাথ নিউ ইয়র্কে এসেছিলেন, তিনি সত্যিই ব্রায়ান ব্যাসারাথ কিনা। আমার থিওরি হল ব্রায়ান ব্যাসারাথ নাম নিয়ে যিনি এসেছিলেন, তিনি হলেন মকবুল রহমান।"

"দাঁড়ান, দাঁড়ান, এই থিওরির বেসিস কি?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"এবার মুশকিলে ফেললেন স্যার। যেটা আমরা জানি, সেটা হল মকবুল রহমানের একজন রুমমেট ছিল। এই রুমমেটই মকবুল রহমানকে থানা থেকে ছাড়িয়ে এনেছিলেন। থানা থেকে ছাড়া পাওয়ার ক'দিন বাদে মকবুল রহমান যখন খুন হন। মকবুল বাড়ি ফিরছে না দেখে, সেই রুমমেট কিন্তু থানায় খোঁজ নিতে আসেননি। কয়েকদিন বডিটা মর্গে পড়ে থাকার পর আঙুলের আংটি দেখে মকবুলের বডি বলে সনাক্ত করেছিলেন কেমিল ক্লদেল। বডি আইডেন্টিফাই করার জন্য পুলিশ সেই রুমমেটকে পায়নি। এমন কি মকবুলের ফিউনারেলও কেমিল অ্যারেঞ্জ করেন। রুমমেটের এই অদৃশ্য হয়ে যাওয়াটা বদারড মি স্যার, বদারড মি এ লট। মুশকিল হল, সেই রুমমেটের নাম পত্রিকায় ছিল না। এখন এটা কি সম্ভব স্যার, মকবুল রহমানের সেই রুমমেটের নাম ছিল ব্রায়ান ব্যাসারথ। আর প্যারিসে যিনি খুন হয়েছিলেন তিনি মকবুল রহমান নন, তিনি ব্রায়ান ব্যাসারাথ। অন্ধকারে মকবুল ভেবে ওঁর লাভ--রাইভাল ব্রায়ান ব্যাসারাথকে খুন করেন। মকবুল নিশ্চয় কাছেই ছিলেন। তিনি দ্রুত নিজের আংটি ব্রায়ান ব্যাসারাথের আঙুলে পরিয়ে দিয়ে পেট্রল বা কিছু দিয়ে মৃতদেহটা জ্বালিয়ে দেন।"

"দ্যাট্‌স ক্রেজি! কেন?" প্রমথ প্রশ্ন তুলল।

"কারণ স্যার মকবুলের নিশ্চয় ভয় হচ্ছিল, একবার মিস হয়ে গেলেও দ্বিতীয় গুলিটা হয়তো ওঁর বুকেই লাগবে।"

"এটা বুঝলাম না," আমি বললাম। "পুলিশে তো খবর দিতে পারতেন?"

"তা পারতেন, কিন্তু ক'দিন আগেই তো প্যারিস পুলিশ ওকে লক-আপে পুরেছিল! পুলিশের ওপর ওঁর আস্থা না থাকাটাই স্বাভাবিক। আর মনে হয় স্যার, খুব ভয়ও পেয়েছিলেন। ভেবেছিলেন রুমমেট-খুনের দায় ওই ফ্রেঞ্চ অ্যাসিস্টেন্টটি এবার ওঁর ঘাড়ে চাপিয়ে না দেন! এদিকে ব্রায়ান ব্যাসারাথও বেঁচে নেই যে ওঁকে সাহায্য করবেন! তখনই ঠিক করলেন নিজের মৃত্যু প্রচার করে ব্রায়ানের পরিচয়ে মার্কিনমুলুক পাড়ি দেবেন। সেইজন্যই স্যার ওই আংটি পরানো আর দেহ পুড়িয়ে দেওয়া।"

"এটা কিন্তু খুবই ফার ফেচ্‌ড লজিক।" আমি বললাম।

প্রমথ তো আমাকে সাপোর্ট করলই না, উলটে বলল, "ইট মেকস সেন্স। সেক্ষেত্রে সবকিছুই এক্সপ্লেইন করা যায়। কেন কেমিল আর মকবুলের ছবি আর স্ট্যাচুগুলো টিমের বাড়িতে ছিল।"

"না যায় না," আমি বললাম। "এদেশে এসে নিজের পরিচয় না দিয়ে ব্রায়ান ব্যাসারাথ হয়ে থাকার মানেটা কি?"

"তুই একটা স্টুপিড, কারণ নিজের পরিচয় দিলে হি উইল বি অ্যারেস্টেড ফর কমিটিং এ ক্রাইম। ডেডবডি পুড়িয়ে এভিডেন্স নষ্ট করা, পুলিশকে ভুলপথে নিয়ে যাওয়া... কি বলেন, একেনবাবু, ঠিক?"

"আপনি আর কবে ভুল বলেন স্যার?"

"আমি আরও একটা সাজেশন দিই।"

"দিন স্যার?"

"মনে হচ্ছে মামুদের ওই খালু, মানে রহমান সাহেবদের গ্রাম জেনেটিক্যালি স্পিকিং এখনও বেশ পিওর রয়েছে। আপনি মামুদকে বলুন রহমান সাহেবের সেই চাচার একটা স্যালাইভা স্যাম্প্‌ল নিয়ে অ্যানসেস্ট্রির খোঁজ করতে; আর এদিক থেকে আরেকটা স্যাম্পেল নিন টিম ব্যাসারাথের। যে কোনো অ্যানসেস্ট্রি ফাইন্ডিং কোম্পানি এক-শো দেড়-শো ডলারের মধ্যেই করে দেবে কাজটা। ডিএনএ ম্যাচ হলে দু'দলই একটা ফরচুনের মালিক হবে। কিন্তু তার জন্য আমাদের বাপিকে একটা কাজ করতে হবে।"

"সেটা কী স্যার?"

"বাপি ব্যাটাকে বিয়ে করতে হবে বেভকে। তারপর বেভকে বুঝিয়ে ওর দাদুর সম্পত্তির মালিকানা নেওয়াতে হবে। তারপর তো কোনো সমস্যাই নেই— এক মিলিয়ন ডলার দিয়ে মূর্তিগুলো কিনে ফেলা।"

আমার ইচ্ছে করছিল প্রমথটাকে ধরে রান্নাঘরের মেঝেতে ফেলে হাতা দিয়ে ঠ্যাঙাই। একেনবাবুর কিন্তু কথাটা মনে ধরল। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "প্রমথবাবু কিন্তু খুব ইনসাইটফুল কথা বলেন স্যার।"